

কুরবাত আহিসুন



যে জীবন জুড়ায় মন

ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

আজলাহ

মাকতাবাতুল আজলাহ

ভূমিকা

প্রশংসা তো আল্লাহরই কেবল, যিনি অমুখাপেক্ষী—একক ক্ষমতায় সব কিছু যিনি করেন; কারও ধার ধারতে হয় না যাঁর, প্রশংসা তাঁর জন্যই হওয়া চাই। আর দুরূদ ও সালাম প্রিয়নবির জন্য—আমাদের চিন্তায়-টেনশনে যাঁর জীবদ্দশায় ক্ষণেক সুকুন মেলেনি, যিনি মৃত্যুশয্যাও আমাদের ভোলেননি, এমনকি হাশরের মাঠে আরশের ছায়ায়ও আমাদের চিন্তাই যাঁকে অস্থির করে রাখবে, কী দিয়ে শুধবো তাঁর এত ঋণ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ফেসবুকের জন্য লিখেছিলাম কিছু কথাবার্তা। কেতাবি ঢং ছিলো না, এলোমেলো আড্ডার ভাষা। বই হিসেবে কস্মিনকালেও পাতে দেওয়া যায় না। সেই আনাড়ি আড্ডাগুলোকেই বুকে টেনে নিয়েছেন আপনারা। আপনাদের ভালোবাসার সাড়া পেয়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠি বারবার। কুররাতু আইয়ুনকে ভালোবাসার জন্য আপনাদের শুকরিয়া। আবার একটু গপসপ করতে এলাম আপনাদের সাথে। একই ঢঙে মোড়ের টঙে রঙ-চা-হাতে খেজুরে আলাপ। ভিন্ন কিছু বিষয়, এলোমেলো চিন্তা, বাধনহারা কিছু স্বপ্ন—এই আর কী।

অনেক আলাপের পুনরাবৃত্তি আছে; যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস কোনো লেখা না, বিচ্ছিন্ন রচনার সংকলন, তাই প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু কথা বারবার এসেছে—এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। মানুষ বিস্মৃতিপ্রবণ, বারবার স্মরণ করিয়ে দিলে মুমিনের ফায়দা হয়।^[১] ‘ডাক্তার(র)হস্য’ ও ‘রোগী-রহস্য’ লেখাদুটো আপনাদের পরিচিত ডাক্তার বা মেডিকেল স্টুডেন্টদের পড়ানোর আর্জি রইল।

অনেক জায়গায় সরাসরি হাদীস উল্লেখ না-করে, হাদীস অবলম্বনে কথোপকথন দিয়েছি। উনারাও আমাদের মতো রক্ত-মাংসে মানুষ ছিলেন। তাঁদেরও আটপৌরে জীবন ছিলো—আমাদেরই মতো, নদীর মতো কুলকুল করে বয়ে যেতো সে-জীবন। সে-জীবনে গান্ধীর্ষ ছিলো না, সাধুভাষায় কথা বলতো না সে-জীবন। আমরা কুরআন পড়ি, হাদীস পড়ি, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের জীবনের

[১] এই বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, “এবং স্মরণ করিয়ে দিন। কেননা, স্মরণ করিয়ে দেওয়া মুমিনদের উপকার করে থাকে।” (সূরা যারিয়াত : ৫৫)—সম্পাদক

ভূমিকা

সাথে মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারি না। আমাদের আটপৌরে জীবনে কোথায় এই আয়াত/হাদীস সেট হবে, ভাষাগত গাঙ্গীর্যের কারণে ঠিক ঠাউরে ওঠা যায় না। একটু নিজেদের মতো সাজিয়ে নিলে সহজ হয়। এ-জন্যই সরাসরি হাদীস না-এনে, হাদীসের অবলম্বনে লিখেছি। মূল হাদীসের রেফারেন্স দেওয়া আছে।

আবারও নানান জায়গায় তাবলিগের কথা এসেছে। আসবেই। আর যে-হাদীসগুলোতে হাদীস-নম্বর উল্লেখ করিনি, শুধু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলো হায়াতুস সাহাবাহ^[১] ও মুস্তাখাব আহাদীস থেকে নিয়েছি।

একদিন এ-সব কিচ্ছু থাকবে না। সে-দিন আল্লাহ আমাদের এ-সব আড্ডাগুলোর বদলা যেন দেন। আড্ডাগুলো তেমন কোনো কাজের ছিলো না। তবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর তাঁর দ্বীনের ভালোবাসা মেখে ছিলো আমাদের এই খেজুরে আলাপগুলোতে। এই অক্ষম ভালোবাসাটুকু দরবারে এলাহিতে কবুল হোক। আমিন।

বান্দা শামসুল আরেফীন

মেহেরপুর

১৮.০৯.২০১৯

[১] সারা বিশ্বে সমাদৃত সাহাবাদের জীবনীর উপর শাইখ ইউসুফ কান্ধলভী রহ. রচিত ‘হায়াতুস সাহাবা’ তাহকিক ও তাখরিজসহ মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মরচে-পড়া আগুন

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এটাই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না; আমরাও নিইনি। এলাহি মদদ পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু অস্ত্র ছিলো—ডাইরেস্ট অ্যাকশান টাইপ। ফেলে রেখে-রেখে জং পড়ে গেছে—কুরআন, দুআ, পরামর্শ, ইস্তিখারা। ব্যাপকভাবে সমাজ থেকে এ-সব চলে গেছে। উলামায়ে কেরাম ছাড়া বাকিদের মাঝে এ-সব হয়ে গেছে অপ্রচলিত। আরেকটি অস্ত্র আমরা ফেলে রেখেছি বহু কাল...

ইসলামী আদর্শ আর আল্লাহর মদদ আমাদের থেকে সরিয়ে দিতে আমাদের সমাজে দুটো জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে ক্রুসেডীয় বুদ্ধিজীবীরা—আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীনতা আর দুনিয়ার মহব্বত। আর এই দুটো জিনিস পুশ করার সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজেদের নারীদের। খলিফাদের উজির-নাজির আর লোকাল প্রশাসকদের দেখলে এটা পাবেন আপনি। মদ-মিউজিক-সাদা চামড়ার ককেশীয় নারী। হালের গান্দাফিরও নাকি ইউক্রেনীয় সুন্দরী নার্স ফ্যাসিলিটি ছিলো। ইয়াসির আরাফাতের বিবি ইহুদি। খোঁজ নিয়ে দেখলে অনেক মুসলিম শাসকের বা উজির নেভেলের লোকজনের বিবি ইহুদি-খ্রিস্টান পাবেন। নতুন কিছু না, এগুলো সেই ক্রুসেড-পরবর্তী যুরোপীয় কৌশল। যেমন উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশে আলিমগণ ময়দান থেকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলার কৌশল নিয়েছেন। ক্রুসেডাররাও পরপর ক্রুসেডে হেরে ডিফেন্স খেলেছে, ব্যবহার করেছে নিজেদের মেয়েদের। মুসলিমরা ওদের দেশ জয় করেছে, ককেশীয় মেয়েদের দাসী হিসেবে মুসলিম রাজধানীসহ অন্যান্য শহরে নিয়ে গেছে। সংগীত-নৃত্য-কামকলায় পটিয়সী মেয়েগুলো মনোরঞ্জনের মওকায় অথর্ব মুসলিম শাসকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের প্রভাব অন্তরমহল ছেড়ে অফিস পর্যন্ত যখন পৌঁছেছে, তখন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণেও তার ছাপ পড়েছে। আমরা সব হারিয়েছি।

তাতারিরা মুসলিমদের কচুকাটা করছিলো, মুহাদ্দিসদের মাথা দিয়ে টাওয়ার ডেভলপ করছিলো, আমাদের মেয়েদের দাসী হিসেবে ভোগ করছিলো। ১২১৮-তে শুরু, ১২৬০-এ আইনে জালুত যুদ্ধে তাতারদের পরাজয়। পরাজয়ের অন্যতম

মরচে-পড়া আগুন

কারণ হিসেবে ইতিহাস বলে—তাতারিদের একাংশ আইনে জালুত যুদ্ধে অংশ নেয়নি, যারা ছিলো বারাকা খানের কমান্ডে (Berke Khan)। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর বৃহৎ তাতার সাম্রাজ্য ৪ ভাগে ভাগ হয়েছিলো ৪ সন্তানের মাঝে; তার বড় ছেলের ঘরের নাতি এই বারাকা খান। Golden Horde অংশের রাজা বারাকা খান নাকি মুসলিম হিসেবেই বড় হয়েছিলো—বলেছেন আল-জুযজানি, যিনি তার জীবদ্দশাতেই তার ইতিহাস লেখেন; এমনকি তার পুরো আর্মি ইসলামে প্রবেশ করেছিলো আইনে জালুতের আগেই।^[১] আইনে জালুতের যুদ্ধে রুকনুদ্দিনের হাতে হালাকু খানের পরাজয়ের ৩ বছর পর এই বারাকা খানের হাতেই ককেশাসে আবারও হালাকু খান পরাজিত হয়। যারা ইসলাম ধ্বংসের জন্য এসেছিলো, তারাই ইসলামের রক্ষক বনে গেলো। বলুন তো, ইসলামের এমন দুর্দশায় কী অস্ত্রে মাত্র ৪০ বছরের মধ্যেই এই অংশের তাতারিরা মুসলিম হয়ে গেলো? কোন মেহনতে চেঙ্গিস খানেরই বংশধর বারাকা খান অন্তরমহলে বেড়ে উঠল মুসলিম হয়ে? মাদরাসা-খানকাহ-তাবলিগ-কিতাল? কীভাবে তার পুরো আর্মি চলে এলো ইসলামে? ইতিহাস উত্তরে বলে—বারাকা খানের মা ছিলেন খাওয়ারিজমের পরাজিত শাহ দ্বিতীয় মুহাম্মদের মেয়ে সুলতান খাতুন।^[২] মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আরেক অংশ Ilkhanate-এর রাজা Khar-Banda Öljeitü মুসলিম হন তার স্ত্রীর মেহনতে।^[৩] আনল্ড সাহেব লেখেন, ‘এটা অসম্ভব নয় যে, বন্দি মুসলমান মহিলারা মোঙ্গলদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাতারিদের ঘরে-ঘরে দাসী হিসেবে আমাদের মেয়েরা গিয়ে থেমে থাকেনি। তাতারিদের সন্তানদের উপরে মেহনত চালিয়েছে, তাতারিদের কাছে তুলে ধরেছে ইসলামের সৌন্দর্য; তারাই ছিলো মূল নিয়ামক এদের ইসলামে প্রবেশে। বিজয়ী হয়ে পরাজিতের ধর্ম গ্রহণের নজির বিশ্ব-ইতিহাসে এই ওয়ান এন্ড অনলি। কী বিরাট অসাধ্য সাধন—চিন্তা করুন। হায়, আমাদের অস্ত্র!

যুগ পরিবর্তনের অস্ত্র এই নারীসমাজ। আমরা চিনতে পারিনি আজও।

[১] Arnold, Thomas Walker, The Preaching of Islam: a history of the propagation of the Muslim faith, ইফাবা, পৃষ্ঠা ২৫১

[২] Anne F. Broadbridge, Women and the Making of the Mongol Empir, ২০১৮

[৩] জার্মান ঐতিহাসিক Hammer Purgstall-এর Geschichte der Ilchanen-এর সূত্রে Arnold, Thomas Walker, The Preaching of Islam : a history of the propagation of the Muslim faith, ইফাবা, পৃষ্ঠা ২৫৮

- ১৩০ ইসলামকে স্বর্ণযুগ থেকে টেনে নামিয়েছে (কাফির) নারীরা।
- ১৩১ ভাঙারি ধ্বংসরূপ থেকে ফিনিজ পাখির মতো আবার স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছে (মুসলিম) নারীরা।
- ১৩২ বর্তমানে ইসলামকে কোণঠাসা করার জন্য ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার দাজ্জালি ফাঁদের চার্জেটি (মুসলিম) নারীরা।

আজ শত বছরের অবহেলায় ঘীনের এই মহাক্ষেত্র পড়ে গেছে মরচে, হবে গেছে ভোঁতা। কুফলারের ফাঁদে-পড়া পাখিদের কথা বাদই দিলাম। আমাদের গ্রাউপিং অংশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও কি আমরা সিরিয়াস? পুঁজিবান নারীশিক্ষা টোপ দেবার সুযোগ পেলো কীভাবে? আমরা আমাদের নারীদের কত শত বছর কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র রান্নাঘরে আটকে রেখেছি? মেয়েদের কেবল কুরআন পড়তে পারা আর কিছু হিসেবনিকেশ শেখানোর মধ্যেই ফাস্ত দিয়েছি। আমাদের দাদি-নানীদের দিকে তাকান—যখন পুঁজিবানের ঘোঁকাবাজি এত ছড়ানি, তখনকার মেয়েদের শিক্ষার অবস্থাটা দেখুন!

বেগম রোকেয়া সরাসরি অনেক জায়গায় ইসলামকে আক্রমণ করেছেন—এতে সন্দেহ নেই; তবে সে-সময় নারীদের শিক্ষিত করার প্রবণতা উপমহাদেশের মুসলিম-সমাজে আসলেই ছিলো না, এটা তো আর মিথ্যা না। সে-সময়ের যে-সমাজচিত্র তিনি এঁকেছেন, তা তো মিথ্যা না। খানদানি আলিমদের পরিবারের চিত্র ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত অ-আলিম মুসলিম পরিবারগুলো মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ছিলো, এটা অস্বীকার করার মতো না। অথচ প্রথম ১০০০ বছর আমাদের সমাজচিত্রটা এমন ছিলো না। ঘীন শিক্ষাকে এত ব্যাপক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন নবীজি, যে, শুধু স্বাধীনা সন্তান নারীদেরই না, দাসীদেরকেও সুশিক্ষিত করতে আদেশ দিয়েছিলেন।^[১] ইসলামের আগে ৩২০০ বছরে ডাকসাইটে সব সভ্যতাগুলো মিলে যেখানে ১০০ জন স্কলার নারী দিতে পারেনি, ইসলাম এসে সেখানে প্রথম ১০০ বছরেই ১৫০ জন নারী দিলো, যারা সবাই ছিলেন শিক্ষিকা—‘লেকচারার অব হাদীস’।

বিস্তারিত জানতে দুটো বইয়ের কথা না-বললেই নয়; মাওলানা কাজি আতহার মুবারকপুরী রচিত ইসলামে নারীর ইলমী অবদান, আকিক পাবলিকেশান

[১] বুখারি শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালোভাবে সুশিক্ষাব্যবস্থা করে, তহরতা ও শাহীনতা শিক্ষা দেয় এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্য রয়েছে বিত্তীয় প্রতিদান।”, আস-সহিহ, বুখারি : ১৭

এবং মুফতি আবদুস সালাম নুমানী রচিত মহীয়সী নারীদের জীবনকথা, মাকতাবাতুল আযহার। প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের নারীদের পদচারণার একটি সংক্ষিপ্ত আউটলাইন তুলে ধরতে চাই।

হাদীস

একটা সময় আমাদের ঘর থেকে আশ্মাজান আয়েশা রা.-এর মতো বহুমুখী প্রতিভাধর জিনিয়াস তৈরি হয়েছেন।

আতা বিন আবি রাবাহ রহ. বলেন, ‘তিনি ছিলেন ফিকহ ও ইলমের দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।’

উরওয়া বিন যুবাইর রা. বলেন, ‘হালাল-হারাম জ্ঞান (ফিকহ), কাব্যসাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যায় আমি তাঁর চেয়ে বড় কাউকে দেখিনি।’^[১]

আরও বলেন, ‘আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে অন্য কোনো মহিলাকে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারবিদ্যায় এত পারদর্শী হতে দেখিনি।’^[২]

১৫০ জন হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীদের মধ্যে অন্তত ২২ জন ছিলেন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের, যাঁদের মধ্যে নবীজির সম্মানিতা স্ত্রীগণও আছেন। তাবেঈ আবু রাফে রহ. যখনই মদীনার ফিকহ গবেষকদের নাম নিতেন, সবার আগে নিতেন যাইনাব বিনতে আবু সালামা রা.-এর নাম।

ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন মানুষ (হি. ৪৯৯-৭১)। তিনি বলছেন, তিনি ২০০ জন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করেন, যাঁদের ৮০ জন নারী।

ইবনু হাজার আসকালানি রহ. আদ-দুরার আল-কারিমা গ্রন্থে হিজরি ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর জীবনী উল্লেখ করেন, যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন; এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রফেসর লেভেলের—যেমন জুয়াহিরিয়া বিনতে আহমাদ, তিনি বড়-বড় মাদরাসায় ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।

আয়েশা বিনতে হাদিকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ লেভেলের হাদীস-স্পেশালিস্ট মনে করা হতো ও দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসতো। মহীয়সী নারীদের জীবনকথা গ্রন্থে অন্তত ২৬৫ জন নারী আলিমার নাম এসেছে, যাঁদের সবাই নুহাদিসা—অর্থাৎ তাঁদের থেকে হাদীসের দরস নেওয়া হতো।

[১] আল-ইসাবা ফি তাময়্যিস সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানি : ৮/১৪০

[২] আল-ইসাবা ফি তাময়্যিস সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানি : ৮/ ১৪০

হিজরি ৯ম শতাব্দীর ১৩০ জন নারী বিশেষজ্ঞের নাম এসেছে আবদুল আযীয ইবনু উমরের মুজাম আল-শুযুখ গ্রন্থে।

উম্মে মুহাম্মাদ ইবনু যাইনাব বিনতে আহমাদ মাকদিসী ৯০ বছর অবধি হাদীসের দরস দিয়েছেন, এমনকি মদিনা ও মিশরে গিয়েও লেকচার দিতেন। উম্মে আহমাদ যাইনাব বিনতে মাক্কা হাররানিয়া ৯৪ বছর পর্যন্ত হাদীসের ক্লাস নিতেন। উম্মে আবদুল্লাহ যাইনাবকে বলা হতো 'মুসনিদাতুশ শাম'। ফাখরুন্নিসা শুহদা বাগদাদি হাদীসের উচ্চ সনদের বিরল অধিকারিণী ছিলেন, হাদীসের বহু ইমাম তাঁর ছাত্র। কারিমা বিনতে আহমাদ মারওয়াযি বুখারি শরিফ পড়ানোয় প্রসিদ্ধ ছিলেন, খতিব বাগদাদি রহ. ও তাঁর থেকে বুখারির সনদ নিয়েছেন। ফাতিমা বিনতে আহমাদকে বলা হতো 'মুসনিদাতুল মাক্কা'। কারিমা বিনতে আবদুল ওয়াহহাবের লেকচারে হাদীসের হাফিজগণও (১ লাখ হাদীস মুখস্থকারী) এসে ক্লাস করতেন। খতিবে বাগদাদি তাঁর একাধিক উস্তাযার নাম উল্লেখ করেছেন। সিন্ধুল উযারা বিনতে উমর তানুযি দামেশক ও মিশরে প্রসিদ্ধ ছিলেন বুখারি ও মুসনাদে শাফেঈর লেকচারে।

ফিকহশাস্ত্র

হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ তুহফাতুল ফুকাহা লেখক আলাউদ্দীন সমরকন্দি রহ.। এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাদায়েউস সানায়ি লিখেছেন তাঁর মেয়েজামাই। আর এই বইয়ের ভুলচুক সংশোধন করে দিতেন লেখকের মেয়ে ফাতিমা। যে-কোনো লিগ্যাল ডকুমেন্টে বাপ-বোটি-জামাই ও জনের স্বাক্ষর থাকতো।^[১]

আমাতুল ওয়াহিদ বিনতে মাহামিলি ফিকহে শাফেঈর এত বড় মুফতিয়া ছিলেন যে, ইমাম আবু আলি ইবনু আবু হুরাইরা রহ.-এর পাশাপাশি (বাগদাদ শহরে) তিনিও ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন।^[২]

[১] শাইখ আলাউদ্দীন সমরকন্দি রহ. তুহফাতুল ফুকাহা নামে একটি কিতাব লিখেছিলেন। এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরই ছাত্র আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানি রহ.। ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম বাদায়েউস সানায়ি। ইসলামী ফিকহশাস্ত্রে এটি নজিরবিহীন কিতাব। একে ফিকহে হানাফির বিশ্বকোষও বলা হয়। এটি দেখে শিক্ষক তাঁর ছাত্র কাসানি রহ.-এর কাছে নিজ নেয়েকে বিয়ে দেন। সেই নেয়েটিই ফাতিমা। তিনি ছিলেন মুফতি। স্বামী কাসানি রহ.-কে তিনি ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতেন। কোনো ফতোয়ার ভুল করলে তা শুধরে দিতেন। স্বামী ও যুগ্মমনে তাঁর সংশোধনী মেনে নিতেন। কারণ, তিনি নিজ স্ত্রীর জ্ঞান-গরিমার বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। আল-জাওহিরুল মুযিহিয়া, মুহিউদ্দীন হানাফি : ২/২৪৭—সম্পাদক

[২] তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি : ১৬/ ৫০২। ইবনে আবু হুরাইরা শাফেঈ মাযহাবের অনেক

মরচে-পড়া আগুন

মুফতিয়া উন্মে হানি উয়ুসিয়া, তাঁর বোন ফাতিমা ও শাইখ যাওরাকের দাদি উন্মে বানিন রহ.—এই ৩ জন মুসলিম-বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলে আলাদাভাবে ফিকহে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাইখ তাকিউদ্দিন ইবরাহিম বিন আলি ওয়াসিতী রহ.—এর কন্যা আমাতুল রহমান ফিকহ ও ফতোয়ায় এত বিখ্যাত ছিলেন যে, তাকে ‘সিভুল ফুকাহা’ নামে ডাকা হতো।

কুরআন

ফাতিমা নিশাপুরি ছিলেন জুননুন মিশরি রহ.—এর শিক্ষিকা, প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন।

ইমাম যাইনুদ্দিন দিমাশকি রহ.—এর মা নিজ পিতার ৩০ খণ্ডের তাফসির আল-জাওয়াহের মুখস্থ করেছিলেন।

মাইমুনা বিনতে আবু জাফর মাদানি ছিলেন প্রসিদ্ধ কারি ও তাজবিদ-স্পেশালিস্ট। সালমা বিনতে জাযারি সাত কিরাতে কুরআন মুখস্থ করেন, তৎকালীন ইলমে তাজবিদে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

মুঘল বাদশাহ আলমগির আওরঙ্গজেবের কন্যা শাহজাদি জেবুন্নিসা নিজে তাফসির লিখেন—যাইবুত তাফসির।

ব্যক্তিগ্ৰাফি

ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে হস্তলিপিবিদ্যা একটি বহুল চর্চিত ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছিলো। বহু নারী লিপিকার রাষ্ট্রীয় অনুলিপিকারের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের মাঝে কাতেবা বিনতে আকরা বাগদাদি ছিলেন ‘উস্তায়’ পর্যায়ের। আরও ছিলেন লুবনা

বড় আলেম ও মুফতি ছিলেন। তিনি দ্বীয় যুগে বাগদাদে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। সেই সময় আমাতুল ওয়াহিদ বিনতুল মাহামিলিও বাগদাদে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। এখানে সেই কথাই বলা হলো।—সম্পাদক

আমাতুল ওয়াহিদ বিনতুল মাহামিলি একটি সম্ভ্রান্ত ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি কুরআনুল কারিমের হিফজ সম্পন্ন করেন। তারপর কিরাআত, ফিকহ, হাদীস, তাফসির প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর দাদা ইসমাইল ছিলেন বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শীর্ষস্থানীয় ফকিহদের একজন। তাঁর বাবা আবু আবদুল্লাহ ছিলেন বাগদাদের অন্যতম বিচারক এবং মুহাদ্দিস। চাচা কাসিম বিন ইসমাইলও বিচারক ছিলেন। তাঁর ভাই ছিলেন সে-সময়ের নামকরা একজন মুহাদ্দিস। মোটকথা তাঁর পরিবার সেই সময়ে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ও বিখ্যাত ছিলো। এ-কারণে ইলমের ময়দানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো এবং যার ফলাফল ছিলো এই যে, তিনি নিজেও একজন প্রথম সারির ইসলামী আইনবিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি পান সেই সময়ে।—সম্পাদক

উন্দুলুসি, মুযনাহ উন্দুলুসি। এ-ছাড়া সাফিয়া বিনতে আবদুল্লাহ উন্দুলুসি, ফখরুন্নিসা শুহদা বিনতে আহমাদ (উপাধি ছিলো লিপিকার), আয়েশা বিনতে উমারা ইফ্রিকিয়া প্রমুখ ক্যালিগ্রাফি-জগতে বিখ্যাত ছিলেন।

কেবল কর্ডোভা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭০ জন আলিমা ছিলেন, যাঁরা কুরআন অনুলিপি করতেন।

পুরো উন্দুলুস জুড়ে হাজার-হাজার আলিমা ছিলেন, যাঁরা কুরআন ক্যালিগ্রাফি করে বিক্রি করতেন; সেই অর্থ শত্রুর-হাতে-বন্দি মুসলিম সেনাদের মুক্তিপণ হিসেবে খরচ হতো। জিডিপিতে অবদান রাখতে বেপর্দা হয়ে পুরুষের সাথে ৯টা-৫টা বাধ্যশ্রম দেওয়া লাগে না।

সাহিত্য

মুসলিম স্পেনে বেশ কজন মহিলা কবি-সাহিত্যিক ছিলেন, যাঁদের খ্যাতি পুরো সাম্রাজ্যব্যাপী ছিলো। তৃতীয় হিজরি শতকে সেভিলের মারয়াম বিনতে ইয়াকুব মহিলাদের সাহিত্যের প্রফেসর ছিলেন। এ-ছাড়া বুজায়া শহরের গাসসানিয়া, সেভিলের দাদি আসিয়া, গ্রানাডার নাজহুন, স্বভাবকবি ওয়াল্লাদা প্রমুখ খুবই মশহুর ছিলেন। মক্কার খাদিজা নুওয়াহরি, যাইনাব বিনতে কামালুদ্দীন হাশেমি, মরক্কোর সারা বিনতে আহমাদ, উম্মে হুসাইন বিনতে কাযিয়ে মক্কা, উম্মে আলি বিনতে আবুল ফরজ সুরি প্রমুখের কাব্যচর্চা ইতিহাস মনে রেখেছে।

খানসা রা.-এর কবিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ শোনে এবং মুগ্ধ হন।^[১] উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ কবি জারিরকে (মৃত্যু ১১০ হিজরি) জিজ্ঞেস করা হলো—‘সবচেয়ে বড় কবি কে?’ জবাব দিয়েছিলেন, ‘খানসা না-হলে আমি হতাম।’ আরেক বড় আরবি কবি বাশশার বলেন, ‘খানসা কাব্যে পুরুষদের চেয়েও অগ্রসর।’ জাহেল-যুগে খানসার তাঁবুর সামনে লেখা থাকতো—‘আরসাল আরব’ (আরবের সবচেয়ে বড় শোকগাঁথা-রচয়িতা)।

এটুকুতে হয়তো কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অস্ত্রে কী পরিমাণ ধার ছিলো! ঘরে থেকেই, পর্দার সাথেই, মাহরামের সাথে সফর করে-করেই এই অবস্থা। আজ আমরা মাহরাম ছাড়া আবাসিক রেখে, বেপর্দায় ছেড়ে দিয়েও এই

[১] উসদুল গাবাহ, ইবনেল আসির : ৬৮৭৫; আল-ইসাবাহ ফি তাময়যিয সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানি : ১১১১১; আল-ইস্তিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, ইবনে আব্দিল বার : ৩৩১৭—সম্পাদক

মরচে-পড়া আগুন

অবস্থা কল্পনা করতে পারি না। তাই ছেলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদের শেখান। মানে কি, আমি মেয়েদের গ্রাজুয়েট বানানোর কথা বলছি? মাস্টার্স-পিএইচডি? উঁহু, বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট ছেলেদের জন্যই নিরাপদ না। আমি দ্বীন-মানতে-চাওয়া মুসলিম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলছি; দ্বীনের কোনো মূল্য যাদের কাছে নেই, বা ‘দ্বীনের ক্ষতি হয় হোক, মানুষ যেন ভালো বলে’-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা যারা করেন, তাদের জন্য এই লেখা নয়; আমি আবার বলছি—বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট, সিস্টেম ও কারিকুলাম আপনার ছেলের ঈমান-আমলের জন্যই নিরাপদ নয়। আমরা বাঘের মুখ থেকে ফিরেছি, তাই বলে আমাদের সন্তানদেরও বাঘের মুখে পাঠাতে পারি না। আবার সবাই ছেলেকে মাদরাসায় পড়িয়ে আলিম বানাবো, এমন অবস্থায়ও আমরা যাইনি, সমীচীনও নয়। ছেলেদের শিক্ষা নিয়ে আজ বলবো না, আরেক দিন ইন শা আল্লাহ। এখন মেয়েকে কোথায় পড়াবেন, তাই তো?

ক.

আগেই বলে নিয়েছি—বর্তমান জেনারেল শিক্ষার ফরম্যাট-সিলেবাস-সিস্টেম-পরিবেশ কোনো কিছুই আমাদের প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারের মেয়েদের জন্য আমি নিরাপদ মনে করি না—হোক সেটা গার্লস স্কুলই, সেখানেও পুরুষ টিচার থাকে, পুরুষের কাছে কোচিং করতে হয়—ব্লা ব্লা। সিলেবাসে পুঁজিবাদ, সেকুলারিজম, নারীবাদ, প্রকৃতিবাদ ঠাসা। কয়েক শর্তে আমরা মেয়েদের জেনারেলে দিতে পারি—

- ৞ যদি তেমন ‘নারী ফ্যাকাল্টিওয়ালা’ স্কুল পাওয়া যায়।
- ৞ যদি পুরুষের কাছে কোচিং করতে না হয়।
- ৞ যদি নিজে সময় দিয়ে সিলেবাসের বদদ্বীনিটুকু ক্রিয়ার করতে পারেন।
- ৞ যদি দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারের ভেতর এক্সট্রা কেয়ার নিতে পারেন।
- ৞ অবশ্যই অনাবাসিক। কেন, সে-ব্যাপারে পরে আসছি...

‘মেয়ে বিবাহ-শাদির আগ পর্যন্ত তার মায়ের চোখ থেকে আড়ালই হবে না’—এক সাথি বলেছিলেন; কোনো আলিমের মুখে শুনেই বলেছেন। আমি মানতে পারিনি। আজকে ২ মাসের বাচ্চা থেকে নিয়ে ২৫ বছরের যুবতী ধর্ষণ হচ্ছে। আজকে বুঝে এসেছে, সেই কথার বাস্তবতা।

কুররাতু আইয়ুন ২

আমার ছোটবোন পড়ে ক্লাস নাইনে, ঢাকার প্রখ্যাত এক গার্লস স্কুলে। স্কুলড্রেস এর সাথে মিলিয়ে সাদা বোরকা, নিকাব পরেই যায়। ওর স্কুলে আরও বহু মেয়ে ড্রেসকোড মেনেই পরদা করে—মা শা আল্লাহ। নারী টিচারের ক্লাসে নিকাব সরিয়ে রাখে। ক্লাস নাইনে ওঠার পর একদিন বলছে, ‘ভাইয়া, আমি আর স্কুলে যাবো না।’ ‘কেন রে, যাবি না কেন? কী হয়েছে?’—জিজ্ঞেস করলাম। বললো, ‘ভাইয়া, আমার চারপাশে যে-মেয়েগুলো বসে (সিট ফিক্সড), ওরা সারাদিন ওদের বয়ফ্রেন্ডের গল্প করে—বয়ফ্রেন্ড কাল কী করেছে, কী বলেছে, কোথায় দেখা করেছে! আমি ওদেরকে নিষেধ করি; বলি—এগুলো হারাম; ওরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। আমার এগুলো শুনতে একদম ভালো লাগে না।’

এটা আমার সমস্যা না যে, মেয়েগুলো বথে গেলো। সমস্যা হলো, এইসব শুনতে-শুনতে আমার বোন না আবার এগুলোকে নরমাল ভাবা শুরু করে। আমার উদ্বেগ হলো, আমার বোন এইসব আলোচনা শুনে-শুনে তারও না আগ্রহ জন্মে—ইশ, আমারও যদি একটা বয়ফ্রেন্ড থাকতো। মানে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, জেনারেল শিক্ষাতেই উপরের ৫টি পয়েন্ট আপনি নিশ্চিত করার পরও কিন্তু আমরা নিশ্চিত না যে, আমার মেয়েটা বিগড়ে যাবে না। বিগড়ানো বান্ধবীদের সংস্পর্শ থেকেও তাকে বাঁচাতে হবে। শেষমেশ আমি আর মা মিলে ফয়সালা দিলাম—‘বছরের মাঝে আর কী করা, তুমি ক্লাস করবা তোমার নির্ধারিত সিটে, আর দুই ক্লাসের মাঝের সময়ে তোমার মতো আর যে-মেয়েগুলো আছে, তাদের সাথে থাকবা, গল্প করবা। ক্লাস শুরু হলে আবার নিজের সিটে এসে বসবা।’

থ.

মাদরাসা শিক্ষা আরেকটি অপশন। সমস্যা হলো, মাদরাসা শিক্ষা বিশেষভাবে আবাসিক। সমস্যাগুলো বলছি—

মেয়েরা—ভালো বা খারাপ, সব বিষয়ে—প্রচণ্ড পরিমাণে মুতাআসসির (প্রভাবিত) হয়। ছেলেদের সাইকোলজির ইগো/ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ/পুরুষসুলভ প্রতিযোগী মনোভাব ছেলেদেরকে একটি নির্দিষ্ট লেভেলের পর আর কারও দ্বারা প্রভাবিত হতে দেয় না। আর মেয়েদের স্বভাবসুলভ পরনির্ভরতা/কমনীয়তা/সহযোগী মনোভাবের কারণে তাদের রেজিস্ট্যান্স কম। দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এ-জন্য আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থাটা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। একজন মেয়ে বথে গেলে তা দ্রুত আর-দশজনকে নষ্ট করে দেয়। এ-জন্য বহু

মরচে-পড়া আগুন

উলামায়ে কিরামও মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে, কিন্তু আবাসিক মাদরাসার বিরুদ্ধে। আমার স্বল্পজ্ঞানে জানি, এর বিরুদ্ধে ফতোয়াও আছে।

আরেকটি সমস্যা আমি বেশ কজন যুবক আলিমের কাছে শুনেছি—স্বামীকে মানার ব্যাপারে কিছুটা ব্যত্যয় দেখা যায়। এর কারণ হতে পারে, সেই ‘ভুল সোহবত’। আরেকটি কারণ এটি হতে পারে, আবাসিক পড়াশোনার ফলে পরিবারের সাথে না-থাকার কারণে পারিবারিক কৌশল-আবেগ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অভ্যস্ত না-থাকা—একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বন্ডিং-ইন্টার্যাকশন সম্পর্কে অস্ত্র থেকে যাওয়া; যদিও এটা ঢালাও কোনো কথা নয়, বহু ব্যতিক্রম আছে।

আরেকটি বিষয় ঘটে সব আবাসিক-থাকা মেয়েদেরই, শুধু মাদরাসায় না। সেটি হলো, মাদরাসায় পড়াকালীন তো সাংসারিক কাজকাম নেই; এমনকি বাসায় যখন আসে ছুটিতে, তখনও মা-বাবার আদরে ঘরের কাজের অভ্যাসটা আর হয়ে ওঠে না—মেয়েটা এত দিন পরে এলো, একটু জিরোক। এ-জন্য মাদরাসার মেয়েদের নামে একটি বদনাম আছে যে—ভালো সংসারী না। বিষয়টি এমন নয় যে, তাদের ইচ্ছে করে না, বরং তারা অভ্যস্ত হয় না। বিষয়টি মেয়ের বাবা-মা একটু যত্ন নিলেই সমাধান সম্ভব। একজন আলিমার পাশাপাশি একজন ভালো স্ত্রী, ভালো মা হবার শিক্ষাও দিয়ে দেওয়া সম্ভব।

আরেকটি সমস্যা। আমার ভায়রা তার ৫ বছরের মেয়েকে কোথায় দেবেন, খুব পেরেশান ছিলেন। তার প্রধান উদ্বেগ ছিলো, মাদরাসায় উস্তাযরা বাচ্চাদের প্রহার করেন। ছেলে বাচ্চাকে প্রহার করায় তার আপত্তি নেই; কারণ, ছেলেদের না-মারলে আসলে হয় না। কিন্তু মেয়েদের মারার অতটা প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি উনি বলেন, ‘আমার মেয়ের গায়ে আমি নিজেই হাত তুলি না, অন্য কেউ কেন তুলবে!’ আমি একমত—বাবারও মেয়ে-শিশুকে প্রহার অনুচিত বলেই আমি মনে করি। অন্য আরেকটি কারণ আছে; ভিন্ন কোনো লেখাতে আল্লাহ তাওফিক দিলে বলব। আসলে মেয়েদেরকে তো একটু চোখ গরম করলেই হয়, মারা লাগে না।

আলিমগণ আমাদের জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য কী ব্যবস্থা নেন, এ-জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই। উনারা আরও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত। ফলে আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরকেই করতে হবে। আপাতত, অনাবাসিক রেখে যত দিন মেয়েকে মাদরাসায় পড়ানো সম্ভব, পড়ান। (উপরের ক্লাসগুলোতে সম্ভব না) নিজে নিয়ে যান, নিয়ে আসেন।

কুররাতু আইয়ুন ২

গ.

ঢাকায়, অনেক মহল্লায় দ্বীনি ভাইয়েরা এই কাজ করেছেন; নিজেরা একটা বাসা ভাড়া করে, উস্তায় নিয়োগ দিয়েছেন। একই পাড়া-মহল্লার কাছাকাছি বয়েসের মেয়ে-বাচ্চারা পড়াশোনা করছে। আমার ভায়রা মুহতারামের বিন্দিংয়ের উপরতলায় একটি মাদরাসা করেছেন। সকালে একজন উস্তায়া আসেন, ২ ঘণ্টা পড়ান। সন্ধ্যায় একজন উস্তায় আসেন, ৬-৭টা বাচ্চা পড়ে। কারিকুলামও নিজেদের মতো করা—খুব সম্ভব সৌদি মাদরাসার সানাওয়ি কারিকুলাম। আপনারাও উলামায়ে কিরামের পরামর্শে এমন সেট-আপ করে নিতে পারেন। ঘরোয়া পরিবেশ হবে না, ফুল একাডেমিক পরিবেশ করে দেবেন। পরিবেশই তো দরকার, দেখতে যেন মনে হয় একটি মাদরাসা।

সিলেবাস বানান—বাংলা দ্রুতপঠন, ইংরেজি, আরবি, ফিকাহ, হাদীস, ভূগোল, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, বিজ্ঞান, অংক, স্বাস্থ্যশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, হিসাবরক্ষণ ওগাইরা-ওগাইরা। দশ-পনেরো বছরের কোর্স বানান। ঐ ঐ বিষয়ের ছাত্রী পেয়ে যাবেন শিক্ষিকা হিসেবে। খাদিজার আন্নার আগে এক মেয়ের সাথে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিলো, সেই মেয়েটি বাসায় টিচার রেখে পড়ে-পড়ে ‘ও-লেভেল’ পাশ করেছে। মক্কার উম্মুল কুরা ভার্শিটির প্রোফেসর ড. আবদুর রহমান স্যারের স্ত্রীর কাছে কানাডায় থাকাকালীন গোটাবিশেক বাচ্চা হিফজ করেছে, নানা দেশের। হবে না কেন? না-হবার কী আছে?

নিজে কিছু সময় দিন, গুরুত্ব দিন। ‘সময় নাই’—বলবেন না। ‘সময় নাই’ মানে আপনার ‘প্রায়োরিটি লিস্টে’ নেই; এটিকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। এটি সমাজবিপ্লবের অস্ত্র—জংধরা, শানাতে হবে। মানুষ করছে, পারছে, আপনিও পারবেন, আমরাও পারবো। ইন শা আল্লাহ।

ঘ.

এডাল্ট মেয়েরা, যারা দ্বীনের উপর চলতে চায়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা দরকার। সালাফি ভাইয়েরা ‘অনলাইন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি’ করেছেন—আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বোন-ভাই শিখছেন। উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ থেকেও হয়েছে ‘ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা’।^[১] আরও এমন অনলাইন একাডেমি হোক, ‘ই-মাদরাসা’ হোক—দ্বীন শিখুক।

[১] ঘরে বসে নারীদের জন্য দ্বীন শিক্ষার এক অনন্য সুযোগ আছে ‘Aslaf Arabic Academy’

মরচে-পড়া আগুন

তাবলিগের ‘মান্তরাতে’র মেহনত’ দারুণ ফলপ্রসূ। এখানে দ্বীনের মোটা-মোটা জিনিস শেখার সাথে-সাথে অন্যের দ্বীনি জীবন দেখেও আগ্রহ আসে দ্বীন মানার। কারও মাঝে ‘আগ্রহ’ জাগাতে এবং প্রাথমিক জরুরি ইলম শিখতে এটা খুব ইফেক্টিভ। বাংলায় বহু সালাফদের কিতাব অনূদিত হচ্ছে। বাসায় লাইব্রেরি করে ফেলুন। মা-বোনেরা শিখুক। জং সুরুক, অস্ত্র শানুক।

শাইখ আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, ‘কিছু সংখ্যক মেয়েকে রীতিমতো শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে তারা অন্যান্য মেয়েদের শেখাতে পারে।’^[১] আর অস্ত্র ফেলে রাখবেন না। আসুন, আমাদের মেয়েদের এক-একজন ‘উস্তাযা’ হিসেবে গড়ে তুলি। প্রত্যেকেই যেন নিজ সন্তানদের মুসলিম করে গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ না-করুক, কোনো দিন যদি কাফেরের হাতেও পড়ে, তাতারিদের মতো সেই কাফেরও যেন ইসলামের খোঁজ পেয়ে যায়; এ-রকম করে আসুন, আমাদের মেয়েদের শানিয়ে তুলি। অনেকে ভয় পায়, মেয়েদের বেশি শেখালে বেয়াদব হয়ে যায়।^[২] একদম ভুল। জ্ঞানী-গুণী নারী স্বামী-সোহাগিনী এবং বিনীত হবারই কথা। কেননা ‘ফলবান বৃক্ষ তো নতমুখীই হয়’ আর ‘ফাঁকা কলসিই বাজে বেশি’। তাই কলসি ভরিয়ে দিন—ইলমে-জ্ঞানে-নূরে।

তা হলে আর দেরি কেন! কোমর বেঁধে শান দিতে লেগে যান—বিপ্লবের মারণাস্ত্রে, যুগ বদলানোর মহাস্ত্রে।

তো। অনলাইনে ক্লাস করে আমাদের দেশেরই এই প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বীন শিখছে আমাদের মেয়েরা। কুরআন, তাজওইদ, আরবী ভাষা, ফিকহ, আকীদা, দুয়া, হিফয সহ আরও অনেক কোর্স রয়েছে। ১০-১২টি দেশের প্রবাসী বোনেরাও এ সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। যোগাযোগ এর ঠিকানা: www.aslafacademy.com কিংবা facebook.com/aslafacademy

[১] নারী জাতির সংশোধন, মোহাম্মদী লাইব্রেরি, পৃষ্ঠা ১৬৬

[২] ইলমের সাথে-সাথে আদবের দীক্ষার কমতি ঘটলে এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা সমাধান নয়, বরং মাথাব্যথা কেন হলো সেটি চিহ্নিত করে যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া কর্তব্য। এমনভাবে বেশি শেখালে কেন বেয়াদব হয়, সেই সমস্যার গোড়া খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করা উচিত। মূলত ‘বেশি শেখালে বেয়াদব হয়’ এমন ধারণা ইলমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। কারণ, এই কথার মধ্যে ইলমকে গুণ নয়, দোষ হিসেবে প্রকাশ করা হয়; তাই এই জাতীয় কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক।—সম্পাদক

সন্তানের যৌনশিক্ষা

যৌনতা নিজেই একটি ট্যাবু (যে কথা যায় না বলা)। বাপ্পারটি এমন নয় যে, শুধু পাক-ভারত-বাংলাতেই ট্যাবু, বা মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোতেই ট্যাবু; বেসিকালি চিরকাল ট্যাবুই ছিলো একেশ্বরবাদী সমাজগুলোতে। রক্ষণশীল ইহুদি-সমাজে ও ক্যাথলিক-সমাজে যৌনবিষয়ক খোলামেলা আলোচনা হতো, এমন খবর তো খেপড়ে না। মূর্তিপূজারি এবং প্যাগান-সমাজে যৌনতা খানিকটা খোলামেলা থাকলেও আলোচনাও ট্যাবু ছিলো না, কখনোসখনো সেগ্ন ছিলো পূজারই অংশে। এ-জন্য বাৎসায়নের কামসূত্র, বাজুরাছের মন্দির, শিবলিঙ্গপূজায় এর আঁচ করা যায়। একো-রোমান-সমাজে সমকামের ব্যাপক প্র্যাকটিস, উল্লম্ব মূর্তির দ্রুত প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিক যৌনতাও কতটা খোলামেলা ছিলো।

পুঁজিবাদের উত্থানের সামনে যখন সামাজিক-পারিবারিক-ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াতে থাকলো, তখন ট্যাবুগুলোকে ভেঙে ব্যবসাবান্ধব করার প্রয়োজন দেখা দিলো। বিংশ শতকের শেষ ভাগে এসে এমন-এমন সব থিংওরিং দেখা মিললো, যা যৌনতার সংজ্ঞাকেই বদলে দিলো। খুব ভালো করে দেখুন, যৌনতার সংজ্ঞা বদলে দিতে পারলে সামাজিক-পারিবারিক-ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো ভেঙে দেওয়া যায়। করও মনে 'জেন্ডার-থোড়ার উপর বাজি' ধরতে পারলে—মানে, একটু বিজ্ঞানের মিশেলে যদি যৌনতার এইসব বিকৃত সংজ্ঞা বসিয়ে দিতে পারেন, তা হলে ধর্ম ও পরিবার থেকে তাকে টাশ করে বের করে আনা যায়। এখন সে পুঁজিবাদের সকল দোকানের সহজ শিকার, বাজা কাস্টমার। সেগ্নুয়াল ডুইটিটি, ট্রান্স-জেন্ডার, লাইফস্টাইলের নামে পশুকাম-সমকাম, 'লিঙ্গ দৈহিক বিষয় না, সমাজ কর্তৃক আরোপিত'—ইত্যাদি কনসেপ্টের নামে সেই আয়োজনই করছে পুঁজিপতিরা। গে-জিনের আবিষ্কার নিজে সমকামী, 'জেন্ডার' কনসেপ্টের পুরোখা জন মানি নিজে উভকামী; এগুলো না-ধরতে পারলে—আসেন, মুড়ি খাই।

আমার স্বল্প পড়াশোনায় মনে হয়েছে, ইসলাম যৌনতাকে ঠিক সেভাবেই দেখে, যেভাবে দেখা প্রয়োজন। এটি একই সাথে ট্যাবু (আলোচনা নিষেধ) এবং

সম্ভানের যৌনশিক্ষা

‘আলোচনা-জরুরি’ ব্যাপার। এর অর্থ আলোচনা যেমন নির্লজ্জতা, এর আলোচনা না-থাকাটাও বুদ্ধিপূর্ণ। ঠিক ততটুকুই আলোচনা হওয়া চাই, যতটুকু ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ঠিক রাখতে দরকার। প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে ইয়ার্কি-ফ্যান্টাসির সীমায় গিয়ে পড়লে এটা অবশ্যই ট্যাবু। ‘সত্য বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল লজ্জা পান না’—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু যৌন-আলোচনা বা যৌনশিক্ষা দ্বীনেরই অংশ—যেহেতু যৌনজীবন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এ-জন্য ইসলামে রজঃচক্র, স্বামী-স্ত্রী সহবাস, জানাবাত, বালগ হওয়া প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচনা এবং আরও বিস্তারিত আলোচনার সূত্র দেওয়া হয়েছে।

কুরআন-হাদীস-ফিকহের কিতাবাদিতে এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা ও প্রায়োগিকতার মাঝে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, যা দ্বীনি ইলমেরই অংশ। ‘যৌনশিক্ষা’ শিরোনাম ব্যবহার করলে তা অহেতুক অনাবশ্যক কৌতূহলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ‘যৌনশিক্ষা’ শব্দটা একবারও উচ্চারণ না-করেই ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষকে যৌন বিষয়ে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলে। গত ১৪০০ বছর ধরে এভাবেই ইসলাম প্রয়োজনীয় সবটুকু যৌনশিক্ষা শিখিয়ে দিয়েছে ও দিচ্ছে—খুব আলতো করে, টেরও পাওয়া যায় না।

আজ মুসলিম-সমাজেও যৌনশিক্ষা ট্যাবু কেন? যখন থেকে ব্রিটিশরা শিখিয়েছে—‘ইসলাম হলো ধর্ম, জাস্ট ধর্ম’, সে-দিন থেকে আমাদের ধ্বংস শুরু।^[১] বৈয়য়িক ব্যাপারে, দুনিয়ার ব্যাপারে হাদীসের সাথে, আলিম-উলামার সাথে সে-দিন থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেছি আমরা। নামাজ-রোযা-হজের বাইরে আর কোথাও ইসলাম নেই। বাজার-অর্থব্যবস্থা-বিচার-আইন-লাইফস্টাইল—সবখানে ইসলাম অপাত্তভ্রম্য হয়ে গেছে সে-দিন থেকে। ইসলাম মানে আর ‘আত্মসমর্পণ’ থাকেনি, ইসলাম মানে হয়ে গেছে ‘শাস্তি’। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানেও যে ইসলাম আছে, আমার

[১] আসলে ধর্মের পশ্চিমা সংজ্ঞা যদি আমরা গ্রহণ করি, তা হলে এভাবে বলা ও ভাবা ঠিক আছে যে, ইসলাম কেবলই একটা ধর্ম নয়, এরচেে অনেক বেশি কিছু। কারণ, তাদের কাছে ধর্মের সীমানা প্রার্থনাশালার চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ—সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনে ধর্মের কোনো স্থান নেই; পক্ষান্তরে ইসলাম এমন নয়। বরং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিজীবন—সর্বক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপ্তি ও নির্দেশনা রয়েছে।

কিন্তু যদি আমরা ধর্মের ইসলামী সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তা হলে ইসলাম একটি ধর্মই। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের উপস্থিতি সর্বত্রই থাকা আবশ্যিক—এটিই বেশি উত্তম মনে হয়। কারণ, তা না-হলে নামাজ-রোযা-হজ-যাকাত ইত্যাদি হবে ধর্মীয় বিষয়, আর লেনদেন, বিচার, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি বৈয়য়িক বিষয়গুলো হয়ে যাবে ধর্মীয় বিষয়ের বাইরের ভিন্ন কিছু, যা সঠিক নয়।—সম্পাদক

আর আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝেও যে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে, তা আজ স্বীকারই করে না, এমন মুসলিমও আছে। এ-জন্যই শোনা যায়—‘সব কিছুর মধ্যে শুধু ধর্ম টেনে আনিস কেন?’ টেনে আনবো কেন, ইসলাম তো আছেই সব কিছুর মধ্যে। সব কিছুতে নিজের ইচ্ছাকে দমিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকেই তো বলে ইসলাম।

ভূমিকা অনেক বড় হয়ে গেলো, স্যরি। আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষাটি সন্তানকে না দেন, তবে বেঠিক সময়ে বেঠিক লোকে তাকে বেঠিক শিক্ষাটা দেবে। হয় সে বখে-যাওয়া কোনো বন্ধুর থেকে শিখবে, না হয় ইন্টারনেট তার শিক্ষক হবে, নয়তো কোনো পর্নম্যাগাজিন বা কলিকাতা হার্বালের পোস্টার থেকে সে যৌনতা সম্পর্কে ভুল এবং অপ্রায়োগিক জ্ঞান পাবে, যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই।

কোনো ‘ইঁচড়ে-পচা’ বন্ধু তাকে শেখাবে ‘ডানহাতি স্কু নিয়ম’। (সায়েন্সের পোলাপান বুঝবে)

ইন্টারনেট তার কাছে বমিযোগ্য কিছু প্র্যাকটিসকে পবিত্র ও উপভোগ্য করে তুলবে।

ফুলবডি মেকাপ ও সিলিকন-জেল-চুকানো পর্নস্টারগুলো স্বাভাবিক নারীদেহ সম্পর্কে তার মনে ভুল প্রত্যাশা গড়ে তুলবে।

সার্জারি করে বানানো অতিকায় পুরুষাঙ্গ তার মনে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স তৈরি করবে।

ভায়াগ্রা খেয়ে ৭ দিন ধরে শুটিং-করা ১০ মিনিটের ভিডিও বিয়ে নিয়ে তার মনে অমূলক অহেতুক আশঙ্কা তৈরি করবে।

আর বড়-বড় করে ‘যৌন’ লেখা কলিকাতা হার্বালের পোস্টার তাকে বোঝাবে—তোমার শরীর থেকে কী না কী ইম্পটেন্ট জিনিস বের হয়ে যাচ্ছে, তু তো গ্যায়া।

খেলাধুলা-কার্টুনের মাঝে তার সন্তাকে সীমাবদ্ধ ভাববেন না। এগুলোর বাইরে আরেকটি জগত তার মনে গড়ে ওঠা শুরু হয়ে গেছে—যৌনমনোজগত। শুরুতেই সেই জগতে একটি টিকা (ভ্যাক্সিন) দিয়ে দেওয়া আপনারই কাজ, যাতে পরে কোনো রোগজীবাণু ঢুকতে না-পারে। সঠিক ধারণাটা দিয়ে দিলে, ভুল ধারণাগুলো জায়গা পাবে না। আর এখন তো স্কুলে-স্কুলে ‘যৌনশিক্ষা’ শিরোনামেই আপনার

সন্তানকে বিকৃত ধারণা দেওয়া হচ্ছে। এ-জন্যই পাশ্চাত্য সেকুলার যৌনশিক্ষার কাউন্টারে আমাদেরকেও ‘যৌনশিক্ষা’ শিরোনামেই আলোচনা করতে হচ্ছে এই অধ্যায়ে। নাচ যখন শুরুই করেছো, তখন আসো, থোমটা ফেলেই নাচি।

ছেলে-বাপাদের

পিরিয়ড শুরু হয়ে গেলে আমাদের মেয়েরা বেসিক যৌনশিক্ষাটা মায়ের কাছ থেকে পেয়ে ফেলে। নারী-পুরুষ বায়োলজির কারণ, ক্রিয়া, পিরিয়ডের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে মেয়েরা জেনে নেয় মায়ের কাছে থেকে। এ-জন্য মেয়েদের জানাটা সেফ ও সঠিক হয়। যতটুকু আলোচনা মা-মেয়েতে হয়, দ্বিনি সীমারেখাগুলো আলোচনা করা থাকলে তা যথেষ্ট। আমরা একটা ডেমো দেখবো একটু পরে। আর বিয়ের আগে ভারী/বড়বোন/সমবয়সী খালা-ফুপুদের কেউ সহবাস রিলেটেড আলোচনাগুলো করে দিলেই হয়ে গেলো। তবে সমস্যা হলো, সবাই এগুলো নিয়ে জোকস করে, কেউ সিরিয়াসলি কিছু আলোচনা করে দেওয়া দরকার। অবশ্য যারা আলোচনা করবেন, তাদের কজনাই স্পষ্ট ধারণা আছে।

সমস্যা হলো ছেলেদের—ব্যাপক সমস্যা। মেয়েরা মায়েরও ক্লোজ থাকে, বাবারও আদর পায়; পারতপক্ষে বাবারা মেয়েদের বকুনি/পিটুনি দেয় না বললেই চলে, মেয়েদের অত শাসন লাগেও না। কিন্তু ছেলেরা মায়ের আত্মদা পায়, কিন্তু এ-সব বিষয়ে ফ্রি হওয়া সম্ভব না। আবার বাপের সাথে কিছুটা মারপিটের সম্পর্ক থাকে বলে বাবার সাথে বেশ দূরত্ব নিয়েই বড় হই আমরা—বাপে-তাড়ানো মানে-খেদানো। এ-কারণে মেয়েরা যতখানি সঠিক যৌনশিক্ষা নিয়ে বড় হয়, ছেলেদের মনে ততটাই বেঠিক শিক্ষা গেড়ে বসে। তবে ফাইনাল কথা হলো, ছেলেরা যৌনশিক্ষা বাবার থেকেই পেতে হবে। কেননা, বাবা ছাড়া আর যত সোর্স সে এই বয়সে পায়, সবাই তাকে ভুল শিক্ষাটাই দেবে। বাবা হয়ে কীভাবে সম্ভব? কেন, মা হয়ে মেয়েকে শেখাতে পারলে বাবা হয়ে কেন পারবেন না? এ-সব ন্যাকামো বাদ দিন, বিষয়টি কতখানি জরুরি, এটা ফিল করি, আসুন। ছেলে পর্ন-আসক্ত বা সমকামী হয়ে গেলে তখন তো—‘হায় হায়’—করবেন। কিছু পয়েন্ট মনে রাখতে হবে—

- ১) বিষয়টি বারবার আলোচনা করার মতো না। বারবার আলোচনা করলে সন্তান আর ভয় পাবে না আপনাকে, ওয়েট লস হবে। এ-জন্য আলোচনা হবে একদিনই—মাইন্ড ইট।

৩ বাপ-ছেলে বা রাজা-প্রজা স্টাইলে হলে সে আপনার কথাটা নিতে পারবে না, হুকুম-টাইপ কিছু মনে করবে। আলোচনাটা হবে ওস্তাদ-শাগরেদ স্টাইলে। এ-জন্য হতে পারে বাপ-বেটা কোথাও বেড়াতে গেলেন, সাথে নিয়ে মার্কেটে গিয়ে একসাথে কিছু কিনলেন, একসাথে মাকে ছাড়া কোনো রেস্টুরেন্টে খেলেন। মূল কথা পাড়ার আগে এমন কিছু একটা করতে হবে, যাতে পরের আলোচনা ‘হুকুম’ আকারে না-হয়ে ‘ট্রেনিং সেশন’ আকারে হয়। কেন বাবা-ই? কেন অন্য কেউ নয়? কারণ, বর্তমানে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কটা টেক্সটবুকীয় সম্পর্ক। টেক্সটবুকের বাইরে শিক্ষকের এই আলোচনা ছাত্র টেক্সটবুকের মতো অপ্রায়োগিক একটা ক্লাস হিসেবেই নেবে; এ-জন্যই স্টাইলটা ওস্তাদ-শাগরেদ। ওস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্ক টেক্সটবুকীয় না। এই টপিকে বন্ধুর আলোচনার চেয়ে শিক্ষকের আলোচনা কখনোই বেশি দাগ কাটবে না। আর সত্যি বলতে শিক্ষকের এখন ছাত্রদের মনে সেই পজিশনও নেই; সুতরাং শিক্ষক দিয়ে হবে না। আর একসাথে একই বয়সের ছেলেদের এ-সব আলোচনা ওরা কিছুটা ফানি হিসেবে নেয়। এ-জন্য বাবা তার ছেলের সাথে আলোচনা করবেন—ওয়ান-টু-ওয়ান। শিক্ষকের মতো বাবা কেবল রেজাল্টের শুভাকাঙ্ক্ষী নন, ছেলের জীবন-মরণ-জীবিকা-দাম্পত্য সব কিছুর শুভাকাঙ্ক্ষী। বাবার টোনটাও অমনই হবে—‘বাপ রে, আমি তোর ভালো চাই! আমি চাই না, তুই জীবনে কোথাও কষ্ট পাস, জীবনের কোনো মোড়ে দাঁড়িয়ে আফসোস করিস।’ এই টোনে বাবাকেই করতে হবে আলোচনা।

শুরুটা এমন হতে পারে :

বাবা শোনো, তোমার সাথে খুব জরুরি একটি বিষয়ে আলোচনা করবো। তুমি আজকের এই আলোচনাটা জীবনে কোনো দিন ভুলবে না; এমনকি আমি যেভাবে তোমাকে বলছি, সেভাবে তুমিও তোমার ছেলের সাথে এভাবে আলোচনা করবে।

তুমি এখন বড় হচ্ছে। ভেবে দ্যাখো, একসময় তুমি খেলনাগাড়ি কত পছন্দ করতেক! এখন তুমি ক্রিকেট-সেট, ফুটবল—এ-সব পছন্দ করো। বড় হবার সাথে-সাথে তোমার মনের কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে, দেখেছো? একইভাবে তোমার দেহেও পরিবর্তন এসেছে/আসছে/আসবে। লম্বায় বড় হবার সাথে-সাথে তোমার

সস্তানের যৌনশিক্ষা

গলার স্বর মোটা হবে, যেমন আমার। তোমার শরীরের গাঁথুনি শক্তপোক্ত হবে... এবই অংশ হিসেবে প্রত্নাবের রাস্তা দিয়ে প্রত্নাবের বদলে আঠালো একধরনের তরল আসতে পারে; তুমি ভয় পাবে না—এটাই স্বাভাবিক, সবার হয়। তোমার মতো বয়সে আমারও হয়েছে। কখনো দেখবে ঘুমের ভেতরে বেরিয়েছে—ভয়ের কিছু নেই, এটা কোনো অসুখ না...

স্বপ্নদোষ বেশি হওয়াও কোনো অসুখ না, এটা বোঝাবেন। একটি গ্লাসে দেড় গ্লাস পানি রাখলে বাকিটুকু উপচে পড়ে, তেমনি একটি বিষয় স্বপ্নদোষ। উৎপাদন তো চলছেই, ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে গেলে বেরিয়ে আসে। এখন তোমার করণীয়, বেশি-বেশি ভালো-ভালো খাবার খাওয়া। ফলমূল খাওয়া, ডিম-মাছ-মাংস খাওয়া। মন থেকে টেনশন দূর করে দেবেন।

নারী-পুরুষ ক্রেমিস্ট্রিটা খুব সংক্ষেপে বলে দেবেন

দ্যাখো, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ আছে—পুরুষ আর মহিলা। তোমার কি প্রশ্ন জাগে, কেন মানুষ এক ধরনের হলো না? এটা হচ্ছে সিস্টেম। তোমার শরীরে যে আঠালো পদার্থ তৈরি হচ্ছে, সেটি হলো বীজ। আর তুমি যে-মেয়েকে বিয়ে করবে, তার শরীরে এই বীজ নোঁছালে, তোমাদের সন্তান জন্ম নেবে। এভাবে মানুষের জন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন আল্লাহ। এভাবে নতুন শিশু জন্ম নেয়।

আবার আল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিতে হবে

তোমার দুই বন্ধুরা তোমাকে বিভিন্ন আজীবাজে বুদ্ধি দেবে। তুমি আমার কথা মনে রাখবে। সস্তানের জন্য বাবার চেয়ে ভালো আর কেউ চায় না। এই বীজ এমনিতেই উপচে বেরিয়ে গেলে সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় বের করলে আল্লাহ ভয়ংকর রাগ করেন। তোমার শরীর ভেঙে পড়বে, তোমার বিবাহিত জীবনেও নানা অসুখবিসুখে অশান্তিতে আক্রান্ত হবে। এই বীজ কেবল তোমার স্ত্রীর জন্য, বন্ধুদের পাশ্চাত্য পড়ে নিজেকে শেষ করে দেবে না। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে হবে, ভালো লাগবে; কিন্তু আল্লাহ তোমাকে সেটা নিষেধ করেছেন, তোমার দৃষ্টিও কেবল তোমার স্ত্রীর জন্য। খারাপ ছবি-সিনেমা থেকে সব সময় দূরে থাকবে; এগুলো যে-বন্ধুরা দেখে বা দেয়, তাদের থেকেও দূরে থাকবে। না-হলে তোমার ভবিষ্যত কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাবে, বাবা। সাবধান... বাবা হিসেবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ। আর এ-বিষয়ে যে-কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন তুমি বন্ধুদের করবে না, আমাকে করবে, ঠিক আছে, বাবা?

রাফলি এমন। এখন, কোনো সময়ে আপনি তাকে এই সেশনটা নেবেন? কখন? ১১-১২ বছরে ছেলেরা বালগ হয়। তবে এখন পূর্ণর যুগে ৯-১০ বছরের বাচ্চারাও সব বোঝে। যদি সন্দেহ উদ্বেককারী লক্ষণ না-পান, তবে ১১-১২ বছরেই আলোচনাটা হবে। আর সন্দেহের কিছু পেলে, তখনই। এখন কিশোর-কিশোরীদের নাকি আবার যৌনশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সরকারি-বেসরকারিভাবে। সেখানে যৌন-তারল্য (তুমি যা ভাবো, তা-ই তোমার যৌনতা, লিঙ্গের উপর না) শেখানো হয়। পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন-অনুভূতি প্রকাশ নাকি দোষণীয় নয়! সমকামিতাকে ইনিয়ুবিনিয়ে স্বাভাবিক করে তোলা হয়। এ-রকম জঘন্য পরিস্থিতিতে আপনি যদি তাকে সঠিক শিক্ষা দিতে লজ্জা করেন, তা হলে আল্লাহ মাফ করুন, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনায় কাকে দোষ দেবেন!

সমকামী হবার পেছনে দুটো মূল কারণ আমার সিদ্ধান্তে এসেছে। দুটোই বয়সসন্ধিকালের আগেই গড়ে ওঠে। মানে, কারও সমকামী হয়ে ওঠাটা তার বয়ঃসন্ধির আগেই ঠিক হয়ে যায়। এখানে প্রাসঙ্গিক কারণটা হলো—বোনদের মাঝে বেড়ে ওঠা। নিজের লৈঙ্গিক স্বকীয়তা অনুভব না-করা। এ-রকম একাধিক কেস আমি পেয়েছি। দুই বা তিন বোনের এক ভাই। ছোটবেলা থেকেই বোনদের সাথে থাকে, বোনরা সাজায়, বোনরা ছেলেদের গল্প করে, সে শোনে, মুগ্ধ হয়। মা হয়তো ভাবে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বাবাও কেয়ার করে না, বা সময় দেন না। ধীরে-ধীরে নারীর বদলে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে। অতীত-নাংরা জীবন থেকে তাবলিগের মাধ্যমে দ্বীনের বুঝ পেয়েছেন, এখন ট্রান্সজেন্ডার-হিজড়াদের মাঝে মেহনত করছেন, এমন এক ভাই জানিয়েছেন, আপনারা যেমন নারী থেকে নজরের হেফাজত করেন, আমাকে সব ছেলে থেকে চোখ বাঁচিয়ে চলতে হয়। কত কষ্ট করে ইজতেমায় আসি, আমি জানি।

আরেক মেডিকেলপড়ুয়া, খুব চেষ্টা করছেন সংশোধনের, ৩ বোনের একভাই। বাবা প্রবাসী। বারবার করে কেঁদে দিলেন; বাবা না-থাকায়, বয়ঃসন্ধির আগে কেউ চিনিয়ে দেয়নি যে, তুমি ছেলে। মেয়েদের মতো সাজাতো বোনেরা, সবাই মজা পেতো দেখে। ধীরে-ধীরে নারীসুলভ মুভমেন্ট এসে গেলো। ইসলামের বিধান খুব ক্রিয়াকারক। একটা বয়সের পর ভাইবোন এক বিছানায় শোবে না, একসাথে থাকবে না। পুরুষ কখনোই নারীর পোশাক পরবে না, নারী পুরুষের পোশাক পরবে না। বাবার সংস্পর্শে শিশু পুরুষ হয়ে ওঠে, শিশুরা বাবার মতো হতে চায়। এ-জন্য

সম্ভাবনের যৌনশিক্ষা

যাবারা ছেলে-শিশুদের সময় দেবেন। হাত ধরে মসজিদে নেওয়া, একসাথে বল খেলা, বিকেলে যাবার হাত ধরে বেড়াতে নেওয়া, সাহাবাদের বীরত্বের ঘটনাগুলো শোনানো, বাজার করতে নিয়ে যাওয়া, কিছু বাজারের ব্যাগ টানানো—এগুলো করতে হবে; বিশেষ করে যদি বড়বোনেরা থাকে, তাদের প্রভাব ও জীবনচারণ থেকে শিশুকে বের করে আনতে হবে। সে যেন বুঝে নেয়, শক্তি খরচের কাজগুলো আমাকে করতে হবে, আমি ছেলে, আমার বোনেরা করবে না এগুলো। শক্তিমস্তা, বীরত্ব এগুলো যেন তার প্যাশন হয়; সাজগোজ আর পুতুলখেলা না। আরেকটি কারণ হলো : বয়ঃসন্ধির আগেই সমকামিতার শিকার হওয়া। 'বয়ঃসন্ধির আগেই আবাসিক' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই পরিবেশটা করে দেয়। আমি জানি না, এটা থেকে আপনার সম্ভাবনাকে কীভাবে রক্ষা করবেন!

মেয়ে-বাম্পদের

আব মায়েরা মেয়েদের সাথে যথেষ্ট আলোচনা তো করেনই। বাকি আরেকটু জিনিস স্পষ্ট করে দেবেন :

নারী-পুরুষ ক্রেমিস্টিটা

মেয়েদের প্রতি মাসে একটা ডিম আসে, ডিম্বাণু বলে তাকে। একটাই পরিপক হয়। ওটার প্রভাবে জরায়ুর (যেখানে বাচ্চা থাকে) জমিনটা উর্বর হয়, বীজ নেবার মতো উপযুক্ত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বীজ পেলো তো বাচ্চা তৈরি হবে। আর যদি না-পায়, তবে পুরো জমিনটা চাকা চাকা রক্তের আকারে বেরিয়ে আসে। এটা স্বাভাবিক, তুমি যোহেতু এখন বড় হয়েছো। এই বীজটা কোথায় আছে? বীজ আছে তোমার স্বামীর দেহে...

আর আল্লাহর হুকুমগুলো

আর এখন তুমি বড় হয়েছো। মেয়েদের শরীরে যে-সৌন্দর্য, সেটা তোমার মাঝে এখন আসছে। ছেলেরা তোমার দিকে তাকাবে, তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে, তোমার কাছে ঘেঁষতে চাইবে, মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে তোমাকে জয় করতে চাইবে; তুমি কারও দিকে তাকাবে না, কোনো ছেলের সাথে কথা বলবে না... তোমার স্বামীর সাথে বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত নিজেকে হেফাজত করে চলতে হবে... খারাপ বাফ্রী, যারা ছেলেদের সাথে সম্পর্ক করে, আজোবাজে গল্প করে, তাদের এড়িয়ে চলবে।

কুররাতু আহিয়ুন ২

আরও কিছু জিনিস আরও ছোট বয়সে মেয়েকে শিখিয়ে দিতে হবে। আপনার মাথায় এই কথাটা গোঁথে নিন যে, এটা পির-আউলিয়ার যুগ না, এটা পর্ন আর সাতরঙের যুগ। আগে হলে বলতাম, মেয়ে-শিশু যেন তার মাহরাম ছাড়া কারও কোলে না-যায়, কোলে না-বসে, কারও সাথে বেড়াতে না-যায়; এখন বলবো, মেয়ে-শিশু যেন মায়ের চোখের আড়াল না হয়। শুধু মেয়ে-শিশু না, চাচার কাছে ভাতিজা ছেলে-শিশু নিরাপদ নাই। ‘বাবা, চাচ্চু কতবার এমন করেছে’—ছোট-ছোট হাত ছড়িয়ে বলে—‘এতবার-এতবার।’ সতর্কতায় কাউকে ছাড় দেবেন না—যত আপনজনই হোক, যতই মাইন্ড করুক। মেয়ে-শিশুকে শিখিয়ে দেবেন, কেউ বুকে বা পায়ের মাঝে আদর করতে চাইলে সাথে-সাথে এসে জানাবে। ছেলে-বাবাকেও বাপ-মা ছাড়া অন্য কারও সাথে শুতে পাঠাবেন না। মেয়ে-বাবাকে হাতকাটা ফ্রক পরাবেন না, পায়জামা পরাবেন শিশু বয়স থেকে; বাচ্চাদের পোশাক-পর্দার ব্যাপারে ঘীনদার মানুষেরাও উদাসীন। আপন চাচা-নানা ছাড়া অন্য কারও সাথে ঘুরতে পাঠাবেন না। আর কী দিয়ে বোঝাই!

আরেকটি বিষয়, তাকে ছোট করে না-রেখে, এ-বয়সেই তাকে আদর্শ স্ত্রী বা স্বামী হবার মানসিক শিক্ষা দেওয়া শুরু করুন। মানসিক শিক্ষাগুলো বারবার দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। পুঞ্জিবাদ যদি এ-বয়সে তাকে ‘সেগের জন্য ফিট’ ঠাওরাতে পারে, ‘পারম্পরিক সম্মতিতে যৌনানুভূতি প্রকাশ দোষের না’—শেখাতে পারে, ‘তাদের যৌনশিক্ষা’র জন্য শিশুকে উপযুক্ত মনে করে, তা হলে আপনি কেন তাকে সংসারশিক্ষার জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না? বড়-হয়ে-ওঠা বয়সের দ্বারা নির্ধারণ হয় না, শিক্ষার দ্বারা হয়, মানসিক পরিপক্বতার দ্বারা হয়।

আগের যুগে দেখুন, ১৭-২৫ বছরেই তাদের কত কত অ্যাচিভমেন্ট! ১৭ বছরের মুহাম্মদ বিন কাসিম সিদ্ধুবিজেতা জেনারেল, ইমাম আন-নববী রহ. ইন্তেকালই করেছেন ৪৫ বছর বয়সে,^[১] তা হলে এত বই লেখা শুরু করেছেন কত বছর বয়সে? এখন কেন হচ্ছে না? মনের বয়স আটকে গেছে; ৩০ বছরের ছেলের প্যাশন—প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ কিংবা ডটা-পাবজি গেম। ২৫ বছরের মেয়ের প্যাশন টিভি সিরিয়াল কিংবা শপিং-হ্যাংআউট। ছোটবেলা থেকে কার্টুন-গেম-বার্বিডল-টেডি বিয়ার দিয়ে আমাদের সন্তানদের শৈশবকে আমরা চুইংগামের

[১] ইমাম আন-নববী রহ. জন্মগ্রহণ করেছেন ৬৩১ হিজরিতে আর মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৭৬ হিজরিতে।—সম্পাদক

সন্তানের যৌনশিক্ষা

মতো প্রলম্বিত করে দিয়েছি। বাবা-মায়ের সংস্পর্শে সন্তান ম্যাচিউরড হয়—সেই বাপেরও সময় নেই, মায়েরও সময় নেই। এ-জন্য প্রতি দিন সন্তানকে কিছু সময় দিন, জীবন শেখান। শেখান—উত্থান-পতনের অমোঘ নিয়ম, শেখান—তরঙ্গবিহীন জীবন-নদী সাঁতারের ১০১ টি কলাকৌশল, শেখান—ফিনিজ পাখির মতো কীভাবে আবার ছাই থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়, শেখান—জীবনের ব্রেক কখন কষতে হয়, শেখান—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা। শিখিয়ে দিন সম্পর্ক গঠনের অলিগলি আর মানুষকে মূল্যায়নের আলকেমি। আর শেখান—মরণ :—জীবনের দর্শনই তো মরণ। শ্রেষ্ঠ নসিহত তো মৃত্যুই।

আল্লাহ আমাদেরকে সন্তানের কারণে সমাজে ও হাশরে বেইজ্জত হবার হাত থেকে হেফাজত করুন। সন্তানের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত হিসেবে কবুল করুন। আর সন্তানগুলোকে কবুল করুন আমাদের আমল হিসেবে। আমিন।

কঠিন কথা যায় যে বলা সহজে

স্কুল হেলথ প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম হাসপাতালের তরফ থেকে। নাইন-টেনের ছেলেমেয়েদের একত্রী করেছে। স্বাস্থ্য-পরিদর্শকেরা প্রেজেন্টেশান ওগাইরা শেষ করার পর 'স্টার' সাহেবকে কিছু বলার অনুরোধ জানালেন। একেবারে কিছু না-বলে মেয়েদের বের করে দিলে খারাপ দেখা যায়; মেয়েদের বললাম—ঠিকমতো টাইমমতো যেতে; মেয়েরা যায় না। যত রক্তাল্পতা, লো-প্রেসার, গেস্টিকের বেদনা ৯০%—ই ইয়াং মেয়ে। আর আপনারা ওদিকে বলেন, বিয়ে করে বউকে কী যাওয়াবে? যায়ই তো না কেউ, হাওয়া-বাতাসের আর দাম কত? এরপর শিক্ষিকা আর মেয়েদের একটু বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। আর ছেলেদের সাথে নিচের আলোচনাটা করলাম। বিষয়টা কতটা সিরিয়াস—সবাই বুঝলো মনে হলো। মেটামুটি সেভেনের ছেলে বুঝবে মনে হয়। প্রত্যেকে নিজ সন্তান-ভাগনে-ভাতিজার সাথে আলোচনাটা একটু করে নিলে কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ। কেমন আছে তোমরা সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই ভালো আছি। এত দুর্দিনেও আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন। চারিদিকে কত খুন-রাহাজানি-ধর্ষণ-অগ্নিকাণ্ড! এর মাঝেও আল্লাহ আমাদের আর আমাদের পরিবারের সবাইকে সুস্থ রেখেছেন, নিরাপদে রেখেছেন, এ-জন্য আল্লাহর লাখো-কোটি শুকরিয়া। কী বলো তোমরা?’

আজ আমরা খুব বড় একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো—খুব বড় এবং খুব জটিল একটা সমস্যা। এই সমস্যাটা যদি আমরা এই ছোটবেলাতেই না-ধরতে পারি, আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা যখন বড় হবো, তখন সীমাহীন কষ্টে আমাদের জীবন ভরে যাবে; সে-কষ্ট কাউকে বলাও যাবে না। এ-জন্য খুব মন দিয়ে আমাদের শুনতে হবে আজকের কথাগুলো। যত মন দিয়ে শুনবো, তত সমস্যাটা বুঝতে পারা যাবে। আর যত বুঝতে পারা যাবে, তত আমরা সেই মহাসমস্যা থেকে বাঁচতে পারবো। শুনবো তো সবাই?

কঠিন কথা যায় যে বলা সহজে

তা হলে শুরু করা যাক। দ্যাখো, আমরা ছোট ছিলাম। ছোটবেলায় আমরা খেলনা পছন্দ করতাম, রং-পেনসিল দিয়ে আঁকাআঁকি পছন্দ করতাম, কার্টুন পছন্দ করতাম। এরপর সেই বয়সটা চলে গেলো। এখন তোমরা ক্রিকেট-ফুটবল পছন্দ করো। এখন তোমাকে বিল্ডিং সেট দিয়ে বসিয়ে দিলে ভালো লাগবে? লাগবে না। আমাদের পছন্দ পরিবর্তন হয়ে যায়, আবার আরেকটু বড় হলে এগুলোও ভালো লাগবে না। এর মানে, আমাদের মন-মানসিকতা বয়সের সাথে পরিবর্তন হয়।

শুধু তা-ই না, বয়সের সাথে আমাদের শরীরেও পরিবর্তন আসে; যেমন আমাদের শরীর সাইজে বড় হয়, তেমনি শরীরের ভেতরেও নানান পরিবর্তন হতে থাকে। ছেলেদের শরীরে বড়-বড় পশম হয়, কণ্ঠস্বর মোটা হয়, হাড়গোড় শক্তপোক্ত হয়, শরীর পেশীবহুল হয়। তোমাদের কিন্তু এখন সেই মাঝামাঝি সময়টা চলছে। তোমরা এখন বাচ্চা থেকে পুরুষ-মানুষ, বড়-মানুষ হচ্ছে—এই সময়টাকে বলে ‘বয়ঃসন্ধিকাল’। বাসায় ছোটভাই আছে কার কার? খেয়াল করে দ্যাখো, তোমার আর তোমার ছোটভাইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! তা হলেই বুঝবে, তুমি এখন বাচ্চা থেকে বড়মানুষ হচ্ছে। তোমার ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা আসছে, তোমার গলা মোটা হয়েছে। এ-সময় শরীরে খুব গন্ধ হয়, ঘামে খুব গন্ধ হয়—সেটা এসেছে, এটা চলে যাবে আরেকটু বড় হলে।

তবে এই পরিবর্তনগুলোর মাঝে আমাদের দুটো পরিবর্তন আছে, আমরা কাউকে বলতে পারি না—লজ্জা লাগে, তাই না? একটা হচ্ছে, বাহুর নিচে বগলে আর নাভির নিচে মোটা-মোটা লোম ওঠে। এগুলো কেটে ফেলতে হয়; সপ্তাহে একবার শেভ করে ফেললে ভালো, শরীরে গন্ধ হয় না। না-হলে ঘাম আটকে থেকে গন্ধ হয়। প্রতি শুক্রবারে শেভ করার নিয়ম, আমাদের নবী আমাদের তা-ই শিখিয়েছেন। আর না-কেটে ৪০ দিন পেরিয়ে গেলে গুনাহ লেখা হয়, শরীরে ঘাম আটকে থেকে গন্ধ হয়, কেউ কাছে আসতে চায় না, ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জমে ইনফেকশানও হতে পারে। আমরা প্রতি শুক্রবারে এটা শেভ করার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে তো? কোনোভাবেই যেন ৪০ দিন পার না-হয়ে যায়।^[১]

আরেকটি সমস্যা আমাদের হয়—প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে আঠালো একটা রসের মতো আসে। একটু চাপ দিয়ে পেশাব করলে বা পায়খানা একটু কষা হলে সেটা

[১] হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত—যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলেন ১০ বছর—আমাদের গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো ও যৌনকেশ চাঁহার সময়সীমা ছিলো ৪০ রাত। (আহমাদ, আবু দাউদ) যেন আমরা ৪০ দিনের অধিক দেরি না করি। (মুসলিম, হাদিস নং ৪৯০ (ইফা), (iHadis app, হাদিস নং ৪৮৭)

বেরিয়ে আসতে পারে; কিংবা কারও-কারও রাতে ঘুমের ভেতরেও বেরিয়ে আসে; আসে কি না? এটাও খুব স্বাভাবিক—কোনো অসুখ না। একদম ভয়ের, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমাদের হবে, আমাদের হয়েছে, আমাদের বাবাদের হয়েছে এই বয়সে। ঘুমের ভেতর স্পিডে বেরোলে গোসল করতে হয়। গোসলের আগ পর্যন্ত শরীর নাপাক থাকে, সালাত পড়া যায় না, কুরআন ধরা যায় না, মসজিদে ঢোকা যায় না।

গোসলের নিয়ম হলো : প্রথমে ঐ জায়গা ধুয়ে নামাযের উয়ুর মতো উয়ু করবে। এরপর গড়গড়াসহ কুলি করবে, গলার শেষ পর্যন্ত যেন পানি যায়। তারপর নাকের ভেতর পর্যন্ত পানি দেবে—পানি টেনে উঠাতে পারলে তো সবচেয়ে ভালো। আর লাস্টলি এমনভাবে গোসলটা করবে, যাতে প্রত্যেক লোমের নিচে পানি পৌঁছে; ডলে-ডলে গোসল করবে—যাতে শরীরের কোথাও শুকনো না-থাকে। আর যদি এমনি অন্য সময় স্পিডে না-বেরোয়, এমনি চুইয়ে-চুইয়ে আসে, তা হলে কেবল উয়ু করলেই চলবে। এখন প্রশ্ন হলো, এটা কেন আসে? প্রশ্ন আসছে তো?

চারপাশে দ্যাখো, মানুষ দুই ধরনের :—পুরুষ আর নারী। কেন দুই ধরনের? এক ধরনের কেন না? শুধু পুরুষ হতে পারতো, কিংবা শুধু নারী! এক পদের হলেই তো হতো! প্রশ্ন জাগে না মনে? এটা আল্লাহ তাআলার সিস্টেম। এই সিস্টেম আল্লাহ করে দিয়েছেন, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত দুটো মানুষ থেকে একটা মানুষ তৈরি হয়। একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে নতুন-নতুন আরও মানুষ দুনিয়াতে আসে। এভাবে চলতে থাকবে। তোমার দাদা-দাদি থেকে তোমার বাবা এসেছেন। নানা-নানি থেকে তোমার আন্মু এসেছেন। আবার তোমার আব্বু-আন্মু থেকে তুমি দুনিয়াতে এসেছো। আবার তুমি-তোমার স্ত্রী থেকে আরও নতুন মানুষ আসবে, যার এখন কোনো খোঁজ নেই। এভাবে তোমার বংশ চলতেই থাকবে। শুধু মানুষ না, অন্যান্য সব পশুপাখির ক্ষেত্রেও তা-ই। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলে Reproduction, বাংলাতে ‘প্রজনন’। এটা কীভাবে হয়?

পুরুষ প্রাণীর শরীরে একটি বীজ তৈরি হয় আর মেয়ে প্রাণীর শরীরে তৈরি হয় জমি। জমিতে এই বীজ পৌঁছালে একটা নতুন সন্তান তৈরি হয়। যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন এই বীজ তৈরি হচ্ছিলো না। এখন তুমি সেই বীজ তৈরির উপযুক্ত হচ্ছে, সেই বীজ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে তোমার শরীরে। আমাদের দেহে যে-

টেনশন/অণুকোষ আছে, সেখানে তৈরি হয় এই বীজ। বীজ মজুদ রাখার একটা ধরনের মতো জায়গাও আছে তোমার দেহে। যখন পেশাব-পায়খানার সময় ঐ থলেতে চাপ পড়ে, তখন প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে একটু-একটু করে বেরিয়ে আসে। এটিই ঐ আঠালো তরল, যা তুমি দ্যাখো; কিংবা যখন তৈরি হয়ে-হয়ে থলেটাতে আর ধরে না, তখন ঘূমের মাঝে উপচে বেরিয়ে আসে, যাকে বলে ‘স্বপ্নদোষ’; এটা বিলকুল কোনো অসুখ না; অনেক বন্ধুবান্ধব তোমাকে বোঝাবে—এটা অসুখ। এটা কোনো অসুখই না, কোনো টেনশনের কিছুই নাই। কিছুটা দুর্বল লাগতে পারে, সে-জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে, খাওয়া-দাওয়া বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতি দিন ২টা ডিম, দুধ, পুষ্টিকর খাবারদাবার খেতে হবে। ঠিক আছে না? বুঝতে পেরেছো সবাই? এটা নিয়ে যদি টেনশন করো, এই টেনশনটাই শেষ পর্যন্ত রোগ হয়ে দাঁড়াবে। টেনশন না-করলে তুমি অসুস্থ হবে না, সুতরাং কোনো টেনশন নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু নরমাল বিষয়টি আলোচনা করলাম। এবার আমরা কিন্তু সমস্যায় প্রবেশ করছি। মন দিয়ে শুনো কিন্তু! আমাদের মাঝেই অনেক মানুষ, এমনকি তোমাদের বন্ধুরাও অনেকে এই সময়টা মারাত্মক এক খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত হয়। তারা এই বীজ বের করে ফেলে ইচ্ছে করে—একবার থেকে বারবার। নিজ হাতে নিজের ভবিষ্যতকে শেষ করে দেয় তিলে-তিলে। এই বয়সের বাজে অভ্যাস তাকে পরিণত বয়সে হতাশাগ্রস্ত একজন ব্যর্থ মানুষে পরিণত করে। একা-একই বেরিয়ে গেলে তা শরীরে খারাপ প্রভাব ফেলে না, কিন্তু নিজে ইচ্ছে করে বের করে ফেললে তা শরীরে সিরিয়াস ক্ষয় তৈরি করে। চলো দেখে নিই, এই সর্বনাশা অভ্যাসের ফলে কী কী দেখা দেয়^[১]:—

- ৷ শরীর দ্রুত ভেঙে পড়ে
- ৷ অকালে বুড়ো-বুড়ো লাগে
- ৷ কোনো কাজে আনন্দ লাগে না, সব সময় কেমন যেন বিমর্ষ লাগে
- ৷ শরীর-মন চনমনে লাগে না, সতেজ থাকে না, ম্যাজমেজে লাগে
- ৷ কোমরে ব্যথা হয়
- ৷ মনোযোগ থাকে না পড়াশোনায়
- ৷ অল্পতেই ক্লান্ত লাগে

[১] বিস্তারিত পড়ুন মুক্ত বাতাসের খোঁজে, লস্ট মডেস্টি, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

- ৩ পড়াশোনার রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে, চেপে বসে হতাশা
- ৩ মাথাব্যথা করে
- ৩ চোখের দৃষ্টি কমে যেতে থাকে
- ৩ বীজ পাতলা হয়ে যায়, সন্তান হবার সম্ভাবনা কমে যায়
- ৩ লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে পড়ে
- ৩ লিঙ্গের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে, সোজা থাকে না
- ৩ স্ত্রীমিলনে আগ্রহ কমে
- ৩ স্ত্রীর চাহিদা মেটার আগেই দ্রুত বীৰ্যপাত হয়ে যায়
- ৩ দাম্পত্য-জীবনে ব্যর্থ পুরুষ হিসেবে সাব্যস্ত হয়
- ৩ পারিবারিক কলহ, ডিভোর্স হতে পারে
- ৩ হতাশা একাকীত্ব জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

সুতরাং ছোট বন্ধুরা, তোমরা বুঝতে পারছো, এই ইচ্ছে করে বীজ বের করে ফেলাটা কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে! আর যদি এটা তুমি না-করো, তা হলে শরীর থাকবে সতেজ, মন থাকবে প্রফুল্ল। তোমার মনে হবে, যেন তুমি বিশ্ব জিতে নিতে পারো। এতটা আত্মবিশ্বাস তোমার উপর ভর করবে। পড়াশোনা-চাকুরি-ক্যারিয়ার-দাম্পত্যজীবন—সবখানে তুমি একজন সফল ব্যক্তি হবে। এখন তুমিই বেছে নাও, তুমি কোনটা চাও! সবাই বলো—আমরা কোনটা চাই!

শুধু তা-ই নয়, আমাদের মৃত্যুর পর এক অনন্ত জীবন শুরু। কবর-হাশর, তারপর জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা হবে। এই নিজে ইচ্ছে করে বীজ বের করে ফেলা আল্লাহর কাছেও মারাত্মক বড় গুনাহ—যাকে বলে কবির গুনাহ। অন্তর থেকে ফিরে আসার সংকল্প না-করলে—মানে, তাওবা না-করলে এই গুনাহ মাফ হয় না। বারবার কবির গুনাহ একসময় ঈমান চলে যাওয়ার কারণও হতে পারে। এ-জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির কথা এসেছে হাদীসে। এ-জন্য এমন কাজ, এমন অভ্যাস আমরা কেন করবো, যাতে দুনিয়াও শেষ হয়ে গেলো, আখিরাতও শেষ হয়ে গেলো। সবাই তাওবা করি আজ থেকে—‘আল্লাহ, আমরা এমন কাজ কখনো করবো না।’ সবাই মন থেকে বলো। আর যাদের এই অভ্যাস আছে, তারাও তাওবা করো; বলো—‘আল্লাহ, যা করেছি, ভুল করেছি আর কোনো দিন করবো না।’ সবাই বলেছো মনে-মনে? মন থেকে আল্লাহকে বলতে হবে, তাঁকে কী ফাঁকি দেওয়া যায়!

কঠিন কথা যায় যে বলা সহজে

এবার আরেকটি মহাসমস্যার কথা তোমাদের শোনাবো। সেটা হলো, এই পুরুষপ্রজাতির বীজ নারীপ্রজাতিতে টাঙ্গানোর জন্য একটি প্রক্রিয়া আছে—একটিই প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সকল মানুষ জন্ম নেয়। পুরুষের জননাস্র এবং নারীর জননাস্রকে একত্র করা হয় এবং বীজ দেওয়া হয়—এই একটিই প্রক্রিয়া। পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষিত হবে আর নারীর কাছে পুরুষদের ভালো লাগবে—এটিই নিয়ম। নারী-পুরুষের বাইরে যে-কোনো প্রকার জননাস্রকেন্দ্রিক আকর্ষণ হলো অস্বাভাবিক ও অপরাধের কাজ। নারী-পুরুষের এই আকর্ষণ কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো কোটি-কোটি ডলারের ব্যবসা করে—অম্লীল ছবি-সিনেমার ব্যবসা। ইন্টারনেট ভর্তি করে রেখেছে এ-সব বাজে-বাজে ছবিতে-ভিডিওতে। এগুলো যুবকেরা দেদারসে দেখছে আর নিজের জীবনকে ধ্বংস করে নিচ্ছে। কীভাবে সারা দুনিয়ায় যুবকেরা ধ্বংস হচ্ছে, দেখবে? দ্যাখো—

অম্লীল ছবি আর ভিডিওতে তারা নারীজাতিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। নারীকে কেবলই পুরুষের ইচ্ছার দাসী হিসেবে দেখায়, যেন তার নিজের কোনো ইচ্ছে নেই, কোনো দাম নেই; যেন সে মানুষ না, কোনো বস্তু। যে এগুলো দেখে, তার মনেও মেয়েদের সম্পর্কে বাজে-বাজে ধারণা জেঁকে বসে।

এগুলোতে মানুষের শরীর সম্পর্কেও ভুল ধারণা জন্মে। মেকাপ করে মানুষের শরীর একদম নির্খুঁত করে তোলে। ফলে বিয়ের পর যখন সে নিজের স্ত্রীর শরীর অত নির্খুঁত পায় না, তখন পরিবারে অশান্তি শুরু হয়। পর্নে-আসক্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। নিজের শরীর, নিজের মিলন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না, অহেতুক হতাশায় ভোগে। সে ভিডিওকে বাস্তব মনে করতে থাকে, অথচ এগুলো সব অভিনয়।

ভিডিওগুলো তাকে বারবার বীজ অপচয় করতে বাধ্য করে। ভিডিও দেখে সে উত্তেজিত হয়, আর বারবার বীজ বের করে। ফলে তার শরীর-মন সব শেষ করে ফেলে।

ভিডিওগুলো প্রচুর সময় নিয়ে নেয়। এটা নেশার মতো। আজ যা দেখেছে, কাল তা ভালো লাগে না, আরেকটু বেশি মাত্রার প্রয়োজন হয়। তারপর আরেকটু বেশি। কৃত্রিম কন্টেন্ট পেতে সে ইন্টারনেটে বেশি সময় দিতে থাকে। তার পড়াশোনা, চাকরি সবখানের পারফরমেন্স খারাপ হতে থাকে। হতাশা তাকে গ্রাস করে বসে।

নীল কৃষ্ণগহ্বর

সবারই একটি অতীত থাকে। আজকের দরবেশেরও একটি অতীত ছিলো। আজকের পাপীরও একটি ভবিষ্যত আছে। যাকে গুনাহ করতে দেখলেন, হয়তো তাকে দীর্ঘ লড়াইয়ের ‘একটি খণ্ডযুদ্ধে’ পরাস্ত হতে দেখলেন। সারা দিন এমন কত শত যুদ্ধে সে বিজয়মাল্য পড়ে, তা আপনার আমার জানারও কায়দা নেই। এ-জন্য বদ ধারণা করবো না, হতাশ হবো না। জীবনটাই যুদ্ধ—অদৃশ্য শত্রু নফস আর শয়তানের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ। কখনো জিতবো, কখনো হারবো। তবে লড়া থামবে না, আত্মসমর্পণ করা চলবে না। অনেক ভাই নীল কৃষ্ণগহ্বরে আটকা পড়েছেন। উঠে আসার আকুতি বুকে নিয়ে কেউ উঠে এসেছেন অলরেডি, কেউ পা হড়কে পিছলে যাচ্ছেন, আবার উঠে আসবার চেষ্টা করছেন...

দ্রুত মূল টপিকে চলে গেলাম—অনেক আলোচনা। বাই দ্য ওয়ে, আগে নিয়ত সহিহ করে নিই। এই লেখাটা লিখছি, নিজে প্রতি দিন একবার করে পড়বো বলে। আর এটা যদি কারও বিজয়ের উসিলা হয়, তা হলে আমার পরাজয়গুলো তার দুআয় মাফ হয়ে যেতেও পারে। আল্লাহুমা আমিন।

পর্ন দেখা একটা নেশা। মাদক আমাদের ব্রেনের যে-জায়গাগুলোকে উত্তেজিত করে, পর্নও তা-ই। আমাদের ছোট-ছোট প্রতিটি আনন্দের অনুভূতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ব্রেনের এক প্রকার কেমিক্যাল—ডোপামিন। অল্প-অল্প করে বের হয়ে আনন্দের অনুভূতি তৈরি হয়। মাদক যে-কাজটা করে, অনেক পরিমাণে ডোপামিন বের করে, ফলে অনেক বেশি মজা লাগে। একই পরিমাণ মজা মাদকাসক্ত আবার পেতে চায়, তাই বারবার নেয়—আসক্তি হয়ে যায়। এরপর যে-পরিমাণ ডোপামিন বেরোলে মজাটা হতো, সেই পরিমাণ ডোপামিন বের করতে মাদকের ডোজ বাড়তে হয়, আগের ডোজে আর ঐ পরিমাণ বেরোয় না। পর্নতেও একই ঘটনা ঘটে, একটা পর্যায়ে একই জাতীয় পর্ন আর ভাল্লাগে না—বৈচিত্র্য চাই। আমার মতে, মাদকের মতোই পর্ন ছেড়ে দিতে চাইলাম, আর দিয়ে দিলাম, ব্যাপারটা এমন না-হবার সম্ভাবনাই বেশি। কয়েক স্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

নীল কৃষ্ণগহ্বর

নেওয়া চাই। কিছু জিনিস ছাড়তে হবে, আর মজার কিছু খোরাকও ব্রেনকে দিতে হবে। পর্ন যে-পরিমাণ ডোপামিন নিঃসরণ করতো, ঐ পরিমাণ ডোপামিন আপনাকে বিকল্পপথে সরবরাহ করতে হবে।

১. ব্যক্তিগত আচার

পেশাব-পায়খানা-গোসল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে না-করা—যদিও তা জায়েজ, কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করার একটি অভ্যাস তৈরির জন্য করবো। একান্ত প্রয়োজনের সময় আল্লাহকে লজ্জা করা অভ্যাস হলে, গুনাহের সময়ও লজ্জা চলে আসবে।

নিজ লজ্জাস্থানের দিকে না-তাকানো, অপ্রয়োজনে স্পর্শ না-করা। উসমান রা. লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে না।^[১] শয়তানের ধোঁকা আসতে পারে। প্লাস লজ্জার প্র্যাকটিস।

কোলবালিশ ব্যবহার না-করা। ঘর্ষণে কামভাব জাগতে পারে।

২. আদাবুল ইন্তারনেত

❧ বিছানায় শুয়ে মোবাইলে নেট ইউজ করবো না, বসে করবো।

❧ অহেতুক ইন্টারনেট ব্রাউজ করবো না। অহেতুক ফেসবুক স্ক্রল করবো না।

❧ রাত ১০টার পর নেটের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবো না।

❧ একাকী যখন থাকবো, তখন নেট ব্যবহার করবো না। সবার সামনে করবো।

ধরুন টাইম মেশিনে করে গিয়ে একজন সাহাবী রা.-কে যদি আজকের যুগে আনা যেতো, তিনি কী করতেন জানেন! তিনি ইন্টারনেটই ব্যবহার করতেন না, স্মার্টফোনই ব্যবহার করতেন না। যে-জিনিস আমাকে আল্লাহর কাছে আসতে দেয় না, রাসূলের বিরাগভাজন করে, সেই জিনিসই রাখবো না। তাঁরা এমনই ছিলেন।

নামাযের মধ্যে বাগানের কথা মনে পড়েছে—ঐ বাগানই সদকা করে দিতেন। জিহাদের মাঝে নববধূর চেহারা ভেসে উঠেছে—যাহ, বিবিই তালাক। জিহাদ থেকে পালানোর চিন্তা আসতে পারে—ঘোড়াই মেরে ফেলবো, যাতে পালাতে না-পারি। যে-বস্তু আমাকে আল্লাহ থেকে, জাম্মাত থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেই বস্তুই ত্যাগ করতেন। গুনাহ ত্যাগ করার জন্য, গুনাহ হবার সকল সম্ভাব্য পথকেই ত্যাগ করতেন—এটিই ‘সিরাতাল্লাযিনা আন-আমতা আলাইহিম’—সাহাবাদের পদ্ধতি।

[১] উসমান রা. ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাশীল। নিজ ঘরে বন্ধ কামরাতেও তিনি পুরোপুরি বিবস্ত্র হতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর অতিমাত্রায় লজ্জার কারণে ফেরেশতারাও তাকে লজ্জা পেত। (আল-মুজাম, হাইসামী : ৯/৮২, সনদ নির্ভরযোগ্য। ফাইয়ুল কাদীর, মুনাবি : ১/৪৫৯) —সম্পাদক

নিজেকে এই অবস্থার উপর তৈরি করতে হবে। টার্গেট : ‘আল্লাহর সন্তুষ্টি’; এর জন্য যা লাগে করতে প্রস্তুত, যতটুকু লাগে করতে লাকবাইক।

হ্যাঁ, ইন্টারনেটে অনেক লাভ আছে। ইনফ্যান্ট এই লেখাটাও ইন্টারনেটেই প্রথম প্রকাশ করা হয়। তবে ইন্টারনেট যার পর্ন-হস্তমৈথুনের কারণ হচ্ছে, তার জন্য এ-সব লাভ কোনো লাভই না। তার লাভের চেয়ে লস হচ্ছে ঢের-ঢের বেশি।

৩. সামান্য ছিদ্র

এই পয়েন্টটা খুব বোঝার আছে। উস্তায উমায়ের কোক্বাদি হাফিজাহল্লাহ বলেন, ‘একই গুনাহ বারবার হচ্ছে, মানে এটা নফসের গুনাহ, শয়তানের না।’

তবে শয়তান নফসকে জাগিয়ে দেয়। আর নফস নিজের চাহিদা পুরো করার সুযোগ খোঁজে। ধরুন, আপনি খুব ডিটারমাইন্ড—হয় এসপার নয় ওসপার : আর পর্ন দেখবো না, হস্তমৈথুন করবো না। আপনার প্রতিজ্ঞায় কোনো খুঁত নেই। কিন্তু ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ সুন্দরী কোনো মেয়ের ছবি চলে এলো, বা ফ্যাশনের পেজের কোনো মডেল চলে এলো, তেমন উগ্র পোশাকও না, আপনি কিছুক্ষণ দেখলেন—আপনার প্রতিরোধব্যবস্থায় একটি ছিদ্র তৈরি হলো। এই ছিদ্র বড় হতে থাকবে সারা দিন ধরে, একপর্যায়ে অঘটন ঘটে যাবে। খুব খেয়াল করে দেখবেন, যে-দিন অঘটন ঘটেছে, সে-দিন হয় এমন কিছু দেখেছেন—

- ৩ বা কোনো গান-নাচ দেখেছেন,
- ৩ বা সিনেমা,
- ৩ বা পোস্টার চোখে পড়েছে, আপনি চোখ না-সরিয়ে একটু দেখেছেন,
- ৩ কিংবা কোনো পথচারী মেয়েকে একটু দেখেছেন।
- ৩ বা কোনো ফরজ বা সুন্নাত সালাত ইচ্ছে করে ছুটেছে,
- ৩ বা রোজানা করেন, এমন কোনো নফল আমল অলসতা করে বাদ দিয়েছেন—ইচ্ছে করে।

মানে, ‘আল্লাহর স্মরণ’ হলো ব্যারিকেড; এই ব্যারিকেডে যে-কোনো সামান্য ছিদ্রের সুযোগটা শয়তান নেবে। ঐ ছিদ্র দিয়ে নফসকে একটা খোঁচা দিয়ে জাগাবে। বাকিটুকু নফসেই করে নেবে। অতএব গাফেল থাকা যাবে না—

গান শোনা-নাটক-সিনেমার অভ্যাস বাদ দিতে না-পারলে পর্ন-হস্তমৈথুন ছাড়ার চিন্তাও বাদ দিন।

নীল কৃষ্ণগহ্বর

নজরের হেফাজতে কোনো কম্প্রোমাইজ নয়। নজর নিচে। কুরআনে আছে—
শয়তান ওয়াদা করেছে : আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আমি সামনে থেকে,
পিছন থেকে, ডানে থেকে, বামে থেকে আসবো।^[১] উপর আর নিচ বলেনি। উপর
দিকে তাকিয়ে রাস্তায় হাঁটলে আহত হবার সম্ভাবনা, তাই নিচের দিকে তাকিয়ে
হাঁটা চাই। শুধু পর্ন না, সব রকম কুদৃষ্টির হেফাজত করতে হবে, কোনো ছিদ্র রাখা
যাবে না।

নজরে ঢুফাজতের পদক্ষেপ (শাইখ উম্মাতুর রোহাদির মজলিস থেকে) :

- ৩ অবনত চোখে চলা।
- ৩ কুদৃষ্টির চাহিদা স্ত্রীর মাধ্যমে পূরো করা।
- ৩ যার প্রতি কুদৃষ্টি পড়লো, তাকে নিজ মা-বোনের স্থানে কল্পনা করা। তবে
এটার সুযোগ নেওয়া যাবে না।
- ৩ সাথে-সাথে ইস্তিগফার।
- ৩ সর্বদা যিকিরের মধ্যে থাকা। শয়তান যেন যিকিরের হাতিয়ার ছিনিয়ে
নিতে না-পারে।
- ৩ কৃপণ হলে অর্থের জরিমানা, অলস হলে আমলের জরিমানা—(২ রাকাত
সালাত) প্রতি বারের থিয়ানতে।
- ৩ আযাবের কল্পনা, চোখে গরম শলাকা ঢুকানোর যাতনা কল্পনা করা। যে-
চোখ সামান্য বালি সহ্য করতে পারে না, তাতে অলস শলাকা ঢুকলে
কেমন লাগবে!
- ৩ নারী/নারী ছবির দিকে প্রথম দৃষ্টি থেকেও বাঁচতে হবে। যদি আভাস পাওয়া
যায় যে, এটি একজন নারী, প্রথম দৃষ্টিও দেওয়া যাবে না।
- ৩ প্রতি দিন আপনি যে-নফল আমলগুলো করেন, সেগুলো ইচ্ছে করে
অলসতা করে বাদ দেবেন না।
- ৩ ফরজ যেন না-ছোটে, বিশেষ করে জামাতের সাথে সালাত।

যে-দিন প্রতিরক্ষায় ফাটল দেখা দিলো, ঐদিন একট্রা প্রতিরক্ষা জোরদার
করতে হবে। কী করতে হবে নিচে বলছি।

[১] সূরা আরাফ : ১৭

কুররাতু আইয়ুন ২

যে-দিন আপনার অঘটন ঘটে, সে-দিন একবারের জন্য হলেও ক্ষুধাটা নফস আগে জানান দেয়। ধরুন, আজ বাসায় কেউ থাকবে না, বেড়াতে যাবে। তো তারা যাবার আগেই নফস আমাকে একবার মনে করিয়ে দেবে, আজ কিন্তু সুযোগ! এই পূর্বাভাস থেকে ঐ দিন প্রতিরক্ষা জোরদার করতে হবে—

- ৩ ডিভাইসের সাথে দূরত্ব।
- ৩ ইন্টারনেট টোটাল বন্ধ।
- ৩ ডিভাইসের চার্জ না-রাখা।
- ৩ নিজেকে বাইরের কাজে ব্যস্ত রাখা।
- ৩ এক্সট্রা নফল আমল করা।
- ৩ ব্যায়ামজাতীয় ক্লাস্তিকর কাজ করা, যাতে তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে। বিকেলের দিকে ব্যায়াম করবেন, দৌড়াবেন, তা হলেও এশার পরে ভেঙেচুরে ঘুম চলে আসবে।

আমি কয়েকবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলাম, আপনারা করবেন না, ওষুধ ভালো জিনিস না।

৪. কবু থুবু শুরু

আজ থেকেই, এখন থেকেই শুরু। একটা ধোঁকা খুব আসে, আজকেই শেষবারের মতো। আজকে একবার করে নেক্সট থেকে ভালো হয়ে যাবো। না, এবার থেকেই লড়াই শুরু, এই মুহূর্ত থেকেই। আজকেই তোর-আমার মধ্যে একটা হেস্টনেস্ট করতে হবে। আজকে বেঁচে গেলেই আল্লাহর কাছে আমার ধাম করে প্রোমোশন হবে। হারাম থেকে বাঁচলে আল্লাহ হালালের ভেতরে ঐ হারামের হাজারগুণ বেশি স্বাদ দান করবেন। দুআ করুন—‘ইয়া আল্লাহ, হালালের ভেতর এই পরিমাণ স্বাদ দান করুন, যেন হারাম থেকে বাঁচতে পারি।’

৫. কোনো বাজে চিন্তা এলে

অনেক সময় বাজে চিন্তা এসে পড়ে। আগের কোনো নায়িকা বা পর্ন-তারকার কোনো দৃশ্য ভেসে ওঠে—এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। কোনো বদখেয়াল এলে চিন্তাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। হযরত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, ‘বদচিন্তা সমস্যার সমাধান হলো, ক্রক্ষেপহীনতা।’ মন্দ চিন্তা যদি আসে, তবে আসুক। সে-

নীল কৃষ্ণগুরু

দিকে ক্রমশঃ করার প্রয়োজন নেই। এই চিন্তাই করবেন না যে, কী চিন্তা আসছে আর কী যাচ্ছে।^[১]

তবে এই চিন্তা ঘুরানোটা প্র্যাকটিসের বিষয়—একদিনে হবে না। প্র্যাকটিস হলো, সালাত আর যিকরুল্লাহ। যিকিরে-নামাযে ‘ছুটে-যাওয়া’ মনকে বারবার ফিরিয়ে আনার অনুশীলন করি আমরা। প্র্যাকটিস করে-করে মনের স্টিয়ারিং ঘুরানো সহজ হয়ে যাবে; প্রথম-প্রথম অন্তরের উপর ভারি লাগবে, ধীরে-ধীরে বিজয়ের আনন্দ হয়ে-হয়ে একদম পানিভাত হয়ে যাবে।

সালাত সকল অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। অনেক হিকমাহ রয়েছে, তার মধ্যে এটিও একটি যে, আমি যদি সব ডিস্ট্রাকশনকে (মনোবিচ্ছিন্নতা) বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নামাযে আমার মনকে ধরে রাখতে পারি, তা হলে গুনাহের চিন্তাকেও শ্যাডো করে খেলা সহজ হয়ে যাবে। আল্টিমেটলি গুনাহটা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে—যদি গুনাহের চিন্তাকে এড়িয়ে যেতে পারা যায়।

গুনাহের চিন্তা আসাটা গুনাহ না, তবে সেই চিন্তাটা লালন করে স্বাদ নিলে একসময় বাস্তবে করেও ফেলবেন।

৬. আমল

কিছু আমলের কথা আলোচনায় আসবে। তবে দরজা খোলা রেখে আলমারিতে তালা দিয়ে লাভ নেই। মানে, যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে এরপর আমলগুলো করলে কাজে দেবে। পর্ন দেখার উপায় সাথে রেখে (নেট+ডিভাইস) এগুলো খুব বেশি দিন আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না। আগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে এরপর আমলগুলো করলে ফায়দা হবে।

[১] বিস্তারিত দেখুন অনাহূত ভাবনা ও তার প্রতিকার, হযরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি, মাসিক আল-কাউসার—ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যা <https://www.alkawsar.com/bn/article/1408/>

কুযরাতু আইয়ুন ২

১৩০ মকল আমল বেশি-বেশি। নফল সালাত (তাহাজ্জুদ, ইশরাক, ^[১] আওয়াবিন ^[২]), কুরআন, সকাল-সন্ধ্যা যিকিরের ওযিফা (সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, ইস্তিগফার, দুর্কদ ১০০ বার করে প্রতিটা) কঠোরভাবে নিয়মিতসহ আদায় করতে থাকা। এগুলো হচ্ছে গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যারিকেড। কেননা হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

বান্দা নফল আমলের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে। এক পর্যায়ে আমি তার চোখ হই, যা দ্বারা সে দেখে; আমি তার কান হই, যা দ্বারা সে শোনে; আমি তার পা হই, যা দ্বারা সে চলে। ^[৩] (অর্থাৎ সব অঙ্গের কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ে যায়)। ^[৪]

[১] ফজরের নামায পড়ার পর দুনিয়ার কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত হীর নামাকের আয়তান বসে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের ২০/২৩ মিনিট পর সূর্য একটু উপরে উঠলে তখন ইশরাকের সময় হয় এবং দিনের প্রথমে প্রহর পর্যন্ত এর সময় বাকি থাকে। এই সময় দুই রাকাত ইশরাকের নামায পড়লে এক হজ ও এক উমরার সমান সাওয়াব লাভ হবে বলে হাদীসে রয়েছে। (আস-সুনান, তিরমিযি : ৫৮৬)

এই হাদীসকে কেউ-কেউ দুর্বল বললেও সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত এবং আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। বেদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানি রহ.-ও একে হাসান বলেছেন এবং সহিহ তিরমিযিতে এতে স্থান দিয়েছেন। ইবনে বায রহ. এই হাদীসের বিষয়ে বলেছেন, 'এর একাধিক এমন দল আছে, যা ত্বাটুইভা' (কতরা শাইখ ইবনে বায : ২৫/১৭১)

এছাড়াও আরও দুই রাকাতসহ মোট চার রাকাত পড়লে আল্লাহ তাআলা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার এই দিনের সকল কাজের তিস্তাদার হয়ে যান বলে অপর হাদীসে উল্লেখ আছে। (আস-সুনান, তিরমিযি : ৪৭৫) অবশ্য যদি কেউ ফজরের নামাকের পর দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হয়ে যায় এবং সূর্য ওঠার পর ইশরাক পড়ে, তাও জায়েয আছে। এতেও ইশরাক আদায় হবে।—সম্পাদক

[২] মার্গরিবের পর ছয় রাকাত।

[৩] আস-সহীহ, বুখারী : ৬৫০২

[৪] পূর্বের অসঙ্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বেশি-বেশি দুআ করার কোনো বিকল্প নেই। যারা পূর্বে আসক্ত, তারা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি দুআর প্রতি মনোযোগ বাড়াতে পারেন। এই বিষয়ে উপকারী কিছু দুআ নিচে দেওয়া হলো। এগুলো সব সময় পড়তে পারেন।—সম্পাদক

প্রথম দুআ :

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَطَابَاتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَغْرِبِيِّ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ لِيْسِي مِنْ غَطَابَاتِي كَمَا لِيْسِي مِنَ الْغَيْبِ. اللَّهُمَّ الْغِيْبِي مِنْ غَطَابَاتِي بِالنِّعَمِ وَالْطَّيِّبِ وَالْغُفْرِ

ও আল্লাহ, তুমি আমার ও আমার পাপসমূহের মাঝে দূরত্ব তৈরি করো, যেমত দূরত্ব তৈরি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। ও আল্লাহ, আমার পাপসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করো, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। ও আল্লাহ, আমার পাপসমূহ থেকে আমাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ঐক্য

নীল কুমগাহুর

- ❧ রোজানা দাওয়াহ/নাসিহা। মানে, নিজের জবান দিয়ে এই কথাগুলো বের করা : আল্লাহ বাসির (সর্বদ্রষ্টা), আল্লাহ শাহিদ (উপস্থিত), লাতিফুল খাবির (গোপন বিষয় ও সর্ব বিষয় অবগত)। আল্লাহর এই সিকাতগুলোর আলোচনা যেন আমার জিহ্বায় থাকে। এক আসমান আরেক আসমানকে আড়াল করতে পারে না, এক জমিন আরেক জমিনকে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নিতে পারে না। একলা গুনাহে খোদ বিচারক নিজেই সাক্ষী। যে-বিষয়ের দাওয়াত দেবো, সেটা আমার ভেতরে আগে আসবে। এ-জন্য গোপন গুনাহ ত্যাগের বিষয়ের প্রতি দিন দাওয়াত দেবো।
- ❧ প্রতি দিন ফজরের পর ৩ বার সূরা ইখলাস। আশা করা যায়, ঐ দিন তার দ্বারা কোনো গুনাহ হবে না—যদি সে গুনাহ ছাড়ার সংকল্পের উপর থাকে। মানে, দুর্ঘটনাবশত কোনো গুনাহ আচানক হয়ে যাবে না।^[১]

করো (যেন আমার আর কোনো পাপই অবশিষ্ট না থাকে)। (আস-সুনান, নাসাই : ৪০২)

দ্বিতীয় দুআ :

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী রব, আমাদের অন্তরকে তোমার অনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করে দাও। (আস-সহিহ, মুসলিম : ২৬৫৪)

তৃতীয় দুআ :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَخَشْيِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তোমার যিকির, কৃতজ্ঞতা এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার তাওফিক দাও। (আস-সুনান, আবু দাউদ : ১৫২২)

চতুর্থ দুআ :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَخُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ أَنْ أَغْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই তুমি বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারো। সুতরাং আমার ও তোমার অব্যাহত মাক্খান্বে তুমি প্রতিবন্ধক হয়ে যাও, যেন আমি কোনো অব্যাহতা না করতে পারি। (আয-যুহদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক : ২৩৩)

[১] মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইহ বহ, থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক দর্ঘণমুখর খুটখুটে অঙ্ককার কালো রাত্রে সালাত পড়ার জন্য আমরা বাসুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ‘বলো।’ আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, ‘বলো।’ আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, ‘বলো’, তখন আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর বাসুল, কী বলবো?’ তিনি বললেন, ‘তুমি সন্ধ্যা ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সূরা কুল খয়্যালাহ (সূরা ইখলাস), সূরা নাস ও ফালাক পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বক্ষা পাবে।’ (আস-সুনান, আবু দাউদ : ৫০৮২, হাসান)।—সম্পাদক

কুররাতু আইয়ুন ২

- ৩০ প্রতি ফরজ নামাযের পর সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত পড়ে গা মাসেহ করা। এটা হাদীসে বর্ণিত কোনো আমল না, তবে ভালো কাজ হয়।
- ৩১ নফল সিয়াম তো আছেই। একটানা নয়, এক দিন বাদে এক দিন—দাউদ আ.-এর রোযা। তবে অগুপ্তি যেন না-হয়। ডায়েট ঠিক করে নিতে হবে।
- ৩২ প্রতি দিন কোনো সময় শুধু দুআ করা। ১০-১৫ মিনিট। ‘আয় আল্লাহ, নফসকে দেখি না, শয়তানকেও দেখি না; আপনি সব দেখেন। আপনি সবার উপর ক্ষমতা রাখেন, ওরা আপনার উপর ক্ষমতা রাখে না। আয় আল্লাহ, এরা সব আপনার মাখলুক। আপনার এ-সব মাখলুকের ক্ষতি থেকে আমাকে বাঁচান।’ সদকার সাথে দুআ বেশি কবুল হয়।
- ৩৩ বেশি-বেশি ‘সূরা নাস’ আর ‘সূরা ফালাক’ পড়া। অর্থ বুঝে-বুঝে। সূরা ফালাকে মাখলুকের ক্ষতি থেকে হেফাজতের কথা আছে, আর সূরা নাসে মানুষ ও জিন-শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।^[১]
- ৩৪ বিয়ের ফিকির করা যেতে পারে। তবে বিয়ে করলেই মুক্তি পাবেন, তা কিছ না। বিয়ে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু আপনাকে গিলিয়ে চামচে করে খাইয়ে দেবে না।

৮. গুনাহ হয়ে গেলে

শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় শিকার হলো ‘হতাশ মুমিন’। এ-জন্য আল্লাহ তাঁর রহমত হতে নিরাশ না-হতে বলেছেন। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া হারাম। বান্দা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে শিরক ছাড়া আর-সকল গুনাহ আল্লাহর ইচ্ছা হলে মফ করেও দিতে পারেন। মনে রাখবেন, আমাদের গুনাহের সমষ্টির চেয়েও আল্লাহর রহমত আরও বেশি। তাঁর রাগের উপর রহমত বিজয়ী। এ-জন্য কখনো হতাশ হওয়া যাবে না। এত প্রচেষ্টার পরও গুনাহ হয়ে যেতে পারে, অসতর্ক মুহূর্তে শয়তান দিয়ে দিতে পারে ধোঁকা। আল্লাহর ‘দয়া’র ভুল ব্যাখ্যা করেই ধোঁকা আসতে পারে, এর পরের বার থেকে ভালো হয়ে যাবার আশা দিয়ে গুনাহ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিরাশ হওয়া যাবে না। আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। আগে পিওর তাওবা করেছিলাম, গুনাহ হয়েছে, আবার পিওর তাওবা করতে হবে।

[১] এই দুই সূরা বেশি-বেশি পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সা. গুরুত্বারোপ করতেন। প্রতি ফরয নামাজের পর এটি পাঠ করার কথা তিনি বলেছেন। (আস-সুনান, তিরমিযি : ২৯০৯) —সম্পাদক

নীল কৃষ্ণগুরু

প্রতিবার নির্ভেজাল তাওবার অভ্যাস থাকতে হবে। তাওবা মানে বুকে ছাপ দিয়ে 'তৌবা তৌবা' বা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়া না। তাওবা মানে 'ফিরে আসা'—ইউটার্ন। ৩ জিনিসের সম্মিলিত নাম তাওবা—

৩ প্রথমত, গুনাহের উপর অনুশোচনা। ইশ, করে ফেললাম। ইশ, যদি না করতাম!

৩ দ্বিতীয়ত, আর না-করার সংকল্প। সামনে আর জীবনেও করবো না—যেহেতু তাওবা তসবি টিপে ১০০ বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ার নাম না। তাওবা হলো আপনার আর আল্লাহর মাঝে একটি অমৌখিক চুক্তি; তাই আসলেই আপনার অনুশোচনা হয়েছে কি না, বা আসলেই আপনি সামনে আর না-করার সংকল্প করলেন কি না, বা সংকল্পটা ইম্পাত না ভুলতুলে—এগুলোতে লুকোছাপা বা জোচ্ছুরি চলে না।

৩ তৃতীয়ত, যা করেছি, তার ক্ষতিপূরণ করা—সম্ভব হলে।

প্রতিবার নির্ভেজাল তাওবার অভ্যাস এক দিন আপনাকে গুনাহ ছাড়িয়ে দেবে, ইন শা আল্লাহ। তাওবা নিয়ে তাবলিগের এক মুকব্বি একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, আমার খুব মনে ধরেছিলো :

এক গ্রামের মহিলা শীতের শেষে শীতের কাপড়চোপড়-কম্বলটম্বল ছাল দেবে। সারা বছরের জন্য তুলে রাখতে হবে তো, তাই। এ-জন্য বড় ডেকচিতে পানি গরম দিচ্ছিলো। হঠাৎ মায়ের কী যেন মনে হলো—উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে একটু উঠোনে গেলো; ধরুন, বাথরুমেই পেয়েছে। খেয়াল নেই যে, পাকঘরের দরজা আটকাতে হবে। মা যখন টয়লেটে, এর মধ্যে আড়াই বছরের বাচ্চাটা মায়ের খোঁজে এসে ডেকচিতে পড়ে সিদ্ধ হয়ে ভাসছে। এখন ফিরে এসে পাকঘরে পা দিয়ে ডেকচির দিকে তাকিয়ে মায়ের প্রথম অনুভূতিটা কেমন হবে? হায়, আমি কী করলাম! হায়, আমি কেন পাকঘরের দরজা আটকায়ে গেলাম না! এই অনুভূতিটা হলো তাওবা—এক কঠিন অপরাধবোধ! ঐ মা, সারাজীবন এটা ভুলবে না, আরও ১০টা বাচ্চা হলেও এই ঘটনা ভুলবে না, এবং আর কোনো দিন পাকঘরের দরজা না-আটকে যাবে না। এই অনুভূতি আসা চাই গুনাহ হবার পর।

আর, তাওবার পর যদি গুনাহের কথা ভেবে মজা লাগে, তা হলে ধরে নেবেন, তাওবা কবুল হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর কাছে 'তাওবাতুন নাসুহা'র দুআ করতে হবে; এমন তাওবা, যা থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

কুররাতু আইয়ুন ২

গুনাহ হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। অনেক আলিম এই পরামর্শ দিয়েছেন। একবার গুনাহ হয়ে গেলে ২০ রাকাত নফল সালাত, বা ৩টি রোযা। এভাবে একটি পরিমাণ ঠিক করে নিলে ধীরে-ধীরে কাজ হবে।^[১]

গুনাহ হয়ে গেলে হাদীসের হুকুম সাথে-সাথে কোনো নেক আমল করা। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ও কি একটি নেক আমল?’ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘অবশ্যই।’

মেমোরিতে ক্লিপ ডাউনলোড রেখে বা বুকমার্ক সেভ করে রেখে বা ডাউনলোড-করা পর্ন কোনো ড্রাইভে সেভ রেখে মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিয়ে তাওবা হবে না। সামনে আবার লাগবে, সামনে আবার গুনাহ করার জন্য রেখে দিলাম, আবার মুখে-মুখে তাওবার দাবি করলে তাওবা হলো? আপনি নিজেই জানেন, আপনি তাওবা করেছেন কি না।

৮. বিবাহিতদের জন্য

অনেকে বিয়ে করেও এই সর্বনাশা ফাঁদ থেকে বেরোতে পারছেন না। অসভ্য জিনিস দেখে-দেখে রুচিটাই এমন হয়ে গেছে, সভ্য একটা মেয়ে আর আপনার রোচে না। পর্নবেশ্যাদের ছলাকলা-নখরা পবিত্র গৃহবধূ জানবে কোথেকে! তাই আপনি আড়াল খোঁজেন, বউ থেকে আলাদা হলেই হারিয়ে যান নীল কৃষ্ণগাহুরে।

বউ না ছাড়া থাকার চেষ্টা করবেন না।

প্রতি দিন সহবাস করবেন, যাদের বেশি পর্নের অভ্যাস; তা হলে চাহিদা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রতিবারই স্ত্রীকে অর্গাজম করাতে হবে, এমন না। খাওয়াদাওয়া ঠিক থাকলে দুর্বল লাগার কথা না।

মনে ওয়াসওয়াসা এলে, বা প্রতিরক্ষায় ফাটল এলে, বা গুনাহের স্বাদের কথা স্মরণ এলে সাথে-সাথে বা দ্রুত স্ত্রীর সাথে প্রয়োজন পুরো করে ফেলবেন। প্রয়োজনটা রেখে দেবেন না। নফসকে কোনো চাপ দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনটা রেখে দিলে সুযোগমতো নফস গুনাহ করিয়ে দেবে।

[১] এই পদ্ধতিটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক উপকৃত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বিবেচ্য না। মূল হলো, গুনাহ হয়ে গেলে নফসের জন্য একটা শাস্তি বরাদ্দ রাখা। এতে করে পরবর্তীতে নফসের মধ্যে গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার প্রবণতা কমে আসে। তাই ব্যক্তিভেদে সংখ্যাটা কমবেশ হতে পারে। -সম্পাদক

নীল কৃষ্ণগহ্বর

স্ত্রীকে পছন্দের পোশাক ইত্যাদি কিনে দেবেন। মানে, নতুন বেশে দেখবেন। নতুনদের আকাঙ্ক্ষা একটু হলেও চেক দেওয়া যাবে। ব্রেনকে কিছু সারপ্রাইজ দিতে হবে, কিছু ডোপামিন রিওয়ার্ড দিতে হবে। সামনে আলোচনায় আসছে।

এই সর্বনাশা রোগ থেকে বাঁচতে স্ত্রীদেরও সহায়তা দরকার, এটা স্ত্রীকে বোঝাবেন। তার সহায়তা পেলে আপনার ছাড়া সহজ হবে। ‘মুক্ত বাতাসের খোঁজে’ বইয়ে বিস্তারিত আছে।

৯. মজার ঢুফাজড়ের কিছু স্ট্রাটিভেশন

মানহাজ নির্বিশেষে শাইখ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি হাফিয়াহুল্লাহর যৌবনের মৌবনে’ বইটি প্রতি দিন পড়া চাই। আরেকটি বই—ঘুরে দাঁড়াও, লেখক ওয়ায়েল ইব্রাহীম। এগুলো প্র্যাক্টিস বুক। প্রতি দিন একটু করে পড়া চাই, পড়ে ফেলে রাখলে হবে না।

যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি হাফিয়াহুল্লাহর ছাত্র বাংলাদেশের শাইখ উমায়ের কোব্বাদি হাফিয়াহুল্লাহ। যুবকদের উপর আলাদা দরদ নিয়ে বয়ান করেন। ইউটিউবে তার সূরা ইউসুফের তাফসিরগুলো শুনতে পারেন। সালাফি, মওদুদি প্রভৃতি মানহাজ নিয়ে গতানুগতিক মতামতগুলো ইগনোর করলে ‘যৌবন-রিলেটেড গুনাহ’ নিয়ে তার কথাগুলো দিলে খুব প্রভাব ফেলে। আমি খুব ফায়দা পেয়েছি; আল্লাহ তার ছায়ায় দীর্ঘায়িত করুন। বয়স ৩৪-৩৫ হবে; নিজে যুবক বলে যুবকদের সমস্যা খুব ভালো বোঝেন ও সাহায্য করেন।^[১]

ঢাকায় যারা থাকেন, পূর্ণগ্রাফি-হস্তমৈথুন-সমকামিতায় আক্রান্ত, সরাসরি শাইখ উমায়েরের সাথে দেখা করে নিজ সমস্যা জানিয়ে সরাসরি প্রেসক্রিপশন নিতে পারেন। আগারগাঁও > ষাট ফিট রাস্তা > বারেক মোল্লার মোড় > ডান দিকে খেজুরতলা মসজিদ—শাইখ এই মসজিদের খতিব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওনার কিছু কথা উল্লেখ করছি :

গোপন গুনাহ আল্লাহর অহংকারে আঘাত করে। আল্লাহর রহমত যেমন সবচেয়ে বেশি, তাঁর অহংকারও বেশি; অহংকার তাঁরই সাজে, অহংকার আল্লাহর চাদর। হাদীসে এসেছে—কাল হাশরের মাঠে কিছু মানুষ তিহামা পাহাড়ের সমান নেকি নিয়ে উঠবে, কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে। সাহাবীরা যখন জিজ্ঞেস করলেন,

[১] শাইখের সাইট : <http://quranerjyoti.com>

শাইখের ইউটিউব চ্যানেল : <https://www.youtube.com/channel/UCUdzrw9ArKmQesHbL75aoag>

‘তারা কারা?’ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তারা তোমাদেরই মতো আমল করে, রাত্রি জাগরণ করে, কিন্তু একাকী হলেই গোপন গুনাহে লিপ্ত হয়।’ [১]

জান্নাতে সবাই আল্লাহকে দেখবে। আল্লাহর দিদার হলো জান্নাতিদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। জান্নাতিরা জান্নাতকে ভুলে যাবে আল্লাহকে দেখার পর। যে-চোখ দুনিয়াতে নাপাক জিনিস দেখে, সেই চোখ আল্লাহ পাককে কীভাবে দেখবে! ইশ, কত আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে জান্নাতও পেলো, কিন্তু আল্লাহকে দেখার নিয়ামত পেলো না। আমার চোখ আল্লাহকে দেখার যোগ্য আছে কি?

কাল হাশরের মাঠে সূর্য যখন এক মাইল—আরেক হাদীসে রয়েছে—এক হাত উপরে থাকবে, সবাই নিজ আমল পরিমাণ ঘামে হাবুডুবু খাবে। সেই কঠিন উত্তাপে ৭ শ্রেণির লোক আরশের ছায়ায় থাকবে। তার মাঝে একপ্রকার হলো, সেই যুবক, যাকে উচ্চবংশীয়া সুন্দরী যুবতী নিজের দিকে ডাকে, আর সে বলে, ‘আনা আবাহুল্লাহ—আমি আল্লাহকে ভয় করি।’ এখন কি কোনো সুন্দরী কাউকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকবে, ‘এসো আমার সাথে ঘিনা করো!’ না, এখনকার ভার্সন হলো, সুন্দরী নারীর ছবি যুবককে ডাকে—‘এসো যুবক, আমাকে ক্লিক করো, তা হলেই আমাকে পেয়ে যাবে। আমার সব কিছু পেয়ে যাবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, এসো ক্লিক করো।’ আর যুবক বলবে, ‘আমি ক্লিক করবো না, আমি তো আল্লাহকে ভয় করি।’ পরনারীর ভিডিও-ফটো-বিলবোর্ড—এগুলোও পরনারীর আহ্বান।

নজরের হেফাজত যে করতে পারে না, তার ঈমানের সাথে মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ আছে।

১০. নিজেদের পুরস্কার দিন

পূর্ণ দেখা একটা নেশা, আগেই বলেছি। মগজে ডোপামিন ক্ষরণ বাড়িয়ে ‘রিওয়ার্ড সেন্টার’কে উদ্দীপিত করে। আমাদের সব সুখের অনুভূতির জন্য, তৃপ্তির অনুভূতির জন্য এই সেন্টারে ডোপামিনের পরিমাণ দায়ী। এ-জন্য পূর্ণ ছাড়তে বিকল্প পথে ডোপামিন সরবরাহ করতে হবে। নিজেকে ছোট-ছোট পুরস্কার দিতে হবে, সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু বিস্তারিত বলি। ডোপামিন আমাদের ব্রেইনের একটা ইম্পোর্টেন্ট নিউরোট্রান্সমিটার বা নিউরনহরমোন। মানে হলো, কেমিক্যাল

[১] আস-সুনান, ইবনে মাজাহ : ৪২৪৫; সহীহ : ৫০৫০

নীল কৃষ্ণগাহুর

সিগন্যাল, যেটা সব ধরনের আনন্দ/তৃপ্তি/ মোটিভেশনের জন্য প্রধানত দায়ী। আমাদের মগজ সব ধরনের আনন্দের অনুভূতি এভাবে তৈরি করে; সেটা বেতন-বোনাস-লটারি জেতাই হোক, যৌনমিলন হোক, কিংবা হোক নাগ্নার কাচ্চি অথবা নেশাদ্রব্য।^[১] তবে ড্রাগ এ-এলাকায় ডোপামিনের বন্যা বইয়ে দেয়, ফলে এত আনন্দ হয়, যেটা আসক্ত লোক বারবার পেতে চায়। এভাবে নেশা বা আসক্তি হয়।^[২] পর্নগ্রাফির ফ্লেক্সেও একই ঘটনা ঘটে।

শাইখ উমায়ের কোব্বাদির মজলিস থেকে :

- ❧ মজাদার জিনিস ছেড়ে দিলে আল্লাহ বিকল্প মজাদার জিনিস দেবেন। এটা আল্লাহর রীতি।
- ❧ দৃষ্টি পড়ার পর যে আল্লাহর জন্য দৃষ্টি সরিয়ে নেবে, আমি আল্লাহ তাকে ঈমানের এমন স্বাদ দেবো, যা সে অন্তরে অনুভব করবে।

নিচের বিষয়গুলো সরাসরি ডোপামিনচালিত রিওয়ার্ড সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত :

- ❧ একটি ধ্যানমগ্ন নামাযের পর যে-তৃপ্তি, দেখবেন, তৃপ্তিটা আবার পেতে ইচ্ছে করে।
- ❧ ক্রন্দনময় একটি ইস্তেগফার সেশনের পর যে-শীতল অনুভূতি, বারবার পেতে মন চায়।
- ❧ কুরআন তিলাওয়াতের সময় অর্থ বুঝতে পারার আনন্দ বা মজাটা অনুভব হয়।
- ❧ সিজদায় পড়ে কান্নার পর ফ্রেশনেস, লম্বা তিলাওয়াতের সাথে তাহাজ্জুদ বারবার পড়তে মন চায়।
- ❧ নিজেকে এই রিওয়ার্ডগুলো বারবার দিন।

[১] Harvard Mental Health Letter, How addiction hijacks the brain
https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/how-addiction-hijacks-the-brain

[২] The Brain on Drugs: From Reward to Addiction, Nora D. Volkow & Marisela Morales, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Bethesda, MD ২০৮৯২, USA প্রকাশিত হয় জার্নাল Cell (Volume ১৬২, Issue ৪, ১৩ August ২০১৫, Pages ৭১২-৭২৫)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415009629>

কোনো একটি সাংগঠনিক কাজ করুন। একটি দাওয়াহ প্রোগ্রাম/ তাবলিগি জোড/ মেহমানদারি/ দরিদ্রদের সাদাকা প্রোগ্রাম বা কোনো একটি দ্বীনের ফেদমত/শরীয়তসম্মত কোনো সোশ্যালওয়ার্ক। দূরে-দূরে থেকে নয়, নিজে দায়িত্ব নিয়ে, কষ্ট উঠিয়ে। কাজটা শেষ হবার পর আত্মতৃপ্তিটা রিওয়ার্ড সেন্টারের সাথে রিলেটেড। এ-রকম কাজ বারবার করুন।

নিজের প্রতি আল্লাহর অব্যাহত নিয়ামত স্মরণ করুন। আল্লাহ আপনাকে কী কী নিয়ামত দিয়েছেন। প্রতিটি নিয়ামত, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা, সম্ভানের সাথে কটানো প্রতিটি সেকেন্ড, স্ত্রীর সাথে খুনসুটির প্রতিটি শব্দ উপভোগ করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ শরীরের সব রোমকূপ থেকে বনুন; এগুলো সেল অব রিওয়ার্ডকে ধারালো করবে; অল্প-অল্প জিনিসে রিওয়ার্ড যুঁজে পাবেন, ভোপামিনকে বাড়াবেন। বারবার বনুন। এগুলোতে নেশাসক্ত হোন।

১১. যাদের শারীরিক ক্ষতি হয়ে গেছে তাদের কী করণীয়

প্রথমত, বদভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় কোনো অপশন নেই।

অনেকে বিয়ে করতে ভয় পান। যদি সকালে লিঙ্গোত্থান হয় (morning erection), মানে, ঘুম থেকে জেগে মাঝে-মাঝে লিঙ্গ শক্ত পান, তা হলে নির্ভয়ে বিবাহ করুন।

লিঙ্গের আকার যা-ই হোক, গঠন বিগড়ে যাক, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক করার জন্য কলিকাতা হার্বাল বা শিয়াল/গন্ধগোকুল তেল মালিশ করবেন না; যেটুকু আছে, সেটুকুও হারাবেন না। কিছু টেকনিক জানলে যেটুকু বাকি আছে, ওতেই সর্বোচ্চ উইকেট অর্জন করা সম্ভব। কোনো দুশ্চিন্তা নয়—হা-কুনা মাতাতা।

বীর্যের মতো পাতলা তরল আসছে/বীর্য পাতলা হয়ে গেছে/অতিরিক্ত দ্রুগদেব হচ্ছে/প্রসাবের শেষে আঁঠালো পদার্থ বের হচ্ছে/প্রস্রাবের উপরে কী কী বেন ভাসে! বা ইচ্ছা, তা-ই হোক—এগুলো কোনো অসুখ না। কলিকাতা হার্বাল আনাদের মনে গোঁথে দিয়েছে, তোমার শরীর থেকে কী না কী বেরিয়ে যাচ্ছে; যা হয় হোক।

এখন শুনুন, ঘটনা কী হয়। বীর্য (semen) ও বীর্যের সহকারী তরল (prostatic fluid) তো উৎপন্ন হতেই থাকে আর একটা বস্তুর (seminal vesicle) মধ্যে এসে জমতেই থাকে। যেহেতু এত দিন বের করে ফেলেছেন, তাই জমে উপচে পড়ার সুযোগ পাবেন। এখন যেহেতু বদভ্যাসটা বাদ দিয়েছেন, তাই জমে ভরে উপচে

নীল কুম্ভাগুর

পড়ছে। ব্যস, এটাই ঘটনা। কোনো ডাক্তার-ওষুধ কিছু দরকার নেই। আপনার কাজ শুধু খাওয়া-দাওয়া ঠিক রাখা। খাবার-দাবার ঠিক রাখলে আর বদভ্যাস বাদ দিলে বীর্ষ এমনিতেই ঘন হয়ে যাবে।

যৌনশক্তিবর্ধক খাবার

মধু	পেঁয়াজ
তরমুজ	তিন ফল
বাঁধাকপি	পুঁইশাক
ফুলকপি	ডালিম
ফলমূল	কুমড়ার বিচি
প্রচুর পানি	মিষ্টি আলু
চিনেবাদাম	ডিম
কলা	মিসওয়াক (indiatimes.com)
আপেল	দুধ
রসুন	ব্র্যাক চকলেট

পরিহারযোগ্য খাবার

আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার (কোক, জুস)
পপকর্ন
অতিরিক্ত লবণ
এলকোহল
পনির
অধিক রেডমিট
সোডা বেভারেজ (কোক, এনার্জি ড্রিংক জাতীয় সব)
সিগারেট (তামাক জাতীয় সব)
গাঁজা
চিংড়ি
মিষ্ট (চকলেটে থাকে)
বোতলজাত পানি

কুররাতু আইয়ুন ২

- ৩ বেশি ঝাল/মসলাযুক্ত খাবার (চিপস, চানাচুর)
- ৩ বেশি কফি
- ৩ জাংক ফুড

অনেকের আবার মনে হয়, নানাযের মধ্যে কী যেন বেরিয়ে আসছে, বা সব সময় কী যেন বেরোচ্ছে। এগুলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আপনার মনের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে শয়তান আপনাকে আমলের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। ইগনোর করুন, পাত্তা দেবেন না।

আর পায়খানার চাপে বা যে-কোনোভাবে পাতলা তরল বের হলে গোসল করতে হয় না, কেবল উয়ু করে কাপড় বদলে নিলেই চলে। শুধু জোরসে তৃপ্তির সাথে ঘন তরল বের হলে গোসল করজ হয়।

স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, চোখে কম দেখা ইত্যাদির জন্য আসলে কিছু করার নেই। খাওয়া-দাওয়া ঠিক রেখে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলবেন। এগুলো ঠিক হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

আর দুআ করতে হবে—‘আল্লাহ, যে ভুল করার করে ফেলেছি, মাফ করে দিন। আর ভুলের ক্ষতি থেকে বাঁচান।’

আর যদি লিঙ্গ একেবারেই নিস্তেজ থাকে, মর্নিং ইরেকশনও না হয়, তবে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। দ্বীনদার ডাক্তার হলে ভালো হয়। যেমন : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বুলবুল (উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল) ও ডাক্তার মারুফ (হলি লাইফ, মালিবাগ রেলগেট)। আর যদি যৌনবাহিত কোনো রোগ সন্দেহ করেন, তবে দ্বীনদার চর্ম ও যৌনবিশেষজ্ঞ ডা. আবদুল্লাহেল কাফী স্যার (খিদমাহ হাসপাতাল)-কে দেখাতে পারেন।

১২. সমরণম

আল্লাহ তাআলা একমাত্র শিরকের গুনাহ ছাড়া সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। বান্দা যদি এক পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহও এক দুনিয়া সমান রহমত নিয়ে তার সামনে হাজির হবেন। আল্লাহর ক্রোধের উপর তাঁর রহমত বিজয়ী। আল্লাহ গুনাহ মাফ করার ক্ষেত্রে কারও পরোয়া করেন না। যতক্ষণ বান্দা তাওবা করে, মাফ চায়, নিরাশ না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তার গুনাহকে মাফ করেন। সুতরাং হতাশ হবেন না, ভাই; ফিরে আসুন। চেষ্টা করুন, আবার চেষ্টা করুন।

নীল কৃষ্ণগহ্বর

বিদেশে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে কনভার্সনের বহু নজির আছে—যদিও তারা সর্বশক্তি দিয়ে মিডিয়া থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র সব ব্যবহার করে ‘কনভার্সন থেরাপি’র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে; যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি রাজ্যে এই থেরাপি নিষিদ্ধ করিয়েছে; American Psychiatric Association-কে দিয়ে ‘ক্ষতিকর’ ফতোয়াও বের করেছে। তারপরও ওদের হিসেবেই ৬৯৮,০০০ LGBTQ+ কনভার্সন থেরাপিস্টদের শরণাপন্ন হয়েছে।^[১] এবং আরও ২০,০০০ LGBTQ+ কিশোর-কিশোরী ১৮ বছর বয়সের আগেই এ-সব থেরাপি নিতে যাবে বলে তারা ধারণা করছে।^[২] এ-থেকে বোঝা যায়, ওরা শান্তিতে নেই। এই খাহেশাতের জীবন কীভাবে শান্তি দিতে পারে? শান্তি তো কেবল ইসলামে, আল্লাহর হুকুমে আর নবীর জীবনপদ্ধতিতে। কনভার্সন থেরাপির বিরোধিতায় যে-কারণগুলো তারা দেখাচ্ছে :

- ৷ তারা বলছে, সমকামিতা কোনো মানসিক রোগ না যে, থেরাপি দিয়ে তা বদলাতে হবে। এটা স্বাভাবিক ও পজিটিভ আরেকটি ধরনমাত্র।
- ৷ ‘আমি খারাপ কাজ করছি’—থেরাপিস্টরা এই ধারণা জন্মাচ্ছে ক্লায়েন্টদের মধ্যে। ফলে আত্ম-অনুশোচনা (self-blame) তৈরি হয়, যা আরও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর। (এর পক্ষে রিসার্চ বানানো তো দুই মিনিটের ব্যাপার।)
- ৷ আর থেরাপির এক পর্যায়ে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে অ্যাভারশান করায়, যেটা মেনে নেওয়া যায় না।

সমকামী এন্টিভিস্টদের এইসব প্রোপাগান্ডার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন আমেরিকান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট Dr. Joseph Nicolosi, যিনি ক্যালিফোর্নিয়ার Thomas Aquinas Psychological Clinic-এর প্রতিষ্ঠাতা। তার মতে সমকামিতা জন্মগত নয়, বরং পরিস্থিতির সাথে একধরনের খাপ খাওয়ানো (adaptation to

[১] According to the UCLA Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy, as of 2018, almost 700,000 lesbian, gay, bisexual, transgender and queer/questioning (LGBTQ) adults in the U.S. had received “conversion therapy”; in addition, an estimated 57,000 youths will receive change efforts from religious or health care providers before they turn 18 years old. <https://www.ama-assn.org/system/files/2019-03/transgender-conversion-issue-brief.pdf>

<https://www.insider.com/conversion-therapy-lgbtq-community-discredited-banned2019-9>

[২] <https://www.newsweek.com/20000-lgbtq-teens-gay-conversion-therapy-1452999>

www.))। তিনি মনে করেন, সমকামিতা কেবল নিজের জৈবিক গঠনের বিকলতায়ই নয়, বরং নিজের ব্যক্তিত্বের সাথেও গৌনঃপুনিক এক সংগ্রাম। মোকদ্দমা তিনি মনে করেন, সমকামীরা নিজের পরিচয় নিয়ে সমকামী জীবন নিয়ে সুখী নয়। এ-জন্য ১৯৮১ সাল থেকে তিনি শুরু করেন Reparative therapy। এটি কলতর্পন থেরাপি নয়, বরং পুরোটা মানসিক থেরাপি। তার ফ্রান্সেট হচ্ছে তারা, যারা মনে করে, আমি আসলে সমকামী হতে চাই না, কিন্তু সমকামী-আকর্ষণ আমাকে সমকামী হতে বাধ্য করে। বিশেষ করে ছোটবেলায় যৌন-নির্বাতন বা নারীজাতির প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত শীতলতা থেকে যারা সমকামের পথে গেছে, এমন শত-শত মানুষ তার এই থেরাপি দ্বারা উপকার পেয়েছে। ১৯৯২ সালে আরও দুজন সাইকিয়াট্রিস্টকে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH)। ‘সমকামিতা অপরিবর্তনযোগ্য নয়’—এই বিষয়ে Dr. Joseph Nicolosi একা নন, আছেন American Psychological Association-এর সাবেক দুজন প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D এবং Robert Perloff, Ph.D। বহু ফিরে-আসা সমকামীদের সাফল্যের কাহিনি পাবেন Dr. Joseph Nicolosi (১৯৪৭-২০১৭)-এর ওয়েবসাইট <https://www.josephnicolosi.com/>-এ।

অবশ্য আমাদের দ্বীনই তো সবচেয়ে বড় কাউন্সেলিং। মৃত্যু হচ্ছে সর্বোচ্চ নাসিহা। দুনিয়ার এই অল্প কটা দিন নিজের মনকে শেকলে আবদ্ধ করে রাখাটাই তো কাজ। মুমিনমাত্রই পরীক্ষায় থাকবে। আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন, ‘মানুষ কি মনে করে কেবল ‘ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না?’^[১] কারও পরীক্ষা সম্পদের, কারও সম্পর্কের, কারও বিপদাপদের, কারও অসুখবিসুখের। আমাদের এই ‘ভুল আকর্ষণ’ও আমাদের একটি পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে, হেঁচট খেলেও বারবার উঠে দাঁড়াতে হবে। আপনি পারবেন। বান্দা হারাম ছেড়ে হালালের উপর চলতে চাইবে আন্তরিকভাবে, আর আল্লাহ সাহায্য করবেন না, এটা হতেই পারে না! পারে, বলেন! এই মুহূর্ত থেকে—

- ৞ সকল প্রাক্তন সঙ্গীর নাম্বার ডিলিট করুন।
- ৞ ফোন-নাম্বার চেঞ্জ করুন।

[১] সূরা আনকাবুত : ০২

নীল কৃষ্ণগহ্বর

- ৩৩ ষেসবুৰু ডিএস্টিত করুন। একাউন্ট ডিলিট করুন।
- ৩৪ মসজিদে ষীনি সার্কোলে সময় বেশি দিন। ষীনি কাজে ব্যস্ত থাকুন।
- ৩৫ কোনো পুরুষের প্রতি দুর্বলতা অনুভব হলে তার সংশ্রব পরিহার করুন, তার থেকে নজরের হেফাজত করুন।
- ৩৬ পর্ন ও হস্তমৈথুন ছাড়তে এতক্ষণ যা যা আলোচনা হলো, সেগুলো সমকামিতার ক্ষেত্রেও চর্চা করুন।
- ৩৭ কাউন্সেলিংয়ের জন্য উপরে দুইজন সাইকিয়াট্রিস্টের নাম দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। শাইখ উমায়েরের সোহবতে যান, তার বাতানো পদ্ধতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করুন। গুনাহ ছাড়া কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়।
- ৩৮ শারীরিক সমস্যাগুলোতে উপরের পরামর্শ অনুযায়ী আমল করুন।

ভয়ংকর আঁধার রাত্রি শেষে পাখির কিচিরমিচিরের সাথে ফুটবে ভোরের আলো। সেই শুদ্ধ হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নেবো এক দিন। এমন শুদ্ধ সকালের প্রতীক্ষায় কটুক আমাদের রাত্রিগুলো। প্রতীক্ষার শিখাটুক যেন নিভে না-যায় হতাশার ফুঁৎকারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ডাক্তার(র)হস্য

আজ আপনাদের সামনে ডাক্তারদের রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছি। এই রহস্যগুলো কাছে লাগিয়ে কীভাবে আপনারা আরও ভালো সেবা পেতে পারেন, সেটা অনুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য। সেই সাথে রোগী কিছু অধিকার সংরক্ষণ করে, সেগুলো জানলে চিকিৎসার আপনার স্যাটিসফেকশনও বাড়বে। আশা করি, আমাদের আজকের আলোচনা ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক এবং সেবার মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে একটি সিলেবাস টাইপ হবে। সব বিষয়ে হয়তো আপনারা একমত হবেন না। কারণ, আমার সেবা ‘সেবাদাতা’র দৃষ্টি থেকে আর আপনি ‘গ্রহীতা’। অবশ্য আমারও আত্মীয়স্বজন অনুহ হন, তখন আমিও গ্রহীতা হই। সে-হিসেবে আমার বিশ্লেষণে আত্ম আপনি রাখতেই পারেন। তো শুরু করি। খুব শক্ত বাস্তবতার এঙ্গেল থেকে কথা হবে। দুর্বল হার্টের লোকেরা সাবধানে পড়বেন।

ক্লিনিক বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টার

যখনই আপনি কোনো প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে যাবেন, আপনাকে ধরে নিতেই হবে যে, আপনাকে নিয়ে ব্যবসা করা হবে। ক্লিনিক বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টার অবশ্যই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কোনো লব্ধরখানা বা দাতব্য চিকিৎসালয় না। ভালো করে মুখস্থ করে নিন, এগুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, আপনি তাদের খদ্দের, মুনাফার উৎস। সুতরাং আপনার থেকে মুনাফা নেওয়া হবে। ‘না, তারপরও’ ‘একটু রয়েসয়ে তো লাভ করবে’ ‘সেবামূলক মনোভাব’—এগুলো প্রেমিকা-টাইপ ন্যাকানো। পুঁজিবাদ নির্দয়, নির্মম। স্বাস্থ্য পুঁজিবাদের অনেক ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা, কোনো ‘সেবা’ নয়। অতএব বাস্তবতা হলো, আপনি যখন এখানে আসবেন, আপনার থেকে যতটুকু লাভ করা যায়, এরা করবে। প্রথম মন থেকে যে-কথাটা ঝেড়ে ফেলবেন, সেটা হলো, ‘এরা মানবতার সেবা করার জন্য বসে আছে’; ‘সার্ভিস’ মানে যদি ‘সেবা’ হয়, তা হলে ঠিক আছে; কিন্তু এই সেবা মানে যদি ঐ সেবা ধরে নেন, তা হলে আপনি স্বপ্নের জগতে আছেন। স্বাস্থ্যসেবা

ডাক্তার(র)হস্য

না বলে ‘স্বাস্থ্যব্যবসা’ বললে আপনি বা সার্ভিসদাতা কেউই প্রত্যাশার চাপে ভুগলেন না।

তো বড়-বড় থেকে নিয়ে মকদ্দমার অনিভেগলিতে, আপনাকে সেবা না, আপনাকে ‘ব্যবসা’ করা হবে। এখানে তারা কিছু ডাক্তার বসার অনিধিত পারম্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। জীববিদ্যায় এই সম্পর্কটাকে আমরা বলি মিথোজীবিতা—তুমি আমাকে দিবা, আমি তোমাকে দেবো। আমি তোমাকে এসি টিপটপ চেয়ার করে দেবো, তোমার মার্কেটিং করে রোগী এনে দেবো; আর আমার লাভ হলো, তুমি টেস্ট দেবে, ক্লিনিক হলে রোগী ভর্তি দেবে, গাইনি সার্জন হলে সিজার করবে—প্রয়োজনে, সামান্য প্রয়োজনে। একটু বেশি-বেশি দিলে ভালো হয়। আর যদি তোমার থেকে অন্য কাউকে আমি বেশি টেস্ট দিতে দেখি, তবে তোমাকে সরিয়ে তাকে চেয়ার দেবো। সরাসরি না বললেও আকারে ইঙ্গিতে এই প্রত্যাশার চাপ টের পাওয়া যায়। সুতরাং টেস্ট দিলে বেজার হবেন না, বেশি দিলেও বেজার হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এরা আপনাকে নিয়ে বাণিজ্য করবে, এটা আপনি জেনেই সেখানে গিয়েছেন। এই টেস্ট না-দিলে আপনি এই ডাক্তার ভদ্রলোককে এখানে পেতেনই না; এখানে ডাক্তার দেখাতে পারছেন, কারণ ডাক্তারের উপর ক্লিনিক-ডায়গনোস্টিক সেন্টারের মালিকপক্ষ সন্তুষ্ট। এখন এই বাঁতার ভেতরেই কীভাবে সর্বোচ্চ সেবাটা নিতে পারি? খরচ করতে তো সমস্যা নেই; সমস্যা হলো, যখন টাকা খরচ করেও কাস্ট্রিকত সেবাটুকু পাচ্ছি না, সন্তুষ্ট হতে পারছি না। তবে বড়-বড় জায়গায় অনেক কাস্টমার তো, এ-সব প্রত্যাশার চাপ কম। প্লাস সেবা অনেক এঙ্গেলে দেবে, নেবেও অনেক এঙ্গেলে একটু-একটু। এ-জন্য বড় জায়গায় রোগীর সন্তোষ বেশি। চিকিৎসা নেবার আগে ‘আপনি তাদের একটা ব্যবসা’ এটা মনে করে গেলে, দেখবেন গায়ে অতটা লাগছে না।

ভিজিট বেশি

দুই নম্বর হলো, ডাক্তারের ভিজিট বেশি। আমরা ডাক্তাররা রোগীর কাছে সময় বিক্রি করি। আমি আপনাকে সময় দেবো, বিনিময়ে আপনি আমাকে ভিজিট দেবেন। এখন, আমি আমার সময় কত টাকায় বেচবো, এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। ‘মানবসেবা’ জাতীয় ন্যাকামো দূরে রেখে এসে কথা বলতে হবে। এটা পুঁজিবাদ-বস্তুবাদের যুগ—যান্ত্রিক ও আবেগশূন্য। এখানে টাকায় কথা বলে, কথায় কথা বলে না। আপনার যদি এই রেটে পত্তা পড়ে, আপনি আমাকে দেখাবেন, না-হলে

অন্য কোনো ডাক্তারের 'শপ'-এ যাবেন। চেম্বারকে আমি বলি 'স্বাস্থ্য-দোকান'। এ-জন্য যে-সব ডাক্তাররা চেম্বারের বাইরে 'ভিজিট ১০০০-১২০০' টাঙ্কিয়ে রাখেন, তাদের আমি সাধুবাদ দিই। আমার সময়ের দাম আপনাকে জানালাম, লিলে লেন, লা লিলে লা লেন—কোনো লুকোছাপা নেই। আগে ভেতরে ঢুকিয়ে দেখে পরে দাবি করবো, আর আপনি দিতে অসম্মত হবেন, বিব্রত হওয়া-হওয়া নেই। অনেকে দেখি প্রেমিকার মতো গাল ফুলান, ডাক্তার কসাই, ১২০০ টাকা ভিজিট। কনজিউমারিজমের এই যুগে ১০০০ টাকা গজ কাপড়ও আছে, ৫০ টাকা গজ কাপড়ও আছে। আপনার যেটা কেনার ক্ষমতা, আপনি কিনবেন। ১২০০ টাকার ডাক্তার দেখাতে না-পারলে ২০০ টাকা ভিজিটের ডাক্তারও আছে। প্রফেসর তার জীবনে বহুত কাঠখড় পুড়িয়ে প্রফেসর হয়েছে, তার সময়ের দাম বেশি। তার সময় আপনাকে বেশি দামেই কিনতে হবে। কথাগুলো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আমি জানি। বাস্তবতা আসলেই কঠিন, তাইজান। আমাদের কল্পনার চেয়েও কঠিন।

আমরা এখন অনেক শিক্ষিত, অনেক সচেতন। বাচ্চার ঝর-গলাব্যথা—টনসিল ফুলেছে। আমরা বুঝে নিই 'নাক-কান-গলা'র ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। মা শা আল্লাহ। এখন নাক-কান-গলার প্রফেসর দেখালেন, ১০০০ টাকা ভিজিট নিলো; তার অনেক রোগী, সময় কম পেলেন, এমনকি অপারেশন করানোর ব্যাপারে কনভিল হয়ে যেতেও পারেন—যেহেতু বারবার টনসিলের এটা সর্বোচ্চ চিকিৎসাপদ্ধতি; আর প্রফেসর নিজেই অপারেশন করেন; যে-ক্লিনিকে দেখালেন, সেখানে তারাও ওটিগার্জ, বেডভাড়া পাবে। আবার আমাকে (সিম্পল এমবিবিএস ডাক্তারও) দেখাতে পারেন ২০০ টাকা ভিজিটে, ওষুধ দিলাম, গেরে গেলো। সামান্য ঝর-কাশি-গলাব্যথায় প্রফেসর দেখাবেন, আবার প্রফেসর প্রফেসরের মতো ভিজিট নিলে পেছনে এসে গাল দেবেন, এটা কেমন কথা! সামান্য ঝরে এত টাকা ভিজিট! এতগুলো টেস্ট! আরে ভাই, কী অসুখ, সেটা তো কথা না; কথা হলো, কার সময় নিচ্ছেন, তিনি কী রেটে সময় দেন এবং কোথায় সময় নিচ্ছেন। যে-বিষয়গুলো আলোচনা করছি, এগুলো হলো, আমাদের গ্রহীতাদের সন্তোষ কম হবার কারণ আলোচনা করছি। অতি প্রত্যাশা এবং ভুল চয়েস সিলেকশন একটি কারণ।

সময় দেয় না

কিন্তু ডাক্তাররা তো সময়ই দেয় না! হ্যাঁ, এটি একটি পয়েন্ট! টেস্ট বেশি দেয়, এইটিও পয়েন্ট না (সে অমৌখিক কিছুটা প্রত্যাশার চাপে, না হলে ঐ জায়গায় আপনি তাকে পেতেন না), আর ভিজিট বেশি, এটিও কোনো পয়েন্ট না—সময় কম দিচ্ছে, এটা পয়েন্ট। তবে আমি যত প্রফেসরের কাছে গেছি—ডাক্তার হবার আগেও—সময় দেননি বা কম দিয়েছেন, এমনটা মনে হয়নি। তবে যদি আপনি তার কাছে ৩০ মিনিট আশা করেন, তা অসংগত। আমরা যে প্যাটার্নে রোগী দেখি সাধারণত :

- ১ প্রথম ১ মিনিটকে বলা হয় 'গোল্ডেন মিনিট'। এ-সময়ে রোগী তার যত সমস্যা আছে, বলবে। ডাক্তার চুম্বকাংশ নোট করবেন।
- ২ এরপর কিছু সময় ডাক্তার তাকে সম্পূরক প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেবেন।
- ৩ এ-পর্যায়ে ডাক্তার কিছু এক্সামিনেশান করবেন রোগীর গায়ে হাত দিয়ে।
- ৪ এরপর ডাক্তার একটি আপাত রোগনির্ণয়ে চলে যাবেন।
- ৫ সেই আপাত নির্ণয়কে নিশ্চিত করার জন্য এবং অন্যান্য সম্ভাবনাকে নাকচ করার জন্য কিছু টেস্ট দেবেন।
- ৬ টেস্টের রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসবেন এবং ওষুধ লিখবেন।
- ৭ ফাইনালি রোগের ভবিষ্যত এবং আরও কী কী ধরন আছে, চিকিৎসার এ-সব বিষয়ে রোগীকে জানানবেন। আবার ফলোআপে কবে আসতে হবে জানানবেন। খাওয়ার বাছবিচার সম্পর্কে জানানবেন। ব্যস।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি ৫-১০ মিনিটের কমে অসম্ভব এবং আমার-দেখা অধিকাংশ ডাক্তারকে আমি এগুলো মেইনটেইনই করতে দেখেছি। আরেকটি ব্যাপার হলো, কিছু রোগ আছে, ধরতে সময় লাগে না। যেমন ধরুন, আপনি আমার কাছে এসে বললেন, 'আমার ঝর আর গলা ব্যথা, কিছু খেতে পারছি না।' আমি জিঙেস করলাম, 'ঢৌক গিললে খোঁচা লাগে?' আপনি কষ্ট করে ঢৌক গিলে বললেন, 'জি।' আমি টর্চ জালিয়ে টনসিল দেখে বুঝে নিলাম—টনসিল ফুলেছে। এক মিনিটেরও কম সময়ে আপনার রোগ ধরা শেষ, ওষুধ লেখাও শেষ। এ-রকম কিছু অসুখ আছে, একদম অঙ্কের মতো। তবে আমি যেটা করবো, রোগীর স্যাটিসফেকশনের জন্য আরও ৫টা প্রশ্ন করবো, যেগুলো জানার আমার দরকার

কুররাতু আইয়ুন ২

নেই। যেমন—খাওয়ার রুচি কেমন, প্রস্রাবে জ্বলে নাকি, বমি লাগে কি না, ঘুম কেমন হয় ইত্যাদি। এগুলো রোগ ধরার জন্য আমার দরকার নেই। আমি প্রেসারটাও দেখবো, ওজন দেখবো। মোদাকথা, যেহেতু সে ৩০০ টাকা ভিজিট দিয়ে আমাকে দেখাচ্ছে, তার ৩০০ টাকার স্যাটিসফেকশন তাকে দিতে হবে। কমপক্ষে ৫-৮ মিনিট তাকে ভেতরে রাখবো—যদিও কাজ হয়ে গেছে ১ মিনিটেই।

এতক্ষণ বেসিক আলোচনা করলাম। এবার আপনার রোগী হিসেবে কী করণীয়! পুঁজিবাদের যাঁতায় পিষ্ট হয়েই (যাঁতা থেকে কোনো সেক্টরেই বাঁচতে পারছেন না, এখানেও পারবেন না) সর্বোচ্চ সেবাটা কীভাবে পেতে পারেন?

ক.

আপনার যদি কারও ‘ব্যবসা’ হতে না-চান বা সামর্থ্য না থাকে, তা হলে আপনাকে সরকারি হাসপাতালে যেতে হবে। খুব বড় অসুখে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা পিজিতে যেতে হবে। তবে সমস্যা হলো, সেখানে সব কিছুতেই বড়-বড় সিরিয়াল! বেড-কেবিন থেকে নিয়ে সিটি স্ক্যান-অপারেশন-আইসিইউ—সবখানেই সিরিয়াল। তবে ধৈর্য ধরতে পারলে সেখানে সব ধরনের চিকিৎসাই হবে এবং ব্যবসার স্বীকার হতে হবে না। দালালদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে বাইরে কোথাও যাবেন না, কামড়ে পড়ে থাকবেন। যে-প্রফেসররা চেম্বারে ১২০০ টাকা ভিজিটে দেখেন, তারাই এ-সব স্পেশালাইজড সরকারি দাওয়াখানায় হাসপাতালভর্তি রোগী দেখেন। সুতরাং একটু লম্বা লাইন হলেও এখানে চিকিৎসা নেবেন।

খ.

রোগীর অধিকার এটা যে, সে তার রোগ সম্পর্কে জানবে, রোগের ভবিষ্যৎ-পরিণতি সম্পর্কে জানবে, আর কী কী চিকিৎসা আছে, সেগুলো সম্পর্কে জানবে; এবং টেস্টগুলো কী কী কারণে তাকে দেওয়া হচ্ছে, তা জানবে। যেহেতু আপনি টাকা খরচ করবেন, এগুলো জানার অধিকার আপনার আছে। ডাক্তার এগুলো জানাতে নীতিগত ও পেশাগত দায়িত্ব থেকে বাধ্য। যদি কোনো ডাক্তার এগুলো না-জানায়, সময়ের কারণে জানাতে অস্বীকার করে, আপনি তার কাছে আর যাবেন না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন; তার পেশাগত খ্যাতি, যেটি আপনার দ্বারা হতে পারতো, সেটি ওখানেই শেষ। এটি তার শাস্তি।

গ.

কিছু অসুখ আছে, ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা, যেমন—ডায়বেটিস, হাড়ের অসুখ, মানসিক অসুখ, হৃদরোগ। এগুলো রোগীকে নিয়ে ডাক্তারের একটা দীর্ঘ মান থাকে। নেঙ্গট ভিজিটে তাকেই দেখাবেন; আপনাকে নিয়ে কী পরিকল্পনা, জেনে নেবেন। আপনি তাকে মুফতে দেখাচ্ছেন না, টাকা দিয়ে দেখাচ্ছেন। তাই নিজের রোগসংক্রান্ত সব তথ্য জেনে নেবেন, ভয় বা লজ্জা করবেন না—অধিকার বুঝে নেবেন। ঘন-ঘন ডাক্তার সুইচ করবেন না, তা হলে প্রতি ডাক্তারই আপনার চিকিৎসা শুরু থেকে শুরু করবে। ডাক্তার যদি পছন্দ হয়, এরপর পির সাহেবের মতো তার সাথেই লেগে থাকবেন।

ঘ.

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ফুল সেটআপে আপনার সামনে বসা ডাক্তারটিকেই একমাত্র আপনার পক্ষে আনতে পারবেন। এ-ছাড়া এই পুঁজিবাদী সিডিকেটের কেউ আপনার পক্ষে নেই। প্রতিটি ছেলেমেয়ে ডাক্তারি পড়তে যায় ‘মানবসেবা’র স্বপ্ন নিয়েই। পুঁজিবাদ-বস্তুবাদ মিলে তাকে রুঢ় করে তোলে। আমার বেশ কটা রোগী আছে সেক্সুয়াল সমস্যা। ভায়াগ্রা ডেরিভেটিভ ব্যবহার না-করে আমি মাস দুয়েক তাদের চিকিৎসা করি, এরপর কাজ না হলে রেফার করি। অনেকেই সাফল্যের সাথে স্ত্রী-সহবাস করছেন। একজনের ১০ মাসের সংসার ভেঙে যাচ্ছে বলে আমি তার স্বশুরকে পর্যন্ত ফোন করেছি—‘আমাকে ৩ মাস সময় দিন; এরপর দরকার হলে আপনাদের মেয়ে নিয়ে যাবেন।’ যদি দেখি, আমার চেম্বারে ডায়গনোস্টিকের কোনো প্রেসার আছে, হয় আমি আর চেম্বার করি না, না হয় কোনো টেস্ট যদি আমাকে দিতে হয়, যা আমার করার কথা না, আমি ভিজিট ফেরত দিয়ে দিই। মোটকথা, ডাক্তারই একটি লোক, যাকে আপনি আপনার পক্ষে আনতে পারলে পুঁজিবাদের এই ‘ব্যবসা’ হওয়া থেকে একটু লাঘব পাবেন। তাকে পক্ষে আনতে পারলে এমন অনেক কিছুও সে আপনার জন্য করবে, যা তার করার কথা না। সুতরাং গোল্ডেন মিনিটে তাকে পক্ষে আনুন। জাস্ট দুটো বাক্য—‘স্যার, অনেক জায়গায় চিকিৎসা হয়েছে, টাকাপয়সা খরচ করেছি। শেষমেশ আপনার নামডাক শুনে আপনার কাছে এলাম।’ ডাক্তারের কাছে আপনি আকাশসমান আশা নিয়ে এসেছেন তার সুনাম শুনে, এটি তাকে বোঝাতে পারলেই ‘কেল্লা ফতে’। সেই সুনাম ধরে রাখার জন্য হলেও সে আপনাকে এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে দেখবে।

৬.

যার জ্ঞান বেশি, সে ভালো ডাক্তার হবে, এমন কোনো কথা নেই। পেশেন্ট ডিল করা ভিন্ন একটি যোগ্যতা। ভালো ডাক্তার চিনবেন কীভাবে :

☞ ডিগ্রি থাকবে। খুব বেশি জটিল রোগ না-হলে খুব বেশি ডিগ্রিওয়ালা ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার নেই। বেশি ডিগ্রি মানে 'বিরল' রোগ ধরার যোগ্যতা আছে তার। এখন বিরল রোগও বিরল। অধিকাংশ অসুখ, যা আমাদের হয়, সচরাচর সেগুলো ধরতে ও চিকিৎসা করতে খুব প্রচুর উচ্চতর ডিগ্রি লাগে না। বর্তমানে বাংলাদেশের এফসিপিএস ও এমডি ডিগ্রিই প্রায় আমাদের ৯৫% রোগ সঠিকভাবে ধরা ও চিকিৎসা করার জ্ঞান দেয়। সুতরাং শুরুতেই নিজেকে বিরল রোগে আক্রান্ত মনে করবেন না, যে, রোগ একজন এফসিপিএস ডাক্তার ধরতে পারবেন না, আরও ডিগ্রিও লাগবে।

☞ রোগ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য রোগীকে সরবরাহ করার মানসিকতা রাখেন। কোন টেস্ট কেন দিচ্ছি, লেখার ফাঁকে-ফাঁকে একটু বলে দিলে কী ক্ষতি!

☞ রোগীকে কথা বলতে দেন, রোগীর কথা শোনেন।

☞ দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ সিরিয়াল নেন। দিনে এতগুলোর বেশি রোগী দেখবেন না, এমন মানসিকতা রাখেন। যত বেশি রোগী, রোগীপ্রতি সময় তত কম। এ-জন্য যে-ডাক্তারের রোগী খুব বেশি, সেখানে যাবেন না, তিনি আপনাকে চাইলেও বেশি সময় দিতে পারবেন না, দিন তো ২৪ ঘন্টাই। একই মেধার ডাক্তার আরও আছে।

৮.

প্রথমে ছোট ডাক্তার দেখাবেন। কারণ, আমাদের ৯০% অসুখই ছোটখাটো অসুখ। এরপর যদি লাগে, সে আরও বড় ডাক্তারের কাছে পাঠাবে; হতে পারে, তারই কোনো স্যারের কাছে পাঠাবে। ছাত্র পাঠিয়েছে দেখলে সেই স্যারও আন্তরিক বেশি হবেন। একজন এমবিবিএস ডাক্তারের সেই যোগ্যতা আছে যে, সে ৯৫% রোগ ধরতে পারে এবং ৮০% রোগের পরিপূর্ণ চিকিৎসা দিতে পারে। সুতরাং এমবিবিএসকে ছোট করে দেখার যে কালচার তৈরি হয়েছে, তার পেছনে অবশ্য মানহীন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন অনেকটাই দায়ী।

৬. ডাক্তারকে নিজ থেকে কোনো সাজেশন দেবেন না। আমি যে-স্যারকে ব্যবহারের দিক থেকে মেন্টর ভাবি (জ্ঞানের দিক থেকে হতে পারবো না)। প্রফেসররা দিনের বেলা ক্লাস নেওয়া, নানান সরকারি সেমিনার, প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। স্যার কোনো দিন রাউন্ড দিতে না-পারলে রাতে চেম্বার থেকে বাসায় ফেরার সময় ক্রিটিকাল রোগীগুলো দেখে যেতেন—যদিও তখন সরকারি টাইম না, দিনেও তিনি সরকারি কাজেই ছিলেন। তো স্যারকে দেখতাম, কেউ যদি বলেছে—‘স্যার, ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেলে মনে হয় ভালো হবে। আপনি কী বলেন?’ স্যার বলতেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো! ইন্ডিয়াতে নিয়ে যান।’ অথচ অসুখটা এমন জটিল কিছু না। স্যার বলতেন, ‘রোগী যদি তোমার উপর আস্থা না-পায়, তুমি তাকে দেখবা না। সে কখনোই তোমার হাতে সুস্থ হবে না।’ এ-জন্য নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কোনো সাজেশন দেবেন না। গ্যাসট্রিক আল্ট্রাসোনোতে বোঝা যায় না। আমি বুঝতে পারছি, রোগীর গ্যাসট্রিক। রোগী বলল, ‘স্যার, একটা আল্ট্রা করে দেখলো হতো না!’ আমি জানি, ওর আল্ট্রা করার দরকার নেই। এরপরও দিতে হবে। আল্ট্রা না করিয়ে দত গুঁধই দিই, সে ভালো হবে না।

৭.

আপনার হাতে তুরপের তাস হলো ‘সুনাম’। ডাক্তাররা টাকার চেয়ে ‘সুনাম’-এর বেশি কাঙ্ক্ষা। এই সুনামের জন্যই অধিকাংশ ডাক্তার ভালোভাবেই রোগী দেখেন। বাদে সুনাম দরকার নেই (অলরেডি প্রচুর খ্যাতি, প্রচুর রোগী), তাদের দ্বারা ঘটনাগুলো ঘটে। সুনামধারী ডাক্তারের চেয়ে সুনামপ্রত্যাশী ডাক্তারের কাছে আপনি বেশি সম্ভ্রষ্ট হবেন। খুব বিরল রোগ ছাড়া বেশি সুনামি লম্বা-সিরিয়াল লম্বা-ডিগ্রি ডাক্তারের কাছে না-যাওয়াই ভালো।

এ-পর্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের ভুল ধারণার অপনোদন :

১. সিজার

সিজার করে বাচ্চা প্রসব করা একটি বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় আধুনিক চিকিৎসা। জনপ্রিয় কেন বললাম? আমি একটি ৫০ বেডের সরকারি হাসপাতালে চাকরি করি। এখানে গাইনি সার্জন পোস্ট থাকলেও নিয়োগ নেই। তবে আমাদের একজন মেডিকেল অফিসার আছেন, যিনি আশপাশের ক্লিনিকগুলোতে ধুমসে

কুররাতু আইয়ুন ২

সিঁজার করেন এবং তার স্কিল লিজেন্ড লেভেলের। একটি সিঁজার করতে তার ১৫-২০ মিনিট লাগে এবং নিখুঁত। এমবিবিএস ডিগ্রি হাল আমলে পাভা না-পেলেও, এ-সব টুকটাক অপারেশনে এমবিবিএসই যথেষ্ট—যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে চায়। তো তাকে দিয়েই যখন আমার সরকারি হাসপাতালে জটিল কেসগুলোর সিঁজার শুরু হলো, বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তখন সিঁজারের জন্য এত লম্বা লাইন লাগলো যে, সিভিল সার্জন বাধা হলেন সিঁজার বন্ধ করতে। নরমালেই হবে এমন অধিকাংশ শিক্ষিত-অধশিক্ষিত, এমনকি গ্রামের লোকেরাও সিঁজার করাতে আগ্রহী। এত দিন ভাবতাম, ডাক্তাররা বুঝি বেশি চার্জ করার জন্য সিঁজার করে। আমার ভুল ডাঙলো। সিঁজারের জনপ্রিয়তার পেছনে একটি অন্যতম কারণ কিন্তু স্ত্রীর যোনিপথ বড় হয় না, ফলে মিলনে স্বামী-স্ত্রী কেমিস্ট্রি বজায় থাকে। এ-জন্য কখনো স্বামীও চায় সিঁজার হোক, কখনো স্ত্রী চায় সিঁজার হোক। কিন্তু সিঁজারে যে-ঘটনাটা ঘটে, নারীর কিছু কাজ, যেগুলোতে কিছুটা শারীরিক শক্তি লাগে, সেগুলো সে আজীবন আর করতে পারবে না। ভারী কাজ করলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এটা আমাদের শহরে কর্পোরেট নারীদের ইফেক্ট না-করলেও মফস্বলের সংসারী নারী বা গ্রামের গৃহিণী, যাদের সারাদিন প্রচুর কাজ করতে হয়, তাদের জন্য অসুবিধাজনক। স্বাস্থ্যসচেতন ও দীন পালনে সচেতন অধিক সম্ভান-আকাঙ্ক্ষী দম্পতি ছাড়া, আমার মনে হয়, ৯০% দম্পতি, যারা ২-এর বেশি সম্ভান চান না, ক্যারিয়ার-সচেতন দম্পতির সিঁজারই পছন্দ করেন। সুতরাং ঢালাওভাবে একতরফা ডাক্তারদের দায়ী করা ঠিক হবে না।

তবে কিছু ক্ষেত্রে সিঁজার আবশ্যক হয়ে যায়। জেনে রাখুন :

- ৩ সময়ের আগেই বাচ্চার পানি বেরিয়ে গেলে।
- ৩ বাচ্চার পজিশন উল্টো থাকলে।
- ৩ রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকলে।
- ৩ গলায় নাড়ি পৌঁচিয়ে গেলে।
- ৩ অনেকক্ষণ ধরে প্রসব-বেদনা চললে।
- ৩ অধিক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও জরায়ুমুখ না-খুললে।
- ৩ মায়ের গর্ভকালীন জটিলতা বেশি হলে—ডায়বেটিস, প্রিএক্ল্যাম্পশিয়া—এ-সব।
- ৩ মায়ের যে-বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে প্রসবকালীন জটিলতার সম্ভাবনা থাকে : প্রথম বাচ্চা, খাটো মা, মোটা মা, অসুস্থ মা ইত্যাদি।

ডাক্তার(র)হস্য

আগের যুগে নানান কায়দা করে যন্ত্রপাতি দিয়ে ডেলিভারি করানো হতো। বেশি এক্সপার্ট ডাক্তার লাগতো। ইন্সট্রুমেন্টাল ডেলিভারি বলে এটাকে। তাতে যন্ত্রের আঘাতে বাচ্চার ক্ষতি, মায়ের ক্ষতি হবার একটা সম্ভাবনা থাকতো। এখন সিজার এসে অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। সিজারের লাভগুলো কী কী :

- ৩ সহজলভ্য।
- ৩ প্রসবকালীন ও পরবর্তী অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতাগুলো এড়ানো যায় (যাদের জটিলতার রিস্ক আছে)।
- ৩ স্বামী-স্ত্রী মিলনে কেমিস্ট্রি।
- ৩ যে-ডাক্তার দেখছিলেন, তিনি একটি চার্জ পান, অপারেশনের সুযোগ পান।
- ৩ ক্লিনিকওয়ালা ওটি চার্জ পায়।

সব মিলিয়ে সবার জন্যই লাভজনক। সবাই খুশি। তবে যে-অভিযোগগুলো কানে আসে যে, ডাক্তার আসল ডেটের ৭ দিন আগে ডেট বলেছে; তো ঐ ডেটে এসে বাচ্চা হবার লক্ষণ নেই, থাকার কথাও না। মূল ডেট তো আরও ৭ দিন পর। ডাক্তার তখন বলছে, ডেট পার হচ্ছে, লক্ষণ নেই, অতএব সিজার করতে হবে, এমন অনৈতিকভাবে সিজারও যে হচ্ছে না, তা নয়; তবে অধিকাংশ ডাক্তারই একটি মিনিমাম লেভেলের ইথিকস মেইনটেইন করে। যে-কোনো সিজার নিচের যে-কোনো একটি কারণে পড়বেই।

সিজার বেশি হবার কারণগুলো

- ৩ জনপ্রিয়তা, রোগীর চয়েজ।
- ৩ একটা সময় মেয়েরা গর্ভকালে মায়ের বাড়িতে নাইওর থাকতো—ফুল রেস্ট। এখন বাচ্চা পেটে নিয়েই চাকরি-বাকরি-পড়াশোনা করে বেড়ায়। ফলে গর্ভকালীন জটিলতাগুলো এখন বেশি কমন। সুতরাং সিজার বেশি।
- ৩ প্রাইভেট হাসপাতালগুলো তো ব্যবসার সুযোগই খুঁজবে। ব্যবসা করতেই তো নেমেছে।
- ৩ ডাক্তারদের একটা প্রবণতাও আছে—জটিলতা এড়িয়ে রোগীর সন্তোষ হাসিল করার (পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স)। যশ বাড়বে! টাকা আর ক'টাকাই পায়।
- ৩ সব ডাক্তার যে সাধু, তা-ও না। ভালো-মন্দ সব পেশাতেই আছে।
- ৩ এখন, যারা নরমালই করাতে চান, তারা কী করবেন?

কুররাতু আইয়ুন ২

- সব সরকারি হাসপাতাল, উপজেলা কমপ্লেক্স ও কিছু সাবসে-টারে প্রশিক্ষিত নার্স ও মিডওয়াইফ আছে। আমার হাসপাতালে একজন সিস্টার তো লিজেন্ড লেভেলের। খাদিজার পরেরটা, ইন শা আল্লাহ, ওনাকে দিয়ে করাবো। প্রথম বাচ্চা সিজার হলেও সে দ্বিতীয়টা নরমালে করানোয় পারদর্শী—সব কিছু অনুকূলে থাকলে অবশ্য। অনেক সময় নার্স-আয়ারা কিছু দাবি করলেও একটা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, এটাই বা কম কী!
- আমি বাসায় নরমাল করানোর চেয়ে, হসপিটাল সেটআপে নরমাল করানোর পরামর্শ দিই। কোনো জটিলতা দেখা গেলে যেন সিজারও করানো যায়।
- যে-ডাক্তার গর্ভকালে দেখছেন, তাকে জানিয়ে রাখলেন—ম্যাডাম, আমরা খুব আগ্রহী নরমালে। দরকার হলে ক্লিনিককে আমরা সিজারের চার্জই দেবো (বলবেন না আপনাকে দেবো, টেকনিক করে)। আর আপনি নরমালে বেশি করান, এই সুনাম শুনেই আমরা এসেছি। ‘সুনাম’ হলো আপনার ট্রাম্পকার্ড।
- সিজার একটি অপারেশন। এর আগে আপনার সম্মতি নেওয়া হবে। আপনার জানার পূর্ণ অধিকার আছে যে, কেন আপনাকে সিজার করা হচ্ছে। জেনে নিন। আর আমি বারবার বলি—চিকিৎসা কোনো সেবা না, এটা কেনা-বেচা। আর নবীজি কেনাবেচায় যাচাই করতে বলেছেন। সুন্নাহ না-মানলে তো নিজেকে ঠকা-ঠকা মনে হবেই। ডাক্তারের কথা পছন্দ না-হলে আরেক ডাক্তারের কাছে যান, এখানেই চিকিৎসা নিতে কেউ তো বাধ্য করছে না।

আমার পয়েন্ট হলো, সিজারও একটি তাকদির। তাকদিরকে দোষারোপ করার কিছু নেই। দ্বীনদার লোকেরা তো আরও দোষারোপ করবে না। তবে প্রতারণা না-হবার এবং সর্বোচ্চ সেবা পাবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। আর যা ঘটে যাবে, তার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

২. টেস্ট

প্রথমে জানতে হবে, টেস্ট কেন দেওয়া হয়। রোগীর কমপ্লেন, খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জেনে নেওয়া সম্পূরক প্রশ্ন (symptoms) এবং শারীরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত লক্ষণ (signs) থেকে ডাক্তার একটি রোগ আপাত নির্ণয় করে ফেলেন; এটাকে বলে Provisional Diagnosis। আর কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য শো করে, এমন আরও দু-তিনটে

ডাক্তার(র)হস্য

অসুখকে মাথায় রাখেন; এগুলোকে বলে Differential diagnosis। এবার, যেটি আমি ভেবেছি, সেটিই যে হয়েছে, অন্য D/D-গুলো যে নিশ্চিত হয়নি (exclude the d/d), সেটি কনফার্ম করার জন্য টেস্ট দেওয়া হয়। সুতরাং টেস্ট আপনার ভালোর জন্যই দরকার।

একটা ধারণা রোগীমহলে এমন :—কিছু ধরা পড়ে নাই, রিপোর্ট নরমাল; তো টেস্ট দিলো ক্যান! নিশ্চয় টেস্টটা দরকার ছিলো না, হুদাই দিসে। কমিশনের ধান্ধায়। আসলে ব্যাপারটা হলো, রিপোর্ট নরমাল আসা মানে ডাক্তারের মনের ডায়গনোসিসটাই কারেক্ট। আর যে-তিন-চারটি সাইড-টিস্তা ডাক্তার করেছিলো, সেগুলো আপনার হয়নি। এবার ডাক্তার মন খুলে আপনার চিকিৎসা করবে। তা হলে, রিপোর্ট নরমাল আসা মানে শালার ডাক্তার টাকা খায়, ব্যাপারটা এমন না; বরং শালার ডাক্তার ভালোই রোগ ধরেছে, ব্যাপারটা এমন।

তবে কমিশনের জন্য টেস্ট দেয়, এমন ডাক্তারও আছে; মেই, তা না। ডায়গনোস্টিক-ডাক্তার মিথোজীবিতা—আগেই বলেছি। তবে আমি দেখেছি, অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দিতে গেলে বাধোবাধো ঠেকে।

তবে ৫০ বছর বয়স পার হয়ে গেলে আমরা কিছু এক্সট্রা টেস্ট করাই, যেটি রোগের সাথে অপ্রাসঙ্গিক হলেও ওষুধের সাথে প্রাসঙ্গিক। গিরাব্যথার রোগী, ডায়বেটিস আছে, প্রেসার বেশি। প্রেসার বেশির পেছনে কিডনি সমস্যা থাকতে পারে, যেহেতু ডায়বেটিস আছে (ডায়বেটিস কন্ট্রোল না-থাকলে কিডনি ড্যামেজ হয়)। আবার দীর্ঘ দিন গিরার জন্য পেইনকিলার দিলে ড্যামেজ কিডনি আরও ড্যামেজ হবে। তাই আপনার কাছে মনে হতে পারে আমি এক্সট্রা টেস্ট দিয়ে টাকা খাচ্ছি; কিন্তু তারপরও, হাঁটুব্যথার ৫০+ রোগীকে আমি কিডনি পরীক্ষা দেবো, ডায়বেটিস দেবো, একটা এক্সরেও করাবো। কারণ, একটি অসুখে যে-ওষুধগুলো দেবো, সেগুলোর সাইড-ইফেক্ট নেবার মতো ক্ষমতা অন্য অঙ্গগুলোর আছে কি না, আমাদের দেখতে হবে। তাই টেস্টের প্রাসঙ্গিকতা শুধু রোগের সাথেই না, কী কী ওষুধ আমি দেবো, তার সাথেও। আর ৫০+ একজন ডায়বেটিক প্রেসারের রোগী যে-রোগ নিয়েই আসুক, তাকে আমি চোখ বুজে যে-পরীক্ষাগুলো দেবো :

- ৬ ব্লাড কাউন্ট
- ৬ ক্রিয়েটিনিন
- ৬ ইসিজি
- ৬ শুগার

কুররাতু আইয়ুন ২

এরপর তার রোগ-সংক্রান্ত পরীক্ষা কী দরকার, সেগুলো দেবো। বোঝাতে পেরেছি বোধ হয়। এই ৪টি টেস্ট মূল রোগের সাপেক্ষে এক্সট্রা মনে হলেও, পুরো চিকিৎসার জন্য এক্সট্রা না।

টেস্টের প্রতি আমাদের এই এলার্জির কারণ স্বাস্থ্যশিক্ষা না-থাকা। প্রতি ছয় মাসে একটি ইসিজি, একটি শুগার, একটি কিডনি পরীক্ষা, লিপিড, একটি ব্লাড কাউন্ট, একটি ইউরিন—এগুলো নিজের গরজেই করা উচিত। আমরা অসুখ হলে টেস্ট করাই, অথচ অসুখের আগে টেস্ট করানোর কালচার থাকলে অল্পতেই কত রোগ ধরা সম্ভব। উন্নত দেশে, যেখানে হেলথ ইনসিওরেন্স আছে, ইনসিওরেন্সই করায় এই রুটিন টেস্ট, যাতে রোগ জটিল হবার আগেই চিকিৎছে শুরু হয়, বীমাওয়ালাদের টাকা কম যায়। আমরা নিজ গরজে তো করিইনা, ডাক্তারে দিলে তাও নয় না। টেস্টের ব্যাপারে এত রিজিড হবার কিছু আসলে নেই বলে আমার মনে হয়।

সবার সব টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি থাকে না, সে-ক্ষেত্রে কী করবেন! ঐ যে, ডাক্তারকে পক্ষে আনতে হবে। ‘স্যার, যদিও জানি, সব টেস্টগুলোই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি না-হলে আপনি দিতেন না; কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে, আমার সবগুলো করানোর মতো অবস্থা নেই। এগুলোর মধ্যেই বেশি জরুরিগুলো আমি এখন করাবো, বাকিগুলো পরে। কোনগুলো এই মুহূর্তে প্রেসক্রিপশনের জন্য লাগবেই, একটু বলে দিন। না হলে দেখা যাবে, বেশি জরুরিটা করাতে পারিনি, কম জরুরিটা করানো হয়ে গেছে। একটু যদি সাহায্য করতেন!’ কথায় ভেজে না, এমন চিঁড়ে আছে না কি! এভাবে না হলে, ওভাবে। ভিজবেই। না-ভিজলে নাই, হুগনা চিড়া খাইলাম না।

আর সব সময় মনে রাখবেন। আপনি পুঁজিবাদের যুগে আছেন। সবাই আপনাকে নিয়েই ব্যবসাই করছে। এরই মাঝে যতটুকু ভালো আমরা থাকতে পারি। এরই মাঝে একটু ভালো ব্যবহার, একটু সদাচার আমি মনে করি একেবারে কম পাওয়া না। নিজের কমিউনিটি বলে বলছি, তা নয়; আসলেই কিন্তু, হিসেব করে দেখুন।

আরেকটি জিনিস রোগীর মনে খুঁতখুঁত করে : একসপ্তাহ আগেই টেস্ট করালাম, ডাক্তার আবার করতে দিলো, নিশ্চয়ই কমিশনের লোভে। একটু স্বাস্থ্যশিক্ষা থাকলেই যে-কষ্টটা মনে তৈরি হয়েছে, তা হতো না। আমাদের রক্তে কিছু কেমিক্যাল আছে; এগুলোর ঘনত্ব সব সময় ওঠানামা করে : রক্তের

ডাক্তার(র)হস্য

হিমোগ্লোবিন, শুগার, নানান ধরনের লবণ (ইলেক্ট্রোলাইট), ক্যালসিয়াম, হরমোন, বর্জ্য (ক্রিয়েটিনিন)—এগুলোর লেভেল ৭ দিন আগে আর ৭ দিন পরে একই থাকে না; সুতরাং আপনার আগের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও আবার করতে বলা মানে সব সময় এই না যে, টাকা খাওয়ার জন্য দিসে। বরং ৩/৭/১০ দিন পর লেটেস্ট অবস্থাটা কী, সেটা জানাটা দরকার। এবং রোগীর সমস্যা হলো, রোগী দ্রুত ডাক্তার সুইচ করে। ঢাকার ডাক্তার তো অবশ্যই মফস্বলের/জেলার রিপোর্টের ফল গ্রহণ করবে না। বহু ডায়গনোস্টিক সেন্টার টেস্ট না-করেই/মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ দিয়ে টেস্ট করে রিপোর্ট দিয়ে দেয়; তাই জেলা থেকে সব করে এসেছি, ঢাকার ডাক্তার আবার দিলো কেন, আমার টাকাগুলো খেয়ে দিলো—এ-সব ভেবে কষ্ট নেবেন না।

আবার কিছু ওষুধ শুরুর আগে একটা প্রস্রাব টেস্ট করলাম। ৭ দিন ওষুধ খেয়ে আবার যখন গেলো, আবার প্রস্রাব টেস্ট দিলো। টাকা খাওয়ার জন্য না, ৭দিন ওষুধ খেয়ে এখন ইনফেকশনের কী অবস্থা, দেখার জন্য দিয়েছে। তেমনি প্লাস্টার সরানোর পর আরেকটা এক্সরে করে দেখার নিয়ম।

৩. রেফার

আমার পোস্টিং একটি উপজেলার ৫০ বেড হাসপাতালে। এখানে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, অর্থোপেডিক, শিশু কনসাল্টেন্টের পোস্ট আছে, নিয়োগ নেই। ফাঁকা পড়ে আছে। ডাক্তাররা টাকা চলে গেছে, এমন না, নিয়োগই নেই! টাকা যদি যেতো, এক পোস্ট থেকে তো আর একাধিক লোক সরকারি বেতন উঠাতে পারবে না। তার মানে টাকা যায়নি, পোস্টই খালি। মোট ৩৩ জন ডাক্তার থাকার কথা, ৮ জন আছি। তাই নিয়েই প্রতি দিন প্রায় ৬০০-৭০০ লোক সেবা পাচ্ছে। এখানে নরমাল ডেলিভারি হয় দিনে প্রায় দশের বেশি। যাক, এগুলো শুনিye লাভ নেই। কয়েক ধরনের রোগী আমরা রেফার করি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে।

হাট এটাক সন্দেহ হলো।

ব্রেন স্ট্রোক সন্দেহ হলো।

বড়সড় ফ্র্যাকচার হলো।

দু-তিন দিন চিকিৎসার পরও উন্নতি না হলো।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একজন এক মিটিংয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো, আমি তখন হাসপাতালের চার্জ ছিলাম, ভদ্রলোক আমাকে বললেন, ‘আপনারা সামান্য হাট এটাক, সামান্য স্ট্রোকের রোগী রেফার করেন, রোগী ডিশোল্ডারিং করেন’;

কুররাতু আইয়ুন ২

আরেকজন ফুট কাটলেন, ‘একজন লোকের মাথায় একটা ইট পড়লে এটা তার কাছে তেমন বড় ব্যাপার না, কিন্তু আপনারা কুপ্তিয়া রেফার করলে এটা তার জন্য অনেক বার্ডেন’; আরেকজন জনপ্রতিনিধি বললেন, ‘আপনারা হাসপাতালে রোগী গেলেই সিজার করেন, গেলেই পেট কাটেন’; অথচ আমার হাসপাতালে পরীক্ষামূলক সিজার চালু হয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেছে রোগীর অতিরিক্ত চাপে। মাথায় একটা ইট পড়া মানে কী ধরনের ইনজুরি, হাট এটাক-স্ট্রোক কী ধরনের অসুখ, এই মোটা জ্ঞান যাদের নেই, তারা জনপ্রতিনিধি। তা হলে সেই জনগণ কেমন?

তো আমার এ-কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, ‘রেফার’ মানে ডিশোল্ডারিং না। ‘রেফার’ নিজেই একটি চিকিৎসা। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় রেফার করতে পারা—এটিও একজন ডাক্তারের দক্ষতা, যে, সে রোগ ধরতে দেরি করেনি। যদি আমি রেফার করতে ব্যর্থ হই, রোগীপক্ষ চাইলে আমার বিরুদ্ধে ‘অবহেলা’র মামলা করতে পারেন। সুতরাং রেফার মানে দায় এড়ানো বা চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি না।

৪. প্রসিডিউর

সে-দিন কোনো এক ভাইয়ের পোস্ট দেখলাম, ডাক্তার রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে। চার্জ নিয়েছে ২০০০ টাকা। একটি ইনজেকশন শিরায় দেয়, আরেকটি দেয় গোশাতে, ডায়বেটিসের ইনজেকশন দেয় চর্বিতে—চামড়ার নিচে; এই তিনটি কমনলি আমরা দেখি। নার্সরা-ওয়ার্ডবয়রা দেয়, প্রাইভেটে ১০০ টাকা চার্জ মনে হয়। আরেকটি ইনজেকশন আছে, দিতে হয় জয়েন্ট ক্যাপসুলে। একটুতে একটু হলে লিগামেন্ট বা নার্ভ বা নরম অস্থির বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সব ডাক্তারও দিতে পারে না, এক্সপার্ট ডাক্তার দেয়। যত এক্সপার্ট সেবা, তত সূক্ষ্ম কাজ, তত বিল—এটা খুব স্বাভাবিক। সব ইনজেকশন এক রকম না, এত হা-হুতাশের কিছু নেই। কেমোথেরাপি যখন দেয়, ক্যান্সারের ডাক্তার নিজে স্যালাইন চালান; চার্জ প্রতি সাইকেল ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা মনে হয়। আপনি নার্সদের স্যালাইন চালাতে দেখেছেন; আপনার মনে হবে—৪-৫ টা স্যালাইন চালিয়ে এত বিল নিলো কসাইতে। কিন্তু কেমোর স্যালাইনে ওষুধ মেশাতে হয়—ওজনের সাথে ক্যালকুলেশন করে; একটু ভুলে রোগীর বড় ক্ষতি হতে পারে; সব ডাক্তার পারেও না। ক্যান্সার-স্পেশালিস্ট ডাক্তার নিজ হাতে ওষুধ মিশিয়ে মেপে-মেপে দেন।

ডাক্তার(র)হস্য

স্পেশাল সার্ভিস স্পেশাল চার্জ—খুব স্বাভাবিক বিষয়। প্লাস্টার, আমার ওয়ার্ডবয় রিয়াজ চাচা করলে, ১০০-২০০ টাকা; আমি করলে ৫০০, আর অর্থোসার্জন করলে ১০০০-২০০০ টাকা— খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয়। তিনটির মানে সামান্য পার্থক্য তো থাকবেই, বেশিও থাকতে পারে। সিস্টাররা আপনার হাতে ক্যানুলা করবে ১০০ টাকা চার্জে। আর যাদের হাতে করা গেলো না কোনো কারণে বা মুমূর্ষু রোগীর ক্যানুলা আইসিইউতে ডা. Mehedi Hasan ভাই গলায় করবেন ১০০০৫ টাকায়। কাজের মান-জটিলতা-রিস্ক-পারদর্শিতার উপর চার্জ বাড়বে— এতে মাইন্ড খাওয়ার কিছু নেই। পেশেন্টের স্যাটিসফেকশন কম হবার একটি বড় কারণ স্বাস্থ্যশিক্ষা না-থাকা, বা কী ধরনের সেবা দিয়ে তার কাছে থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেটি পরিষ্কার না-থাকা।

৫. অপারেশন

অধিকাংশ সার্জনকে আমি দেখেছি, রোগীকে ছবি ঐঁকে বুঝিয়ে দিতে যে, আপনার কী অপারেশন দরকার। এবং সার্জন কত নেবেন, সেটিও জানিয়ে দেন। চালাক রোগী আরও এক-দুই জায়গায় রেট জেনে নেন। আপনারাও জেনে নেবেন, যাচাইয়ের সুনাহ হিসেবে। অপারেশনের চার্জও ডাক্তারের খ্যাতি-ডিগ্রি-পারদর্শিতার উপর নির্ভর করবে। আর যত বড় অপারেশন, যত সূক্ষ্মতা ও সাবধানতার দরকার, তত চার্জ বাড়বে। এমনি পেট কেটে গলব্লাডার ফেলে দিলে চার্জ কম; আর জাস্ট ৩টি ফুটো করে রোবোটিক স্টাইলে (ল্যাপারোস্কোপি) ফেললে চার্জ বেশি; কারণ, সূক্ষ্ম কাজ। ডাক্তারকে বিদেশে গিয়ে পয়সা খচা করে শিখে আসতে হয়েছে। তবে যেটি আপনাকে সন্তুষ্টির জন্য জানতে হবে, একটি অপারেশন-চার্জে যা যা থাকে :

- ৷ ডাক্তারের চার্জ।
- ৷ একজন এসিস্ট্যান্ট লাগে, সেও ডাক্তার, তার চার্জ।
- ৷ অঙ্কান করে যে, সেই ডাক্তারের চার্জ।
- ৷ একজন থাকে ওটিবয়, এগিয়ে টেগিয়ে দেয়, পরিষ্কার করে, বেড থেকে আনে, আবার নিয়ে যায়, তার চার্জ।
- ৷ যে-ক্লিনিকের ওটিতে অপারেশন হলো, যাদের মেশিন ব্যবহার করে অপারেশন হলো, তার চার্জ।
- ৷ অপারেশনে ব্যবহৃত অঙ্কানের ইনজেকশন, স্যালাইন, ক্যানুলা, অক্সিজেন, সেলাইয়ের দামি সুতা (কাপড়ের সুতা না), এগুলার চার্জ।

কুররাতু আইয়ুন ২

২০,০০০ টাকা দিয়ে অপারেশন করিয়েছি, শুনলে মনে হয়, ডাক্তার কসাইটাই ১০ মিনিটে এতগুলান টাকা নিয়ে গেলো। ব্যাপারটা আসলে ভিন্ন। আর আমাদের একটা মজার সাইকোলজি হলো, হাসপাতালের সবাই ডাক্তার। সে-দিন আমার হাসপাতালে একজন এসে খুঁজছে—দবির ডাক্তার কোথায় বসে? খুঁজে তো পাই না। পরে বুঝলাম, হাসপাতালের স্টোরকিপার দবির সাহেবকে খুঁজছে। একটি হাসপাতালে সবাই ডাক্তার না, ম্যানেজার-ক্যাশিয়ার-ক্লিনার-বয়-নার্স-গার্ডও রয়েছে। ‘হাসপাতালে ৩ দিন ছিলাম, ওদের আচরণ এত খারাপ’—বাক্যটি শুনে পয়লা দফায় ডাক্তারদের ব্যবহার মনে আসছে, তাই না! এটিও সন্তোষ কম হবার একটি কারণ।

৫. অন্যান্য

রিং বসানো প্রভৃতির বেলায় কিছু কথা কানে আসে, যেমন—ডাক্তাররা নিয়মানের রিং দেয়, টাকা নেয় ভালোটোর, মাঝখানে পেপারিংও হয়েছিলো। কিছু জিনিস তাকদির; আমাদের তো ঐ পর্যন্ত যাচাইয়েরও সামর্থ্য নেই, দিয়ে দিলে বুঝতেও পারবো না। ভারতে গিয়েও ভালোটা দেখিয়ে খারাপটাই যে দেয়নি, কী গ্যারান্টি আছে! আপনি বুঝতেই পারবেন না। আমাদের এক স্যার সব সময় নাপা দিতেন ২+২+২। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ‘প্যারাসিটামল ৫০০ মিগ্রা লেখা থাকলেও ৫০০ থাকে না। এ-জন্য ৫০০-এর যে-কাজ করার কথা, তা একটাতে হয় না; এ-জন্য দুটো করে দিই।’ ভয়ে শিউরে উঠলাম! একই কাজ যদি এন্টিবায়োটিকের বেলায় হয়ে থাকে, তা হলে তো ভয়ংকর। ৫০০ মিগ্রা লাগবে জীবাণু মারতে; যদি ৩৫০ থাকে, তা হলে ওরা মরবে না, আরও শক্তিশালী হবে! প্রতি দিন আরও শক্তিশালী হবে, একটা সময় ওদের মারার মতো আর কোনো ওষুধ মানুষের হাতে থাকবে না! অলরেডি সেই জীবাণু তৈরি হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ আমাদের কোনো সফটওয়ার দিয়ে দিয়েছে দেখেছেন। লাভের নেশা, পুঁজির নেশা, বস্তুর নেশা আমাদের সভ্যতাকে কোথায় ঠেলে দিয়েছে দেখুন!

৬. ওষুধ কোম্পানি

অনেক সময় কথা ওঠে, ডাক্তাররা অমুক কোম্পানির ওষুধ লেখে। টপ টেন কোম্পানির ওষুধ কাছাকাছি মানের। মান দেখার জন্য সরকারের ওষুধ-প্রশাসন অধিদপ্তর আছে। আর এরপর দশটি কোম্পানির অধিকাংশ ওষুধই পপুলারসহ টপ টেন থেকে বানিয়ে মার্কেটে সাপ্লাই করে, নিজস্ব প্লান্ট না-থাকায়। আমার

ডাক্তার(র)হস্য

মতে, সরকার যাদেরকে লাইসেন্স দিয়েছে, তাদের ওষুধ লেখায় কোনো সমস্যা নেই; বরং প্রথিতযশা কোম্পানি, যারা বিদেশে রপ্তানি করে, তাদের ব্যাপারে এই খবরও আমার কাছে এসেছে, তারা একই ওষুধ দু রকম ভাঙ্গন বের করে—একটি বিদেশে যায়, একটি দেশের মার্কেটে আসে। আর খ্যাতির মোড়কে মান কমিয়ে ফেলার লক্ষণও পাওয়া যায়। এ-জন্য পুঁজিবাদের এই লাগামহীন মুনাফার যুগে ব্র্যান্ডও গ্যারান্টি না—কোনো কিছুই গ্যারান্টি না। এবং আপনার-আমার কিছু করারও নেই। এ-জন্য তাকদিরকে মেনে নিয়ে এবং বস্তুর অতীত আল্লাহর কুদরতের দিকে সম্পূর্ণ রুজু হয়ে ওষুধ খাবেন। শেফা দেনেওয়ালা একমাত্র লা শরিক আল্লাহ। বস্তুবাদ-পুঁজিবাদের এই আশ্রাসনে বস্তুর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে অস্বীকার করে যতক্ষণ না আপনি আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে মেনে নিচ্ছেন, ততক্ষণ সবাই আপনাকে নিয়ে ব্যবসা করবে এবং আপনি ব্যবসায়িত হবেন। শেষের বাক্যটি বুঝতে আরেকটি আলাদা অধ্যায় লাগবে।

আর আমি নিজেকে দিয়ে যেটি বুঝি, রোগী দেখতে বসলে এত কিছু চিন্তা করে লেখা হয় না, কলমের আগায় যেটি আসে, সেটিই। সাধারণত যে-কোম্পানি যত রিসেন্ট চেহারা দেখিয়ে যায়, তারটা কলমের আগায় চলে আসে। আর চেষ্টা করি ৫টি ওষুধ ৫টি টপ টেন কোম্পানির লেখার, একই কোম্পানির সব ওষুধ লিখি না। আর একটি লিস্ট রাখি, ধরুন নাপা; কোন কোম্পানির নাপার দাম অন্যান্য কোম্পানির নাপার চেয়ে একটু কম; গরিব রোগীর যদি ম্যালাদিন খাওয়া লাগে, ঐটা দিই। দামি নাপার চেয়ে কম দামি নাপার মান তো কম হবেই, তবে উনিশ-বিশ, নিজে টেস্ট করে দেখেছিও। তবে বেশি দিন খাওয়া লাগলে এই কাজটি করি।

আপনারা একটি কাজ করতে পারেন। ধরুন, আপনার স্কয়ার পছন্দ, আমার পছন্দ না। আপনি দোকানে গিয়ে বলবেন, ডাক্তার যা লিখেছে, লিখেছে। আপনি আমাকে স্কয়ারেরগুলো দিন। ব্যস, হয়ে গেলো। কীভাবে বুঝবেন? ধরুন, আমি লিখলাম, বেক্সিমকোর নাপ; নাপার নিচে ছোট করে লেখা আছে—‘প্যারাসিটামল বিপি ৫০০ মিগ্রা’; এটি হলো ওষুধের জাতিগত নাম; আর নাপা হলো কোম্পানি নাম। এখন আপনি যখন বলবেন, ‘এই প্যারাসিটামল ৫০০ আমাকে স্কয়ারেরটা দিন, দোকানি তখন ‘এইস’ বের করে দিলো—হয়ে গেলো। তবে কোন কোম্পানির কোন ড্রাগটা ভালো বলে অন্য রোগীরা ফিডব্যাক দিয়েছে, এটা ডাক্তারের এলেমে

কুররাতু আইয়ুন ২

আছে—সব কোম্পানির A ড্রাগের মাঝে অমুক কোম্পানির Aটা বেশি ভালো; আবার তার B-টার চেয়ে তমুক কোম্পানির B-টা একটু দ্রুত কাজ করে। দিনশেষে ভালো তো আর ওষুধে করে না, ভালো করেন আল্লাহ। ঐ সুন্নাহ হিসেবে একটা খেলেই হয়।

কোম্পানির স্যাম্পল নিয়েও কথা আছে। স্যাম্পল কোম্পানি দেয় পরিচিতির জন্য। আমাদের এই প্রোডাক্ট আছে, আপনি চাইলে নিজে খেয়ে বা কাউকে খাইয়ে যাচাই করতে পারেন। এ-রকম একটি উদ্দেশ্যে স্যাম্পল দেওয়া হয়। তবে জুনিয়র লেভেলের হাতেগোনা কিছু ডাক্তার স্যাম্পল চেয়ে নেয়—এটা আত্মমর্যাদার খেলাফ। ওষুধ কোম্পানির গিফটের উদ্দেশ্যেও তেমনই। গিফটের গায়ে প্রোডাক্টের নাম লেখা থাকে, আর আমার কথা যেন আপনার মনে থাকে। কলমের গায়ে, পেপারওয়ার্পের গায়ে, ঘড়ির গায়ে নামটা চোখে পড়ে-পড়ে যেন অন্তঃস্থ হয়ে যায়। আমি এগুলোকে নির্দোষই মনে করি; এগুলোর কারণে ডাক্তার বিকিয়ে যায় না বা বাধ্য হয়ে যায় না। বিকিয়ে যায় চেয়ে নিলে এবং কোম্পানি থেকে অনারিয়াম নিলে। আত্মসম্মানবোধহীন হয় মানুষ নিজে, তার পেশার দায় নেই।

৭. ভারতমুখিতা

পার্সবতী দেশ ভারতমুখী হচ্ছেন অনেকেই। ‘মেডিকেল ট্যুরিজম’ ভারতের বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি। ভারত খুব প্রবলভাবে দেশপ্রেম প্রমোট করে। খেলাটেলা বা টিভি এডভার্টাইজগুলোতে বেশ বোঝা যায়। ভারতমাতার সন্তানরা তাই দেশের টানে দেশের জন্য অনেক কিছু করে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় সেটেলড হবার পর বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ডাক্তার নিজ দেশের বড়-বড় হাসপাতালগুলোতে চলে আসেন কিংবা নিজে হাসপাতাল দেন এবং ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচারণা চালান যে, আমেরিকার অমুক হাসপাতালের তমুক ডাক্তার ইন্ডিয়াতে অপারেশন করছেন ৫০% খরচে। স্বাভাবিকভাবেই অপারেশন আমেরিকায় করালে যে খরচ, ইন্ডিয়াতে করালে বহু গুণ কম খরচ; অপারেশন করবেনও আমেরিকার ডাক্তার, তার মানে ইন্ডিয়ায় বসে আমেরিকার মান, তাও অর্ধেক খরচে। সারা বছর শ্রোতের মতো ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা আসে ইন্ডিয়ায় চিকিৎসা নিতে। সেই ট্যুরিজম ব্যবসার আওতায় বাংলাদেশও পড়ে গেছে। খুব সম্ভবত মেডিকেল ট্যুরিজম সেক্টরের কারণে তাদেরকে পেশেন্ট ডিলিং, স্পেশালি ফরেন পেশেন্ট ডিলিংয়ের ট্রেনিংও দেওয়া হয়। খরচ কিন্তু কম না। ভিজিট ১৫০০-৩০০০ রুপি অবধি হয়,

ডাক্তার(র)হস্য

কিন্তু রোগী সন্তুষ্ট। আর আমার ধারণা, লোকাল রোগীদের সাথে তাদের আচরণ ফরেনদের সাথে যত সুন্দর, অতটা না। স্বাভাবিক, আমাদের মতোই। যে-কারণে ভারতে প্রায়ই ডাক্তার মার খায়, ইউটিউবে ভিডিও পাবেন। এ-জন্য ইনসানফের কথা হলো, বাংলাদেশে যেমন ভালোমন্দ মেশানো, ভারতেও ভালোমন্দ মেশানো।

ওদের ব্রান্ডিং, বিজনেস পলিসি, দেশপ্রেমের বাইরে কিছু ফ্যাক্ট আছে :

- ৷ আমাদের অত্যধিক বিদেশপ্রীতি।
- ৷ কিছু ইলেক্টিভ কেসের চিকিৎসায় ভারতের কিছু বেসরকারি ও ট্রাস্টি হাসপাতাল বিশ্বসেরাদের মধ্যে আছে—যদিও জরুরি চিকিৎসা বাংলাদেশের মতোই।
- ৷ ভারতে যে-পরিমাণ চিকিৎসাক্ষেত্রে গবেষণা হয়, বাংলাদেশে তার দশ হাজার ভাগের এক ভাগও হয় না। যতই প্রোডাক্ট ভালো বানাক, আমরা চাই মেড ইন জাপান কিনতে; কারণ, শুরু হয়েছিলো জাপানে। আমরা যতই ভালো চিকিৎসা দিই না কেন, আমরা যত দিন নতুন কিছু শুরু না-করতে পারবো, গবেষণায় আগাতে না-পারবো, ভারতের পেছনেই থাকতে হবে। মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই। হাজার পুরোনো চিকিৎসা না-দিয়ে একটি নতুন চিকিৎসা আবিষ্কার করলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস বাড়বে।

তবে আমি মনে করি, ডাক্তারদের আলাদা করে পেশেন্ট ডিলিং—মানে, How to satisfy a patient, ব্যাপারটা শেখা দরকার, শেখার আছে। আমি আনাড়ি-হাতে কিছু হয়তো শেষে আলোচনা করবো, নবীন ডাক্তারদের কাজে আসবে।

৮. বাংলাদেশের ডাক্তারদের মান

বাংলাদেশের এভারেজ ডাক্তারদের মান কেমন? তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। মহাখালী BMRC-তে গেলাম। আমেরিকা থেকে অর্থোপেডিক (হাড্ডিগুড্ডি) রেসিডেন্টদের (পড়া শেষের দিকে) একটি টিম এসেছে, প্রায় ২০-২৫ জনের। তাদের টিম-লিডার আমেরিকান একজন নারী ডাক্তার। কোঅর্ডিনেট করছিলেন এক্স-ডিএমসি একজন স্যার, এখন আমেরিকার কোনো মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর। বিদেশি মানুষের সাথে গল্পগুজব করে, তাদের চিকিৎসা-শিক্ষা কেমন, জেনেটেনে খুব ভালো লাগলো। তো তারা বাংলাদেশে এসেছে ‘কেস’ দেখতে। উন্নত বিশ্বে অনেক রোগই বিরল হয়ে গেছে, তৃতীয় বিশ্বে এগুলো সহজলভ্য; যেমন—যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, এগুলো ওরা এত সহজলভ্য কোথায় পাবে!

কুররাতু আইয়ুন ২

তোমরা আমাদেরকে ‘কেস’ দিবা, আমরা তোমাদেরকে টেকনোলজি দেবো। বাংলাদেশে লিজেন্ড লেভেলের কিছু ডাক্তার আছে। লিজেন্ডের ছাত্র আছে লিজেন্ড, কিন্তু লিজেন্ডদের ছায়ায় জুনিয়র লিজেন্ডরা ফুটে উঠতে পারছেন না। আমার মতে, কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ডাক্তাররা টেকনোলজি বাদ দিয়ে ‘দেখে রোগ চেনা’য় আমেরিকার চেয়ে বেশি পারদর্শী—কারণ, এখানে কেস বেশি, বিচিত্র রোগের সমারোহ। উন্নত দেশে রোগ ধরা-বাঁধা কিছু ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক—এ-রকম। যার জন্য তারা রোগ দেখার জন্য এ-দেশে আসে, বৈচিত্র্য দেখে শেখার জন্য। হ্যাঁ, বিরল রোগ আমাদের ধরা সম্ভব হয় না পর্যাপ্ত টেকনোলজি না-থাকায়। যেমন, একটি উদাহরণ দিই। আমেরিকায় স্বাস্থ্যবীমার নাম তো শুনেছেন। যখন কারও ঝর হয়, সিটি স্ক্যান পর্যন্ত করা হয়! একটি ওষুধ দেবার পেছনে ডাক্তারকে দলিল-প্রমাণ রেখে দিতে হয়। এটি বাংলাদেশে করতে চাইলে হবে না। গরিব লোকের তা হলে ডাক্তাররা মামলার ভয়ে চিকিৎসা দেবে না। আর গরিব রোগীরা অত টেস্ট করতেও পারবে না। যেটি বলতে চাচ্ছি, ব্যাঙের ছাতার মতো মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত আমাদের ডাক্তারদের মান কম্পিট করার মতোই ছিলো। এখন পাশের দেশের মেডিকেল ট্যুরিজমকে সাপোর্ট দেবার জন্যই কি না, কে জানে, নিজের দেশের ডাক্তারদের মানহীন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। নতুন সরকারি মেডিকেলগুলোতেই তো এনাটমি-ফিজিওলজি পড়ানোর টিচার সংকট; তা হলে নতুন বেসরকারিগুলোর কী অবস্থা? তবে এমবিবিএসে আস্তা না-পেলেও এফসিপিএস বা এমডি ডিগ্রিধারীদের উপর চোখ বুজে আস্তা করতে পারেন। এগুলোতে টেকাই খুব কষ্টের; ভালো ছাত্র ছাড়া এফসিপিএস-এমডিতে চান্সই পাবে না, পাশ করা তো আরও কঠিন। হয়তো যথেষ্ট টেকনোলজি নেই বলে, বা রোগীকে ইউরোপ-আমেরিকার ডাক্তারদের মতো রক্ত টেস্ট থেকে নিয়ে সিটি-স্ক্যান, স্বাস্থ্যবীমার কল্যাণে সব রকম চেক-আপ করতে পারে না বলে, জটিল রোগগুলো আগে-আগে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমাদের এফসিপিএস-এমডি-করা ডাক্তারেরা আসলেই যোগ্য।

৯. এত ওষুধ লেখে কেন?

The image shows a handwritten medical prescription slip. The text is written in Bengali script. It includes various medical terms and drug names, some of which are circled or underlined. The handwriting is in Bengali script. The text is organized into columns, with some items written in English and others in Bengali. The overall appearance is that of a handwritten medical document.

ছবিটা আপনাদের কাছে খুব বিরক্তির কারণ। ডাক্তার এত-এত ওষুধ লেখে কেন! তথ্য না-থাকা বা চিকিৎসাপ্রক্রিয়া সম্পর্কে একদম ধারণা না-থাকার কারণে স্যাটিসফেকশন কম হয়। আপনি যদি ডাক্তারের কাছে জেনে নেন, কেন আপনাকে এত ওষুধ খেতে হবে বা অন্য কোনো উপায় আছে কি না এত ওষুধ না-খেয়ে, তা হলে এই প্রেসক্রিপশনই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। এগুলো আপনাকে ডাক্তার থেকে জেনে নিতে হবে। ডাক্তার আপনার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য আপনাকে দিতে একরকম বাধ্য।

নিচের কথাগুলো যদি জানা থাকতো, তা হলে এই প্রেসক্রিপশনটা আপনার কাছে মোটেও বিরক্তির হতো না। বক্সের অংশটুকু হলো রোগীর রোগ। সাধারণত ডাক্তার একটি 'ডেলটা' চিহ্ন দিয়ে সংক্ষেপে এই রোগনির্ণয়টা লিখে থাকেন।

কুররাতু আইয়ুন ২

যে-কোনো ডাক্তার এটা বুঝে ফেলবেন। মূল ডাক্তার না-বললেও অন্য যে-কোনো ডাক্তার আপনাকে এটি বুঝিয়ে দিতে পারবে। এখানে যা লেখা আছে, তা হলো— IHD (হাট এটাক জাতীয় সমস্যা), LVF (হাট দুর্বল), Br. Asthma (এজমা), DM (ডায়াবেটিস), Hyperuricemia (বাতজাতীয় ব্যথা, ইউরিক এসিড বেশি), Mild hepatic impairment (লিভারের সমস্যা কিছুটা), Dyslipidaemia (রক্তে চর্বি বেশি), UTI (প্রস্রাবে ইনফেকশন)। রোগীর অসুখ ৮টি। ডাক্তার তাকে দিয়েছে ১৭টি ওষুধ। যদি প্রত্যেক অসুখের একটি করে ওষুধও দেওয়া হয়, প্রতি দিন ৮ ধরনের কমে তাকে ওষুধই লেখা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটি অসুখের জন্য এক ধরনের ওষুধ হয় না। যেমন IHD-এর জন্যই তাকে কমপক্ষে একটি শিরা প্রসারণকারী (Trocer, প্রেসক্রিপশনে দেখুন), রক্ত তরলকারী (Clout ৭৫), প্রেসার কমানো (Angivas) ওষুধ খেতে হবে আজীবন। এজমার জন্য তাকে একটি স্টেরয়েড (Xelcort), একটি এন্টিহিস্টামিন (Montelukast) খেতেই হবে। স্টেরয়েড খাচ্ছে আর এতগুলো ওষুধে বেশি গ্যাস ফর্ম করবে, তাই গ্যাসের ওষুধ (Pantogen) ও আরেকটি সিরাপ (Megacil) দেওয়া হয়েছে। গিরার ব্যথার জন্য একটি পেইন কিলার (sonap), আর ইউরিক এসিড কমানোর ওষুধ লাগবে (Febus)। রক্তের তেল কমানোর ওষুধ (Rosutor) আর ডায়াবেটিসের ওষুধ (Linatab) লাগবে। প্রস্রাব ইনফেকশনের জন্য একটি এন্টিবায়োটিক লাগবে (Moxigen ৪০০)। এ-সব রোগীর ঘুম হয় না, তাই (Epiclone) ঘুমের ওষুধ। রুচিবর্ধক ওষুধ (Domin)। LVF-এর জন্য তাকে অতিরিক্ত আরেকটি প্রেসারের ওষুধ খেতে হবে, কারণ, হাটের উপর যেন প্রেসার না-পড়ে (Diretic DS)।

আমি হলেও এটাই করতাম। কিছু করার নেই—আপনার পছন্দ হোক বা না-হোক, রোগী ধনী হোক বা গরিব। গরিব হলে কিনে খেতে পারবে না—তারপরও কিছু করার নেই, এটাই আমরা শিখেছি। আমার চৌদ্দ গুপ্তি এলেও এর থেকে আপনাকে ওষুধ কমাতে পারবে না। এ-জন্য হাসি-তামাশা তো করাই যায়। আমার বাপকে এই প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিলে কিন্তু আমার খারাপ লাগতো না, কারণ, আমি জানি। যার অসুখই এতগুলো, তার তো ওষুধ এতগুলো লাগবেই। কিন্তু যে চিকিৎসা-প্রক্রিয়াটা জানে না, সে অসন্তুষ্ট হবে। এ-জন্য চিকিৎসা জানা দরকার নেই, কিন্তু চিকিৎসা-প্রক্রিয়াটা জেনে নেবেন। এটি অবশ্যই স্বাস্থ্যশিক্ষার অংশ।

ডাক্তার(র)হস্য

আর নবীন ডাক্তারদের উদ্দেশে—মুখ বন্ধ রেখে না-লিখে, জবান চালান আর লেখেন। কোন ওষুধ কেন দিলেন, এটা বলার জন্য আলাদা সময় লাগে না। লিখতে থাকুন আর মুখে ধারাভাষ্য দিতে থাকুন। রোগী বুঝুক, কোন ওষুধ কেন দিচ্ছেন। আমরা সার্ভিস কিন্তু কম দিই না। কিন্তু পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি না। পেশেন্টকে বোঝাতে পারি না যে, আমি আপনার জন্য করছি।

সম্পৃষ্টির জন্য বেশি কিছু লাগে না। প্রেসক্রিপশনটা দেখতে ফানি-ফানি লাগলেও, আসলে ব্যাপারটা ফানি না। ডাক্তারের ও রোগী উভয়ের অসহায়ত্ব লেখা আছে এখানে। আল্লাহর ফয়সালার কাছে ডাক্তার-রোগী উভয়েই কত অসহায়। আলহামদুলিল্লাহ, এত নাফরমানির পরও আল্লাহ এখনও সুস্থ রেখেছেন।

আমাদের কারিকুলামে স্বাস্থ্যশিক্ষার দৌড় বলতে স্যানিটারি টয়লেট আর সাবান-ছাই দিয়ে হাত ধোয়া অবধি। কিন্তু হাট-এটাক বা স্ট্রোকের লক্ষণগুলো, প্রেসার মাপা, গর্ভকালীন করণীয়-বর্জনীয়; নিদেনপক্ষে কোন রোগটা গুরুতর, আর কোনটা অসুখই না—এ-ধরনের বিষয়গুলো সায়েন্স-আর্টস-কমার্স নির্বিশেষে কিংবা ক্লাস এইটের আগে শেখা দরকার কি না বলেন তো! চল্লিশ বছর বয়সের পর জীবনযাত্রা কেমন হবে, ভূমি-বিষয়ক হিসেবনিকেশগুলো, এগুলো লাগে না এমন কোনো মানুষ আছে! আমার মনে হয়, আমাদের জীবনে যে-জিনিসগুলো দরকার হবে, সেগুলোই আমাদের শেখানো হয় না। এ-জন্যই আমাদের জীবনে তুষ্টি কম, অভিযোগ বেশি। বিষয়টি একটু খতিয়ে নিলেই, সামান্য একটু জানা থাকলেই আর মন কালা হয় না, অভিযোগ আসে না; কোনো বিষয়ে অন্ধকারে থাকলে অভিযোগ আসে।

সব কথার শেষ কথা হলো, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ‘জলে-স্থলে যে-বিপর্যয় আসে, তা আমাদের দুই হাতের কামাই।’^[১] আমাদের সব অসুখবিসুখ আর বিপদাপদের একমাত্র কারণ আমাদের কর্ম (আমল)। আমাদের যেমন আমল আসমানে ওঠে, আল্লাহর তেমন ফয়সালা নিচে নামে। যখন আমরা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে ত্রুটি করি, তখন আমাদের গুনাহের কারণে আমাদের উপর মুসিবত চাপিয়ে দেন।^[২] তাই আমরা যখন আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করবো, গুনাহ থেকে তাওবা করবো, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো, তখন তিনি আর আমাদের উপর

[১] সূরা রুম : ৪১

[২] মাওয়ায়েজে ইবনে তাইমিয়া, সালেহ আহমদ শামি : ২৭

কুররাতু আইয়ুন ২

বিপদ-অসুস্থতা দেবেন না। কেননা তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায় শাস্তি দেবেন না।’ [১] ব্যস, কুল্লু খালাস। আর কোনো কথা আছে!

[১] সূরা আনফাল : ৩৩

রোগী-রহস্য

নবীন ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে আরজ

আমি ২০০৭-০৮ সেশনের, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ। ৩৫তম বিসিএসে এখন পেরিফেরিতে পোস্টিংয়ে আছি। ২ বছর হতে চললো। মেডিকেল কলেজ ক্যারিয়ার আহামরি না, পার্ট ১ দিইনি, এমডি হয়নি। মানে, খুব সম্ভাবনাময় কেউ নই। ভবিষ্যতে খুব সম্ভবত বেসিক সাবজেক্টে চলে যাবো, ক্লিনিক্যালের থাকার মতো মেধা-অধ্যবসায় নেই। তবে আমি আমার চারপাশের প্রতিটি বিষয় নিয়ে খুব ভাবি, খুব ভেঙে-ভেঙে ভাবি। গত ২ বছর পেরিফেরিতে চেষ্টার করছি, সেই ভাবনাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। যদি কারও কাজে লেগে যায়, যেন দুআ পাই। আপনারা অনেকেই অনার্স-পাওয়া, পার্ট ১-হওয়া ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাময় ডাক্তার। আপনাদের চেয়ে অনেক কম মেধার একজন সিনিয়রের কথাগুলো ভালো লাগলে তো ভালো। আর খারাপ লাগলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

১.

সবার আগে ‘মানবসেবা’ শব্দটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। সেখানে পেশা শব্দটি বসান। তা হলে পেশাদারিত্ব আসবে—প্রফেশনালিজম যাকে বলে। যদি মনে করেন, আপনি সেবা করছেন, তা হলে নির্লিপ্ততা চলে আসে। সিনসিয়ারিটি কমে, মনে হয়, আমি তো রোগীকে দয়া করছি। আমি রোগীকে দেখছি, যেমন-তেমন করে দেখলেই হবে, আমি তো সেবা—আইমিন দয়া করছি, সেটা যে-কোনো এমআউন্টের হলেই হবে। আমি বোঝাতে পারলাম কি না! কিন্তু যখন আপনি সেবা না মনে করে পেশা মনে করবেন, তখন দায়িত্ব আসবে সেবার চেয়ে বেশি। ৩০০ টাকা ভিজিট নিচ্ছি, ৩০০ টাকার সমপরিমাণ সার্ভিস তাকে দেবো। টাইম মেইনটেইন করবো, ড্রেসকোড মেইনটেইন করবো। সেবা বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে করা যায়, কিন্তু পেশা

কুররাতু আইয়ুন ২

বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে করা যায় না। মোদাকথা, এটা আমি সেবা দিতে বসিনি, এটা আমার পেশা, পেশাদারিত্ব যাকে বলে। ধুর, বোঝাতে পারছি না।

২.

টাকা জীবনে বহু আসবে। টাকা গেলেও টাকা আসবে। সুনাম একবার গেলে আর আসবে না; তাই টাকার চিন্তা বাদ। সুনাম কীভাবে কামাই করা যায়। সে-জন্য যা করতে হয়, করবেন।

৩.

রোগী কখনোই ফ্রি দেখবেন না। ফ্রি জিনিসের কোনো মূল্য নেই। আপনার ফ্রি প্রেসক্রিপশন রোগী খাবেই না, খেলেও সব খাবে না, দিন পুরো করবে না। অসুখ ভালো না-হলে আপনার বদনাম করবে। ভিজিট কম নেন দরকার হলে, কিন্তু ফ্রি দেখবেন না। যেটায় টাকা খরচ হয়, সেটা মানুষ যত্ন করে রাখে।

৪.

মানুষ যখন অসুস্থ হয়, সে সবার সহানুভূতি পেতে চায়। মানুষের যখন বয়স হয়, সে চায় তার কথা সবাই শুনুক। দেখবেন, মানুষ তার অসুখ-কষ্টের কথা সবাইকে বলতে চায়। কষ্টের কথা বলে ফেললে হালকা লাগে। রোগী আসার পর প্রথম মিনিটকে বলা হয় 'গোল্ডেন মিনিট'। এই মিনিটে তাকে বলতে দিন, কোনো প্রশ্ন করবেন না। তার না-বলা কষ্টগুলো সে বলুক, ইন্টারাপ্ট করবেন না। কনকন, শিরশির, বিড়বিড়, ফাটফাট—বলুক যা মনে চায়। আপনি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা, প্রেসার মাপতে থাকা—এগুলোতে ব্যস্ত হবেন না। আপনি খুব মনোযোগের ভঙ্গিতে ভুরুটুকু কুঁচকে তার কথা শুনুন। মাঝে মাঝে আহা, ওহো, ইশ, তাই নাকি—এ-সব বলে তার কষ্টের সাথে একমত পোষণ করুন— 'আসলেই তো বিরাট কষ্ট!' যদিও সেটা সামান্য কিছু বা অলরেডি আপনার বোঝা শেষ, তারপরও বলুক সে।

৫.

এক মিনিট শেষ। সে অনেক কথা এর মধ্যে বলেছে, সব তো আপনার দরকার নেই। এবার আপনার প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো ১ মিনিট করুন। ১ মিনিট কিন্তু অনেক সময়। হিস্ট্রিগুলো বামপাশে শটে লিখে ফেলুন। দরকার না-থাকলেও লিখুন, অসুখ

রোগী-রহস্য

ধরে ফেলেছেন, তারপরও লিখুন। রোগী যেন বোঝে, আপনি তার সমস্যাটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন, খুব গবেষণা করছেন।

৬.

এবার তার গায়ে হাত দিন। তাকে স্পর্শ করুন। রিলেটেড জেনারেল এক্সামিনেশনটুকু করুন। সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করুন। বিপি দেখুন, পালস দেখুন। চেস্ট অস্কালটেট করুন। দরকার থাক বা না-থাক, এগুলো করুন। এটি তার একটি তৃপ্তি যে, ডাক্তার আতিপাঁতি করে আমার রোগ খুঁজেছে। কিচ্ছু পায়নি—মানে, আমি একদম সুস্থ।

৭.

প্রথম যখন সে তার সমস্যাগুলো বলা শুরু করেছে, তখন এ-কথা একদম বলবেন না যে, ‘আরে এগুলো কোনো বিষয়ই না; আরে, এগুলো কোনো রোগই না; আরে, আপনার কিচ্ছু হয়নি।’ রোগী মনে-মনে বলবে, ডাক্তার না-দেখেই বলে দিলো কিচ্ছু হয়নি—মনে কষ্ট পাবে।

শুনুন, একজন রোগী মনে করে, সে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী মানুষ, তার চেয়ে কষ্টে কেউ নেই। রোগী কিন্তু মেডিকেল সাইন্স পড়েনি। সে ভাবছে, আমার গলাবুক ঝলছে, না জানি আমার কী হয়েছে! আপনি মেডিকেল সায়েন্স জানেন, আপনি জানেন, এটা তেমন কিচ্ছু না, গ্যাস ফর্ম করেছে। সে কষ্টের কথা বলে আপনার সাপোর্ট চাচ্ছে আর আপনি তুড়ি মেরে তার কষ্টকে অস্বীকার করছেন। গোল্ডেন মিনিটে তাকে বলবেন না যে, তার কিচ্ছু হয়নি। বরং এ-সময় খুব ভাব নিন, যেন আপনি বুঝতে পারছেন, তার কত কষ্ট হচ্ছে—আহা...

৮.

শারীরিকভাবে পরীক্ষা করার পর গিয়ে তাকে আশ্বস্ত করবেন, ‘মনে হচ্ছে তেমন সিরিয়াস কিচ্ছু না, খানিকটা গ্যাস ফর্ম করেছে। তবে নিশ্চিত হবার জন্য এই দুটো টেস্ট...’

রোগে মানুষের শরীর অসুস্থ হয়, সেই সাথে অসুস্থ হয় মন। শারীরিকভাবে অসুস্থ মানুষ মানসিকভাবেও অসুস্থ থাকে। উদ্বেগতা, দুশ্চিন্তা, কাউকে না-বোঝাতে পারার যাতনা তার মনকে রোগী করে তোলে। মনে করুন তো, আমরা হেলথ এর সংজ্ঞা কী পড়েছিলাম!—sense of wellbeing। ‘আমি ভালো আছি’—এই অনুভূতিকে বলে স্বাস্থ্য; অর্থাৎ শরীর সুস্থ করার সাথে-সাথে সেই সুস্থতার

কুররাতু আইয়ুন ২

অনুভূতিও (ইয়াকিন দিলানা [হিন্দিতে]) আপনাকে তৈরি করতে হবে; তা হলে আপনার হাতে সে সুস্থ হলো, রোগী স্যাটিসফাইড হলো।

তাকে জানাতে হবে, আপনার সামান্য সমস্যা হয়েছে, আমার পরামর্শ ফলো করলে ইন শা আল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তাকে আশ্বস্ত করতে হবে। এটা হলো, তার অসুস্থ মনটার চিকিৎসা। আপনার এই কথায় তার মনে যে-শক্তি তৈরি হবে, এই শক্তি তাকে feeling of wellbeing এনে দেবে। বলবেন না, তার কিছু হয়নি। কেননা, সে এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আপনার কাছে এসেছে যে, আমার কিছু একটা হয়েছে।

৯.

এবার আপনি তাকে টেস্ট দেবেন। চিকিৎসার জন্য (রোগ নির্ণয়+ওষুধ দেওয়া) যা যা লাগবে, দেবেন। বেশি হলে হবে। যদি সে বলে, আমি আগেও ওষুধ খেয়েছি নানা জায়গা থেকে, আপনার মনে হচ্ছে, টেস্টের প্রয়োজন নেই, তারপরও দেবেন। কারণ, সে নানা জায়গা থেকে ওষুধ খেয়ে ভালো হয়নি, আপনার কাছে এসেছে রোগ ধরা পড়ার জন্যই; আপনিও যদি ওষুধ লিখে দেন, তা হলে সে মনে করবে, ডাক্তার ভালোমতো না-দেখেই বলে দিলো। তাই, তার যে আসলেই তেমন কিছু হয়নি, দুয়েকটা টেস্ট করিয়ে দিলে সে তৃপ্ত হবে।

১০.

আগেই বলেছি, টাকার চেয়ে সুনামকে প্রাধান্য দিন। রোগীর অসুখ নির্ণয়ের পর যদি নিজের সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা না-থাকে (না-ই থাকতে পারে, সবার সব কিছুতে ভালো দখল থাকবে না), তা হলে উপযুক্ত জায়গায় রেফার করে দেবেন। আপনি যে ঠিকঠাক রোগ ধরে তাকে ঠিক চিকিৎসার খোঁজ দিয়েছেন, এটা রোগী মনে রাখবে ও প্রচার করবে। মনে রাখবেন, এক-একজন রোগী, আপনার এক-একজন মার্কেটিং অফিসার হবে।

১১.

রোগী নিজের কষ্টের টাকা খরচ করে টেস্ট করাবে, যেমন আপনি কষ্ট করছেন জীবিকার জন্য। এই 'কষ্ট' শব্দটা আপনাদের দুজনের মাঝে কমন। এই কমন ফিচারটা খুব সম্মানের দাবি রাখে, তাই কষ্টের টাকা দিয়ে সে যেন সবচেয়ে ভালো রিপোর্টটা পায়, সেটাও আমাদেরকেই নির্দেশ করতে হবে। বিশেষত মফস্বলের

রোগী-রহস্য

দিকে অনেক স্যাকমো, ফার্মাসিস্ট আল্ট্রাসনো করে। আমি খুব স্পষ্ট করে বলে দিই, হয় অমুক ভাই, না হয় অমুক ভাই, নয়তো অমুক ভাইকে দিয়ে করাবেন; রোগী যা খুশি মনে করুক, মনে করুক—আমি টাকা খাই; গ্রামের মানুষকে এমবিবিএস বলে বোঝে না, গিয়ে বোঝাতেও পারে না। সরাসরি এমবিবিএস যারা আল্ট্রা করে তাদের নাম বলে দিই। বলে দিই অমুক জায়গায় এক্সরে করাবেন না, মেশিন ঘোলা-ঘোলা আসে। বলে দিলেই ভালো একটা রিপোর্ট হয়, রোগীর রোগটা ধরা পড়লো ঠিকমতো।

১২.

টেস্ট লেখার সময় মুখে-মুখে স্বগতোক্তি করবেন আর লিখতে থাকবেন। ‘আপনার রক্ত কম মনে হচ্ছে, এ-জন্য রক্ত কতটুকু আছে দেখবো, বেশি কম হলে রক্ত দেওয়া লাগবে (লিখলেন CBC); আর পা ফুলছে বললেন, হার্ট আর কিডনিতে সমস্যা হলে পা ফোলে, তাই হার্ট আর কিডনিটা একটু দেখবো (ECG আর Creatinine লিখলেন); আর ডায়বেটিসটার কী অবস্থা একটু দেখা দরকার (RBS লিখলেন)। ধারাবাহ্য দিতে-দিতে লিখবেন—রোগীর রোগ-সংক্রান্ত তথ্য, কী ভাবছেন, কী কী হতে পারে, সারার সম্ভাবনা কেমন। একদম মুখ বাংলা ৫-এর মতো বানিয়ে গভীর হাঁড়িপানা মুখ নিয়ে থাকবেন না। কথা চলবে, সাথে কলম চলবে।

১৩.

যদি রোগীমোহন ডাক্তার হতে চান, যতটুকু করবেন, তার তিন গুণ দেখাতে হবে যে, আমি আপনার জন্য করছি। আপনার ভাগ্যাকাশে যে-দুর্যোগের ঘনঘটা, আমি আপনাকে আশা দেবো, আমি আপনাকে ভরসা দেবো।

১৪.

তিন সময়ে তিন রকম আচরণ করবেন। যখন রোগী তার কমপ্লেন বর্ণনা করবে, তখন আহা-উঁহু করবেন, যেন রোগীর অসুখটা কত বড় অসুখ! শারীরিক পরীক্ষার পর আপনার ভাবটা হবে : সমস্যা কিছু আছে, তবে অতটা জটিল মনে হচ্ছে না। আর টেস্টের রিপোর্ট আসার পর যখন অমুখ লিখবেন, তখন ভাবখানা হবে : আরে, আপনার কিছু হয়নি, এগুলো তো অহরহ হয়; এই ওষুধ খাবেন, সাত দিনের মধ্যে আল্লাহ সুস্থ করে দেবে। রোগী যতটা টেনশন নিয়ে এসেছিলো, ততটা

কুররাতু আইয়ুন ২

শক্তি নিয়ে ফেরত যাবে। শরীরের চিকিৎসা আল্লাহ ওষুধের মাধ্যমে করবেন। আর তার উদ্বিগ্ন মনটার চিকিৎসা করবেন আপনি—চেষ্টারের ভেতরের সময়টুকুতে।

১৫.

চেষ্টার শেষ। এবার উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে যখন ডিউটি করবেন, সরকারি হাসপাতালে আউটডোর রোগী দেখার সময় রোগীপ্রতি বরাদ্দ ৩-৫ মিনিটের বেশি কোনো দিনই সম্ভব না—তাও দেওয়া সম্ভব না—যদি রোগীরা গায়ের উপর এসে পড়ে চারদিক থেকে; লাইন ধরতে বললে নগদে মাইর খেয়ে যেতে পারেন। যদি সম্ভব হয়, লাইন দেওয়াতে পারলে ভালো, ৫ মিনিট ধরে দেখলেও অনেক ভালো দেখা যায়। না হলে আর কী করা!

১৬.

রোগীর অবস্থায় যদি বুঝতে পারেন, রোগী ভালো না, বা রাতে খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে, রাতে খারাপ হলে আপনার সেটআপে চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই, তা হলে ওখান থেকেই রেফার করে দিন। ভর্তি করে কারিশমা দেখানোর চিন্তা বাদ দিন। নির্মম বাস্তবতার কথা বলছি, আমার স্টেশনে দারোয়ান থেকে শুরু করে সিস্টার পর্যন্ত, কুক থেকে আয়া, সবার সাথেই গপসপ হয়; সবাই আমাকে কমন যে-বাক্যটা বলেছে—‘স্যার, এই হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে যেন রোগী না-মরে, রোগী মরবে রাস্তায়। হাসপাতালে মরলে দোকানের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে হাজির হবে, আপনিও যাবেন, আমরাও যাবো।’ সুতরাং, আবারও বলছি—পেশাদার হোন। নিজেকে সেবাদাতা দেবতা-গোছের কিছু মনে করবেন না যে, আপনার হাতের স্পর্শে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। শেষে মান-জান দুটো নিয়েই টানাটানি।

১৭.

অনেকে এসে ওষুধ দাবি করবে। অসুখ নেই, হাসপাতালে যা আছে, লিখে দিন; দিয়ে দেবেন। জনগণের ওষুধ জনগণ নেবে। নিজেকে এত আমানতদার ভাবার কিছু নেই। আপনি সবার আগে আপনার নিজের ইজ্জতের আমানতদার। লিখে না-দিলে নগদ না হলেও বাকিতে মাইর খাবেন।

১৮.

পশ্চিমা বিশ্বে এবং কর্পোরেট দুনিয়ায় প্রশাসনিক কাঠামোয় ‘হায়ারার্কি সিস্টেম’ ধীরে-ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। কোনো কাজ সুস্থভাবে হবার জন্য হায়ারার্কির চেয়ে (বসের উপর বস, তার উপর বস) ‘টিম সিস্টেম’ (একজন টিমলিডার, বাকিরা সবাই টিমমেম্বর) এখন বেশি আউটপুট এনে দিতে পারে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। পরে এক দিন আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ। এ-জন্য আমার ব্যক্তিগত চিন্তা—হাসপাতালে ডাক্তার, স্যাকমো, নার্স, ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার—আমরা সবাই একটি ইউনিট। কেউ কাউকে প্রতিযোগী মনে করা ঠিক না। মায়ের বয়সী নার্সরা কেন আমাকে ‘স্যার’ ডাকছে না, এ-সব নিয়ে বদারড না হয়ে কীভাবে আমরা সবাই মিলে হাসপাতালটা চালাতে পারি, সে-দিকটা খেয়াল করা দরকার। নার্স-ডাক্তার-স্যাকমো-এমআর—সবার সাথে ভালো সম্পর্ক না-থাকলে যেটা হবে, সেটা হলো আপনাকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে সমালোচনা হবে—দোকানে-দোকানে; ফলে আপনার উপর রোগীর ক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা বাড়বে। হসপিটাল-স্টাফদের সাথে কথা কাটাকাটিতে যাবেন না, মুখে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন, নয়তো লিখিত দেবেন। নার্স-স্যাকমোদের সাথে ক্যাঁচক্যাঁচ করা অফিসারসুলভ নয়। আপনার বেশি আপত্তিকর মনে হলে লিখিত দিন। অফিস সেটআপে ‘লিখিত’ ব্যাপারটা বিরাট ব্যাপার; বরং আমার মতে, শুধু কমান্ডিং নয়, হায়ারার্কি থেকে বেরিয়ে (একদম বেরিয়ে না) ‘টিম’ কনসেপ্টে আমাদের কাজ করা দরকার।

১৯.

অসুস্থ শরীর বা স্ট্রেসওয়ালা মন নিয়ে রোগী দেখবেন না। তাড়াহুড়া করে রোগী দেখবেন না। আজ শরীর ভালো লাগছে না, রোগী দেখবেন না। আগেই বলেছি ‘পেশাদারিত্ব’। সেবা করতে বসেননি, পেশাগত মান দিতে না-পারলে রোগী দেখবেন না, ভিজিটের লোভ করবেন না। এতে আপনার সুনাম বাঁচবে, রোগী দরকার হলে আরেক জায়গায় দেখাবে। সময় নিয়ে দেখবে সেই ডাক্তার। আজ আমি দেখবো না, আমি আজ অসুস্থ এটা বললে রোগীর কাছে আপনি নিচু হবেন না, বরং আরও উঁচু হবেন।

মুসলিম ডাক্তারদের প্রতি বিশেষ পায়েন্ট :

হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আপনাদের কী ধারণা? বুজরুকি? আচ্ছা, আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান দশের অধিক রোগী আমি পেয়েছি, যারা এমন রোগে আক্রান্ত ছিলো, যেখানে আমাদের অপশন—সার্জারি। কিন্তু হোমিও খেয়ে তারা ভালো হয়ে গেছে। লাইপোমা, নিউরোফাইব্রোমা, ফিস্টুলা—এই জাতীয় ক্রনিক নন-লাইফথেটনিং। আমরা কেউ-কেউ বলি স্টেরয়েড ইউজ করে। স্টেরয়েডে এ-সব সারা সম্ভব না। আর কেউ বলি, বিশ্বাসকে ব্যবহার করে কিছু কাজ করে—ড্যাটস মাই পয়েন্ট। বিশ্বাসকে ওরা ব্যবহার করলে আমরা কেন করবো না। আমি শুরুতে বলেছিলাম, অসুস্থ মানুষের অসুস্থ শরীরের পাশাপাশি অসুস্থ মনটারও চিকিৎসা আমাদেরই করতে হবে। আমার মনে হয়, আমরা যদি রোগীর বিশ্বাসটাকে আমাদের চিকিৎসার অনুকূলে ব্যবহার করি, ব্যাপারটা দারুণ হবে! কমপ্লায়েন্স অনেকখানি বাড়ার কথা।

একটি বিষয়ের উপর রোগীর বিশ্বাসকে অটল করে দিতে হবে। ওষুধের উপর হবে না, কারণ, একই ওষুধ খেতে-খেতে কেউ মরে, কেউ সুস্থ হয়। অতএব, আপনি বলতে পারবেন না যে, এটা খেলে আপনি ভালো হবেনই, কেউ আটকাতে পারবে না। এ-ক্ষেত্রে আপনি রোগীর প্রিফর্মড বিশ্বাসকেই কাজে লাগাবেন—আল্লাহর প্রতি ঈমান। এটা এবসলিউট, এটা ভ্যারিয়েবল না। তাকে বলুন, ‘আল্লাহ ভালো করলে কেউ আটকাতে পারবে না। আমাদের সুস্থ হতে দাওয়া ও দুআ দুটোই দরকার। ওষুধ কাজ করবে ওষুধের মতো। আর রোগমুক্তি আল্লাহ দেবেন আল্লাহর মতো করে। এ-জন্য আল্লাহ থেকে রোগমুক্তি চেয়ে নেবেন।’

আমরা মুসলিম, কিন্তু আমাদের সবার ধর্মবিশ্বাস সমান নয়। আপনি এই কথাটুকু আপনার বিশ্বাস থেকে বলুন, আর চিকিৎসার অংশ হিসেবে বলুন, এর দুটো ইফেক্ট আছে—

আপনি সেফ সাইডে গেলেন, যদি ট্রিটমেন্টে আশানুরূপ রেজাল্ট না-আসে, আপনার একটি ব্যাখ্যা থাকলো। চিকিৎসা আমরা করবো ঠিক আছে, ভালো তো করবেন আল্লাহ।

রোগী তার বিশ্বাসের শক্তিকে একটি এবসলিউট কেন্দ্রে জমা করলো—‘আমি সুস্থ হবোই, আল্লাহ আমাকে এই ওষুধে সুস্থ করবেনই। কত জনকে তো ওষুধ ছাড়াই সুস্থ করেন, সেখানে আমি তো ওষুধও ব্যবহার করছি। তিনি চাইলে সব হয়, আমাকে সুস্থতা দেওয়া তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না!’ এটা একজন রোগজর্জর মানুষের জন্য অনেক কিছু; আপনার কাছে কিছু মনে হচ্ছে না, কারণ,

রোগী-রহস্য

আপনি সুস্থসবল। তার ভেঙে-পড়া সাইকোলজির জন্য এটি অনেক শক্ত মলম; এবং এই কাজটি করতে গিয়ে আমরা তাকে একটি রশি দেবো, যেটি সে ওষুধের পাশাপাশি মজবুত করে ধরবে। এটা তার মনের চিকিৎসা।

যেমন কুরআনে আল্লাহ বলছেন, ‘নিশ্চয়ই এই কুরআন শিফা (রোগমুক্তি)।’^[১] সুতরাং আমরা তাকে কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা বলে দেবো, যা সে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাস বাড়বে, আমরা তার অসুস্থ মনটাকে যে-স্থিরতা (ট্রান্কুইলিটি/সুকুন) দিতে চাচ্ছি, সেটা আসবে। এটা একজন অসুস্থ রোগীর জন্য বিরাট ওষুধ—তার ছটফটে মনকে শান্ত করা। এটা দ্রুত তাকে feeling of wellbeing এনে দেবে।

আর সংক্ষেপে আপনাদের জ্ঞাতার্থে একটি ইনফো জানিয়ে রাখি। আমরা জানি যে, আমাদের কোষে-কোষে একই সময়ে যে হাজারও বিক্রিয়া হচ্ছে, তার মাধ্যম হলো পানি; যাকে আমরা ‘ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট’ বলি। এই টিস্যু ফ্লুইড ও কোষস্থ পানির যে-কোনো প্রোপারটিজে সামান্যতম এদিক-সেদিকের কারণে বিক্রিয়াগুলোও প্রভাবিত হতে বাধ্য। Professor of Bioengineering, University of Washington—গবেষক Gerald Pollack, PhD^[২] তার The Fourth Phase of Water (Ebner & Sons, ২০১৩) বইয়ে তিনি সর্বপ্রথম ‘পানির ৪র্থ অবস্থা’র থিওরি তুলে ধরেন। উনার মতে কঠিন (বরফ), তরল ও বায়বীয় (বাষ্প)—এই ৩ অবস্থা ছাড়া পানির আরেকটি অবস্থা আছে; যার নাম দেন তিনি ‘৪র্থ দশার পানি’ বা EZ Water বা structured water। এটা হলো বরফ আর তরল পানির মাঝামাঝি একটি দশা। কোনো তলের সাথে সংলগ্ন পানির একদম তলঘেষা পাতলা স্তরটুকু আসলে এই ৪র্থ দশার পানি (This phase occurs next to water loving hydrophilic surfaces.)। তার মতে মানবদেহের কোষের ভেতরের মোট ২৮ লিটার পানি ৪র্থ দশায় থাকে। তার মতে, পারিপার্শ্বিক নানান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবেদনে পানি গঠনগতভাবে সাদা দেয়, এমনকি এর সামান্য স্মৃতিধারণ ক্ষমতাও থাকতে পারে। মানবদেহ একটি উজ্জ্বল শক্তিক্ষেত্র (radiant energy field) তৈরি

[১] সূরা ইসরা : ৮২

[২] তার ডিটেইলস পরিচয় জানতে <https://www.pollacklab.org/jerry> থেকে https://docs.wixstatic.com/ugd/4c5fa1_1ade16c23c984a37ab4d20c4d3f710e6.pdf ফাইলটা নামিয়ে দেখুন।

কুররাতু আইয়ুন ২

করে, যা মানুষের শরীর-মনের অবস্থার ওপর পরিবর্তন হয়। কুচিস্তা ভিন্ন বর্ণালির, ভিন্ন ধরনের শক্তি দেয়, ভালো চিন্তার তুলনায়।^[১]

Prof. Gerald Pollack আরও বলেন, ‘এটি খুবই সম্ভব যে, দেহের radiant energy field-এর তারতম্যের কারণে কোষস্থ পানির (৪র্থ দশার) আণবিক গঠনই বদলে যাচ্ছে। একই ব্যাপার দেহের বাইরের পানির ক্ষেত্রেও অসম্ভব নয়।’ তিনি বিশ্বাস করেন, যেহেতু পানির স্মৃতি আছে, তাই এই উদ্দীপক (stimulus) সরিয়ে দিলেও বদলে-যাওয়া গঠন তেমনই থাকছে। Pollack সাহেবের মতে, যেহেতু মানবদেহের ৭০%-ই পানি, আর পানির অণু ধরে হিসাব করলে ৯৯%-ই পানি, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদার্থ দেহের ভেতর শুধু পরোক্ষ ভূমিকা পালন করবে—এটি হতেই পারে না।

‘পানির উপর আবেগের প্রভাব’ নিয়ে গবেষণাকারী Dr. Masaru Emoto-এর গবেষণাকে তিনি ‘পানির ৪র্থ দশা’ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। মানে, পানির ভৌত ধর্ম (Physical property) পজিটিভ আবেগ-সুর-প্রার্থনা-শব্দ এ-সবে পরিবর্তন হয়, নেগেটিভ আবেগ-কথাতেও বদলে যায়।

Dr. Masaru Emoto-কে এক মুসলিম কলিগ জমজমের পানি ও কাবার ছবি দেয় পানির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি পানির প্রতিক্রিয়াও দেখা হয়, ছবি তোলা হয় ক্রিস্টালের। পানির সামনে কুরআন তিলাওয়াত প্লে করে তিনি পান সবচেয়ে নিখুঁত আকারের ষড়ভুজাকার (Hexagonal) ক্রিস্টাল! তাকে আরও জানানো হয়, মুসলিমরা ১৪০০ বছর ধরে পানি পানের আগে পানির সামনে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে। তিনি জানান, এর ফলে পানির গুণাগুণ স্পষ্টতই বেড়ে যাওয়ার কথা।^[২]

কুরআনের কারণে যে-নিখুঁত ক্রিস্টালটা হলো, মানে—পানি তার সবচেয়ে নিখুঁত বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে—পানির তৈরি করার কথা ষড়ভুজাকার ক্রিস্টাল, এই অবস্থায় পানি সেটিই করেছে, যেটি আসলেই তার করার কথা; মানে, এটিই হচ্ছে পানির যথার্থ অবস্থা; যে অবস্থায় শরীরের সব জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া অপটিমাম ভাবে চলবে। আল্লাহ বলেছেন, ‘এই কুরআন হলো শিফা (রোগমুক্তি)।’ মুসলিমরা নামাযে তিলাওয়াত করে, নামাযের বাইরে দেখে তিলাওয়াত করে,

[১] Pamala O, Life Colors – What the colors in your aura reveal, New World Library, ২০০৪

[২] বিস্তারিত জানতে দেখুন লেখকের কষ্টিপাথর বইয়ের ‘জীবনের অপর নাম পানি’ অধ্যায়টি

রোগী-রহস্য

প্রতি দিন বিশেষ কিছু সূরার আমল (ইয়াসিন, সাজদাহ, ওয়াকিয়া, মুলক) ওয়াকা হিসেবে করে। এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ডেফিনিটলি আছে, থাকতেই হবে।

বিভিন্ন রোগের জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রভাব অবশ্যই আছে— মুসলিম হিসেবে এটিই আমাদের বিশ্বাস। নিচে আমি একটি লিস্ট করেছি, যা অনেক আলিমের অভিজ্ঞতালব্ধ। এগুলো সুন্নাহ হিসেবে নয়, শুধুই অভিজ্ঞতার আলোকে ও বিভিন্ন জনের উপকার পাওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা, তাই আমল করার আগে এটা ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা আমাদের আধুনিক মেডিসিনের পাশাপাশি এটা ব্যবহার করতে পারি। রোগী আয়াতগুলো মুখস্থ করে বারবার আওড়াতে পারে (প্রতি নামাযের পর ৩ বার বা ৭ বার), কিংবা পড়ে পানিতে দম করে পান করতেও পারে—যেভাবে তার সুবিধা।

রোগ	আয়াত
যে-কোনো মাথাব্যথা	লা ইয়ুহুদাউ-না আনহা ওয়া লা ইয়ুনযিফুন (সূরা ওয়াকিয়া)—৩ বার
মাইগ্রেন	<p>☞ শুরু ও শেষে ৩ বার দুরুদ, মাঝে এই আয়াত : আলাম তারা ইলা রব্বিকা কাইফা মাদ্দাজ্জিল্লা ওয়া লাও শা-আ লাজাআলাহ সা-কিনা--১১ বার</p> <p>☞ আসরের নামাযের পর সূরা তাকাসুর</p>
সর্দি-কাশি (common cold)	<p>☞ সূরা কাহফের ১ নং আয়াত</p> <p>☞ সূরা ফাতিহা—৩ বার</p>
যে-কোনো মুখে ঘা (aphthous, fungal etc)	<p>☞ সূরা কাউসার—২১ বার</p> <p>☞ সূরা দোহা—৪১ বার</p> <p>☞ সূরা ইখলাস—৪১ বার</p>

কুররাতু আইয়ুন ২

যে-কোনো গলা ফোলা (Tonsillitis, mumps, pharyngitis)	<p>☞ সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত: ফালাও লা ইয়া বালাগাতিল হুলকুম। ওয়া আনতুম হি-নাইযিন তানযুরুন। ওয়া নাইনু আকরবু ইলাইহি মিনকুম ওয়ালাকিন্না তুবসিরুন। ফালাও লা ইন কুনতুম গাইরা মাদ্বীনিন। তারজিউনাহ ইন কুনতুম সদিকীন।</p> <p>☞ মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফী-হা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা... কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ... হা-মীম-আইন-সীন-কাফ</p>
ঘাড়ব্যথা	ইন্না জাআলনা ফী আ'নাক্বিহিম আগলালান ফাহিয়া ইলাল আযক্বনি ফাহুম মুক্বনাহ্না। (সূরা ইয়াসিন)
বুকের যে-কোনো ব্যথা	<p>☞ সূরা ফাতিহা ৭ বার</p> <p>☞ সূরা আলাম নাশরাহ ৭ বার</p> <p>☞ আয়াতুল কুরসি ৩ বার</p>
কফ	<p>☞ সূরা যুখরুফ</p> <p>☞ ওয়া শাদাদনা মুলকুহ ওয়া আতাইনাহ্ল হিকমাতা ওয়া ফাহ্লাল খিতাব ২১ বার</p>
যক্ষ্মা	<p>☞ সূরা আলাম নাশরাহ ৪১ বার ৭ দিন</p> <p>☞ সূরা গাশিয়াহ ৩ বার</p>
অ্যাজমা	<p>☞ 'আশ-শাকুর' যিকির করবে চলতে ফিরতে</p> <p>☞ সূরা আলাম নাশরাহ</p>

রোগী-রহস্য

নিউমোনিয়া	<p>☞ সূরা তাহরিম ৩ বার</p> <p>☞ আনিল ইয়ামিনী ওয়া আনিশ শিমালী ইযীন ১০০ বার</p>
ফুসফুসের যে-কোনো অসুখ	<p>☞ শুরু ও শেষে ৩ বার দুরুদ, মাঝে সূরা আর-রাহমানের শুরু থেকে মারাজাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিয়ান পর্যন্ত ১১ বার, ৪১ দিন পর্যন্ত</p> <p>☞ সূরা ইয়াসিনের শুরু থেকে 'ফী ইমামিম মুবীন' পর্যন্ত</p>
বুক ধড়ফড়ানি	<p>☞ সূরা আলাম নাশরাহ</p> <p>☞ সূরা হাশরের আয়াত : লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিল লারাআইতাছ খশিয়াম মুতাছদিআম মিন খশিয়াতিল্লাহ, ওয়া তিলকাল আমছালু নাদরিবুহা লিন্নাসি লাআল্লাহম ইয়াতাক্বারুন</p> <p>☞ সূরা কুরাইশ</p>
এংজাইটি	<p>☞ ওয়া লিইয়ারবিদ্দা আলা ক্বলুবি কুম ওয়া ইয়ুছাব্বিতা বিহিল আক্কদাম (সূরা আনফাল)</p>
হেপাটাইটিস	<p>☞ সূরা আর-রাহমানের শেষ আয়াত : তাবারাকাসমু রব্বিকা যিল জালালি ওয়াল ইকরাম ২১ বার</p>
বদহজম	<p>☞ সূরা কদর ১১ বার, ৩ বেলা</p> <p>☞ সূরা ইনশিকাক ৩ বার</p>

কুররাতু আইয়ুন ২

যে-কোনো পেটব্যথা	<ul style="list-style-type: none"> সূরা কাসাস ও সূরা লুকমান সূরা নামলের আয়াত ৫ বার, না হলে ১১ বার : ওয়া কানা ফীল মাদীনাতি তিসয়াতু রাহতিই ইয়ুফসিদুনা ফিল আরদি ওয়া লা ইয়ুসলিহ্ন উপুড় করে সূরা ফাতিহা ৪০ বার আলাম নাশরাহ ও ফাতিহা ৭ বার করে
আলসার (PUD)	<ul style="list-style-type: none"> প্রতি দিন 'ইয়া মুকিতু' ১০০ বার সূরা ফাতিহা + ইখলাস+ফালাক+ নাস + নিচের দুআ : আউযু বিওয়াজহিল আযীমি ওয়া কুদরাতিহিল্লাতি লা তামনাউ' মিনহা মিন শাররি মা আজিদু মিনহ; সব ৭ বার করে সূরা ইয়াসিন ১১ দিন বিসমিল্লাহ-র সাথে : সূরা মুমিনুন ১১৫-১১৬ নং আয়াত ১১ বার
ডায়রিয়া/আমাশয়	<ul style="list-style-type: none"> ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযিনাত তাক্বাও ওয়াল্লাযিনাহ্ম মুহসিনুন—১০০০ বার ৭ দিন সূরা দুখান
বমি-বমি ভাব/বমি	<ul style="list-style-type: none"> সূরা ওয়াকিয়া ১ম ১০ আয়াত
ক্ষুধামন্দা (Anorexia)	<ul style="list-style-type: none"> ওয়াল্লাযী হুয়া ইয়ুত্বিমুনী ওয়া ইয়াসকিন—৪১ বার (সূরা শুআরা) ওয়া লাও লা ফাদ্বলুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রাহমাতুহ ওয়া আন্নাল্লাহা তাওয়াবুন হাকীম—২১ বার (সূরা নূর)

রোগী-রহস্য

হেঁচকি (Hiccup)	<ul style="list-style-type: none"> ৩ টোঁক পানি খাবে, প্রতি টোকে ৭ বার বলবে 'ইয়া হাফিযু' সূরা গাশিয়াহ
অতি পিপাসা (polydypsia)	<ul style="list-style-type: none"> সূরা ফাতিহা সূরা ওয়াকিয়া ৩ বার
প্রস্রাবে প্রদাহ (UTI)	<ul style="list-style-type: none"> সূরা কুরাইশ
কিডনিতে পাথর	<ul style="list-style-type: none"> সূরা আলাম নাশরাহ ২১ দিন
প্রস্রাব বন্ধ (retention)	<ul style="list-style-type: none"> লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা... ইয়াতফাক্করুন
ডায়বেটিস	<ul style="list-style-type: none"> ৩/৫/৭ বার দুর্দ+সূরা আদিয়াত ১ বার+ 'ইম্নাহু আ'লা রজঈহী লাক্কাদীর ১ বার ... চলবে শুরু ও শেষে ৩ বার দুর্দ, মাঝে 'ওয়া কুর রবিব আদখিলনী মুদখলা সিদকিও ওয়া আখরিজনী মুখরজা সিদকিও অ্যা জাআললি মিল্লাদুনকা সুলত্বনান নাসীরা
কোমরব্যথা (mechanical, PLID etc)	<ul style="list-style-type: none"> সূরা ফাতিহা ৭ বার সূরা আলা-র 'কদ আফলাহা মান তাযাক্কা... থেকে শেষ পর্যন্ত
পুরুষত্বহীনতা (ED, PE)	<ul style="list-style-type: none"> ফজরের পর সূরা ফাতিহা ৩০০ বার ১২০ দিন আসরের পর শুরুতে ও শেষে ৭ বার দুর্দ, মাঝে 'রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফিরলানা ইম্নাকা আ'লা কুল্লি শাইইন কাদীর' মাগরিবের পর সূরা মুরসালাত এশার পর শুয়ে সূরা তারিক

কুররাতু আইয়ুন ২

গনোরিয়া	☞ সূরা মুযযান্নিল
সিফিলিস	☞ সূরা তাকউইর
মাসিকের ব্যথা ও অতিরিক্ত মাসিক (Dysmenorrhoea)	☞ সূরা দাহর ৭ দিন ☞ সূরা কাউসার ৩১৩ বার
স্তনে ব্যথা	☞ ইখলাস+ফালাক+ নাস ১০ বার করে ☞ সূরা ফিল ৭ বার
পাইলস	☞ প্রতি নামাযের পর সূরা আলা চলবে
হাতের ব্যথা (tendinitis, bursitis, RA etc)	☞ সূরা হুমাযাহ ☞ ফাআন্মা মান উতিয়া কিতাবাহ বিইয়ামিনিহী ফাইয়াকুলু হা-উমুকরাউ কিতাবিয়াহ—৩ বার
পায়ের ব্যথা (gout, PVD, arthritis)	☞ আল্লাহুহুলায়ী আনযালাল কিতাবা বিল হাক্কি ওয়াল মীযান, ওয়ামা ইয়ুদরিকা লাআল্লাস সাআতা ক্বরীবা (সূরা শূরা) ☞ আল্লাহুহুলায়ী খলাকাস সামাওয়াতি ... তাতাযাক্করুন (সূরা সাজদাহ)
আঙুলব্যথা (RA etc)	☞ লা ইয়ুহুদাউনা আনহা ওয়া লা ইয়ুনযিফুন—৩০০ বার
জয়েন্ট ব্যথা (arthropathy)	☞ আক্রান্ত জোড়া ধরে সূরা ফাতিহা+সূরা কাফিরুন ১০ বার করে
যে-কোনো জ্বর (acute or chronic)	☞ কুলনা ইয়া নারু কুনী বারদাও ওয়া সালামান আ'লা ইবরাহিম ☞ সালামুন কওলাম মির রব্বির রাহীম ☞ সূরা ফাতিহা ৪০ বার
জন্ডিস	☞ সূরা বাইয়িনাহ ☞ সূরা সাবা ☞ 'ইয়া হাসীবু'—৩০০ বার

রোগী-রহস্য

যে-কোনো স্কিন ডিজিজ	☞ সূরা ক্বদর সকাল-সন্ধ্যা—৭ বার
যে-কোনো ক্যান্সার	☞ 'ইয়া রাক্বীবু'—১০০ বার ☞ ফজরের ফরয ও সুন্নাতের মাঝে বিসমিল্লাহ-সহ মিলিয়ে সূরা ফাতিহা ৪১ বার; ☞ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমিলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন'—এভাবে
শ্বেতী/ কুষ্ঠ	☞ ইয়া মাজীদু বেশি-বেশি পড়বে
মৃগীরোগ/ যে-কোনো খিচুনি	☞ সূরা যিলযাল ☞ প্রতি দিন ইশরাকের পর সূরা শামস ☞ প্রতি দিন ইশার পর সূরা মাআরিজ
পক্ষাঘাত	☞ ফূরা ফাতিহা ৭ বার পড়ে তেল দ্বারা মালিশ
নিদ্রাহীনতা	☞ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহ ইয়ুসল্লুনা আলান্নাবিয়্যা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা ১১ বার ☞ ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ুম বেশি-বেশি পড়বে
যে-কোনো ব্যথা	☞ সূরা হাশরের 'লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা... থেকে শেষ পর্যন্ত।
যে-কোনো রোগ	☞ সূরা ফাতিহা ☞ সূরা মুহাম্মাদ

অসুখ আল্লাহর তরফ থেকে আসে, রোগমুক্তিও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। মুসলিম হিসেবে এটাই আমাদের আকীদা—আমাদের বিশ্বাস। কোনো বিজ্ঞান, কোনো গবেষণা, কারও কোনো টিটকারি আমাদেরকে এই আকীদা থেকে ফেরাতে পারে না। দুনিয়ার সব গবেষণা মিথ্যে হতে পারে, জার্নাল মিথ্যে হতে পারে; কুরআন সত্য, নবীজির হাদীস সত্য—ঈমান এটারই নাম। এই অনুভূতির কোনো কমতি থাকলে আমার কপালে দুর্গতি আছে, সে আমি যত বড় প্রোফেসরই হয়ে যাই না কেন।

প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখবো, কিন্তু অন্তরে খোদিত থাকতে হবে ঈমানের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পিতা ইবরাহিম আ.-এর স্বীকারোক্তি—‘... এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে সুস্থ করেন।’^[১] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ্যই আমার সাক্ষ্য—‘হে মানবজাতির রব, আমার কষ্ট দূর করে আমাকে আরোগ্য দিন। আপনিই আরোগ্যদাতা। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই। আর আপনার আরোগ্যের পর আর কোনো কষ্ট বাকি থাকে না।’^[২] প্রত্যেক রোগীকে এই কথার দাওয়াতও দেবো, যাতে নিজের বিশ্বাসের কমতিগুলো দূর হয়ে যায়। ইবরাহিম আ. আর মুহাম্মাদ সা.-এর সাক্ষ্যের সাথে আমার সাক্ষ্য মিল খেয়ে নিঃসঙ্কোচ হয়, সব ‘কিন্তু-তবে-আসলে’র খাদ সরে যায়, হাতের লেখার চেয়ে বেশি বিশ্বাস যেন অন্তরের স্বীকারোক্তির হয়। আর ডাক্তাররা হলো পির সাহেবের মতো, ডাক্তারের একটা কথা রোগী লুফে নেবার জন্য তৈরি থাকে। এই নাজুক মুহূর্তে আমার একটা কথা যদি একজন রোগীকেও আল্লাহমুখী করে দেয়, আমার জন্য কত বড় কামাই হলো!

তবে কষ্টের কথা হলো, কুরআনের এই সূরার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আমরা ডাক্তারসমাজ—

‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে—যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। অপেক্ষা করো, শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলছি, অপেক্ষা করো, শীঘ্রই জানতে পারবে। শীঘ্রই নিশ্চিত জানা জেনে যাবে তখন, যখন দেখবে জাহিম দোষখ। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করবো।’

[১] সূরা শুআরা : ৮০

[২] আস-সহিহ, বুখারি : ৫৬৭৫

রোগী-রহস্য

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অর্জনের পেছনে আমরা ব্যয় করে ফেলি যৌবন, জীবন। ডাক্তাররা নগদ কাঁচা টাকার বিষে দুনিয়ার সাথে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জীবনের বড় অংশটাই যায় ডিগ্রি, খ্যাতি আর টাকার পেছনে। অবশ্যই এই মেধা, এই জ্ঞান আর এই সচ্ছলতার ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন করা হবে। মানবসেবা নফল আমল, এর জন্য যেন আমার কোনো ফরয আহকাম না-ছোটে। নফল আমলের পেছনে এত ব্যস্ত যেন না-হয়ে যাই যে, ফরয 'ইলম' অর্জন, ফরয 'আত্মশুদ্ধি'টুকু অর্জন না-করেই কবরের ডাক এসে যায়। এটুকুর জন্য যেন সময় মেলে। দুনিয়ায় ধনী হতে, মশহুর হতে ইসলাম নিষেধ করেনি; ঘুড়ি চাহে যত উপরেই উড়ুক সমস্যা নেই, নাটাইয়ের সাথে সম্পর্ক যেন নষ্ট না-হয়। এ-জন্য মাঝে-মাঝে ফিরে-ফিরে দেখা চাই যে, আমার মালিকের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক আছে তো!

উনি আমার তো সব আমার, আমার চেয়ে ধনী কেউ নেই।

উনি আমার না তো আমার চেয়ে বড় ফকির আর কে? টাকার বিছানায় শুয়েও—ফকির, নিঃস্ব, রিক্ত।

মেনথল-জীবন

খুব বেশি ঠেলায় না পড়লে ব্যাংকে যাই না। একটা একাউন্ট আছে সোনালী ব্যাংকে, সরকারি ব্যাংক। আর-দশটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই কারামতের মাধ্যমে চলছে। ঈদের আগে আগে এমনিতেই ভিড় হয়। এমনিই এক ঈদের আগে খুশিতে-ঠেলায়-ঘোরতে সকাল সাড়ে দশটায় পদধূলি দিলাম। ‘নগদ প্রদান’ সাঁটা কাউন্টারে দাঁড়ালাম প্রায় ৩৫ জনের পেছনে। মিনিট চল্লিশেক তাসবিহ পড়ার পর একজন এসে ‘খুশখবর’ দিলো, যাদের চেক ‘নিজ’-এর, তাদের জন্য অন্য লাইনের সুব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ, তবে সেটা একটু স্লো এগোচ্ছে। তাতে কী, রিস্টের নামই তো জীবন, এবার জায়গা হলো ১৫ জনার পেছনে। ১২ টার দিকে ঠাভা গলায় নারী কর্মকর্তা দুঃসংবাদটা দিলেন, ‘৬ মাসের বেশি অব্যবহৃত থাকায় আপনার একাউন্টটি ডার্মেন্ট হয়ে কোমায় চলে গেছে, দরখাস্ত করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করুন।’ হতাশা নিয়ে বাড়িই চলে যাচ্ছিলাম; মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—বাড়িতে তোমার কাজটা কী, হে? দরখাস্তটা এখনই করে ফেলো না, বাপু!

গেলাম এক ফটোকপির দোকানে; ‘ভাই, একটি সাদা কাগজ দিন, আমি টাকা দিয়েই নেবো।’ ‘সাদা কাগজ নেই (?), পাশের দোকানে যান।’ যে-দোকানটা সে দেখালো, সেটা ফটোকপির না, কাগজেরই পাইকারি দোকান; এক পিস কাগজ পাবার সম্ভাবনা আরও কম। আগের দোকানে ফিরে গেলাম—‘কী সমস্যা, ভাই? বললাম তো, টাকা দিয়েই নেবো!’ এবার তার মনে দয়া হলো, দিলেন। ব্যাংকে ফিরে এপ্লাই করলাম, ম্যানেজার সাহেবের রুমে গেলাম, আরেকজন অফিসারকে রেফার করে দিলেন। খুব অমায়িক লোক তিনি; বললেন, ‘ওখান থেকে জমা স্লিপ নিয়ে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে আসুন’—এটাই নিয়ম। জমার কাউন্টারে এবার জনাদশেকের পেছনে ঠাঁই হলো। আল্লাহুন্মাজ আলনী শাকুরা, ওয়াজ আলনী সবুরা, ওয়াজ আলনী ফী আইনী সগীরা ওয়া ফী আইনিন নাসি কাবির।^[১] জমা

[১] এটি মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঠিত একটি দুআ। আরবিপাঠ এমন—

মেনথল-জীবন

দিয়ে অফিসারকে জানাতেই তিনি কম্পিউটারে কিছু কাজ করে জানালেন, 'একাউন্ট পুনর্জন্ম লাভ করেছে, আপনি টাকা তোলার লাইনটিতে ফেরত যান।'

একটা বেজে গেছে, চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে নারী কর্মকর্তা বললেন, 'ভাই, কম্পিউটার ক্রোজ করে দিয়েছি, সালাত পড়বো, খাবো। মা শা আল্লাহ, বারকাল্লাহ! আমিও সালাত সেরে ১:৪৫-এ ফের ব্যাংকে দাখেল হলাম। এবার প্রথম স্থান অধিকার করে 'স্ট্যান্ড' করলাম। ২০ মিনিট পর যথাসময়ে তদ্রমহিলা এসে আবার জানালেন, 'আপনার একাউন্ট তো এন্টিভেট হয়নি!' আবার গেলাম সেই অমায়িক পুরুষ অফিসারের কাছে, ফের লাইনের পেছনে দাঁড়ানোর অসহায়তা প্রকাশ করলাম। নিজে উঠে গিয়ে আরেক ডেস্কে জানালেন ভদ্রলোক, আর আমি দাঁড়ালাম বাইরে টাকা গ্রহণের লাইনে। বেলা তিনটায় আলহামদুলিল্লাহ নোট গুনে বেরিয়ে এলাম সুস্থ মনে, সুস্থ মেজাজে।

এত বড় একটা ঘটনা শোনানোর উদ্দেশ্য হলো, আপনারা যেন মিলিয়ে নেন। এমন দিন আমাদের সবারই যায় মাঝেসাজে। কোনো কিছুই যেভাবে চাই, সেভাবে হয় না; যেমনটা ভাবি, তেমনটা হয় না; একটা বলও লাগে না ব্যাটে। মেজাজ খিঁচড়ে যায়, হতাশ লাগে, অসহায়তার প্রকাশ ঘটে দীর্ঘশ্বাসে বা গালিতে বা শক্ত কথায় বা ঝগড়ায়। বড় ধরনের সিনক্রিয়েট বা হাতাহাতির পর্যায়েও যায় প্রায়শই। ঐ দিন অলরেডি সাড়ে দশটা থেকে তিনটার মধ্যে বেশ কিছু বাকবিতণ্ডা হয়ে গেছে অফিসার-ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট-ক্লায়েন্ট। আলহামদুলিল্লাহ ঐ ফটোকপি'র দোকানে একবার রাগ হবে হবে মনে হচ্ছিলো। আর ব্যাংকের মধ্যে এক হাফপ্যান্ট-পরা ক্লায়েন্ট দেখে একটু রাগ হচ্ছিলো, সরকারি অফিসে এসেছেন গোঞ্জির কাপড়ের হাফপ্যান্ট পরে, থ্রি কোয়ার্টারও না। বাকি সময়টা একেবারে খারাপ কাটেনি। হাশরের মাঠে পঞ্চাশ হাজার বছর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর এখানে ঘণ্টা দুয়েক পারবো না! এটা ভাবলে আর গায়েই লাগে না।

জীবন এক বিক্ষুব্ধ সাগর। উত্থান-পতনের প্যারাদক্সস্কুল এক যাত্রা। পজেটিভ-নেগেটিভ অনুভূতির মিশেলে এক পুঁতির মালা। পজেটিভ ফিলিংসগুলো যেমন আপনাকে সতেজ করে, নেগেটিভগুলো আপনাকে দমিয়ে দেয়, হতাশ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنَيْ صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا

অর্থ হলো, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, আমাকে ধৈর্যশীল বানাও এবং নিজের দৃষ্টিতে ছোট ও অন্যের দৃষ্টিতে বড় বানাও।' (মুসনাদুল বাযযার : ৪৪৩৯; সনদ হাসান) —সম্পাদক

কুররাতু আইয়ুন ২

করে, রাগিয়ে দেয়। কারও কথা, কারও কमेंট, কারও সাথে ঝগড়া, কারও মূর্খতা, কারও হঠকারিতা, কারও প্রতারণা, হয়রানি, অপেক্ষার প্রহর, কিছু না পাওয়ার বেদনা—এগুলো আপনার ভেতর জমে। একটা নেগেটিভ অনুভূতি, যেন বুক চেপে আসে, যেন মনটা তিতে-তিতে। এই অনুভূতিটা আমাদের ভেতর জমে, জমতেই থাকে; পরে একটা মানসিক বা শারীরিক ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পায়। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট Leon F. Seltzer, Ph.D. এই মানসিক তিক্ততাকে আমাদের প্রতি দিন অবদামিত রাগ-ক্ষোভের পরিণতি মনে করেন।^[১] তিনি বলেন, সময়ের সাথে আমাদের রাগগুলো পরিণত হয় তিক্ততায়। যার ফলাফল হয় চড়া মূল্যের। তিক্ততা থেকে যা যা হতে পারে উল্লেখ করেন:

- ৷ মানসিক ও আবেগিক যাতনা বাড়ায়।
- ৷ দীর্ঘমেয়াদী উদ্বেগ (anxiety) ও অবসাদ (depression) তৈরি করে।
- ৷ আরও প্রতিহিংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে।
- ৷ অতীতের তিক্ততার রোমন্থন বর্তমানের সুখকে শেষ করে দেয়।
- ৷ অনাস্থা থেকে সন্দেহ, সন্দেহ থেকে রাগ, রাগ থেকে হতাশা।
- ৷ সুস্থ সম্পর্ক তৈরিতে বাধা।
- ৷ তিক্ততা আমাদের স্ট্রেস বাড়ায়, ফলে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায় (chronic anger that is bitterness can raise your stress baseline, thereby taxing your immune system)।

সুতরাং এটা একটা বিরাট ইস্যু। জীবনযাত্রায় এই শত্রুগুলোর সাথে লড়াইয়ের জন্য, লড়াইয়ে জেতার জন্য এবং তিতকুটে মনকে ফ্রেশনেস দেবার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে ঝাঁটার মতো কয়েকটি অস্ত্র দিয়েছেন। একটি ঝাঁটা হলো ‘তাকদির’-এর কনসেপ্ট। জীবন প্রতিনিয়ত যে-পাওয়ার আমাদের দিকে ছুড়ে দেয়, সেগুলো ঠেকাতে একজন মুসলিমের জন্য এটা অনেক বড় ঢাল এবং এটা একজন মুসলিমের কাছে থাকতেই হবে, মাস্ট। তাকদিরের ভালোমন্দের উপর ঈমান আবশ্যিক, এতে অবিশ্বাসী কাফির। যা হয়েছে, তা হতোই; যা হয়নি, তা কখনোই হতো না, তা হওয়ারই ছিলো না—এটাই ঈমানের বাস্তবতা।^[২] যা পেয়েছি, তা আসতো; যেটুকু

[১] <https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201501/don-t-let-your-anger-mature-bitterness>

[২] মুসনাদে আহমাদ, তাবারানি; মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এর সূত্রে মুত্তাখাব আহাদীস, পৃষ্ঠা ৯৩, দারুল

গাবো, সেটুকু আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। আর যেটুকু হাতছাড়া হলো, তা কখনোই পেতাম না, লেখাই ছিলো না, পাবো কোথেকে! আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই তো সব লেখা, ^[১] আমার নামে ওটা লেখাই ছিলো না। সব প্রতারণার কষ্ট, লোকসানের কষ্ট, না-পাওয়ার বেদনা সব গলে পানি। সব স্ট্রেস, বুকচাপা কষ্ট শেষ।

আরেকটা ঝাঁটা হলো ‘রিযিক’-এর কনসেপ্ট। এই দুই ঝাঁটার বাড়িতে সাপটে দূর হয়ে যায় সব না-পাওয়ার বেদনা আর ভবিষ্যতের উদ্বেগ। রিযিক অবশ্য তাকদিরেরই অংশ। বিস্তারিতভাবে রিযিক, বয়স, লিঙ্গ ও চরিত্র মাতৃগর্ভে লিখে দেওয়া হয়। ^[২] আমার নামে বরাদ্দ রিযিক কেউ নিতে পারবে না। দোকানদার ঠকিয়ে দিলো বলে—মন খারাপ! যাহ, ওর রিযিক ও নিয়েছে, আমার থেকে তো যায়নি। আল্লাহ আমার মাধ্যমে ওকে ওর রিযিক ওকে পৌঁছে দিলেন—বাহ! আমার রিযিক যতক্ষণ না আমি পুরো করছি, আমার মৃত্যু হবে না, হতেই পারে না। ^[৩] আমার একটা ভাতের দানা, এক ঢোঁক পানি আমি না-খেয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো না। রিযিক ব্যক্তিকে ওভাবেই খুঁজে নেয়, যেভাবে মৃত্যু তালাশ করে। অতএব রিযিক নিয়েও এত টেনশনের কিছু নেই। সুন্নাহ হিসেবে রিযিক আসার রাস্তা খুঁজে নেবো, কিন্তু রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না বলে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। রাস্তা খোঁজার নামে হারামের দিকে যাওয়াটা তো আরও বোকামি। তাই টেনশনফ্রি নয়নজুড়ানো জীবনের জন্য তাকদির আর রিযিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন। ধারণার চেয়েও জরুরি হলো, শক্ত ঈমান রাখুন। আর ঈমান শক্ত করার উপায় হলো, কথায় কথায় তাকদির আর রিযিকের কথা আরেকজনকে বলুন। বলতে থাকুন, নিজের ঈমান বাড়বে।

আরেকটি অস্ত্র হলো, সামান্য-সামান্য এইসব ক্ষতি-কষ্টে মুমিনের গুনাহ গাছের ঝরাপাতার মতো ঝরে যায়, বিপদ উঠিয়ে নেওয়া হয়। মুসলমানের যে-কোনো ক্রান্তি-কষ্ট-রোগ-দুশ্চিন্তা-পেরেশানিতে, এমনকি সামান্য কাঁটা বিঁধে গেলেও, তার গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। ^[৪] এর চেয়ে কম কষ্টেও আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা বাড়তে থাকে।

কিতাব, রাবিগণ সিকাহ; আবু দাউদ, ৪৮০০

[১] মুসলিম

[২] বুখারি, কিতাবুল কদর

[৩] শারহুস সুন্নাহ ৩০৫/১৪, ইমাম বাগভি, হাদীসটি মুরসাল, রাবিগণ সিকাহ

[৪] আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

কুররাতু আইয়ুন ২

আল্লাহ আগেই আমার-আপনার জন্য একটি মর্যাদা ঠিক করে রাখেন, যদি আমার আমল কম হয়, যার দ্বারা ঐ মর্যাদা অর্জন সম্ভব না, তখন আল্লাহ অপছন্দনীয় ও কষ্টকর বিষয় পাঠান, যাতে এ-সবের উসিলায় আমি আমার ঐ অবস্থানে পৌঁছে যাই, সুবহানাল্লাহ। যে-কোনো নেগেটিভ ঘটনায় আপনি পাচ্ছেন পজেটিভ ফিলিংস।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-জন্যই আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, ‘মুমিনের ব্যাপারটাই কী আশ্চর্যের! তার সব কিছুতেই কল্যাণ আর কল্যাণ। আর এমনটা কেবল ঈমানওয়ালার ক্ষেত্রেই হয়। সচ্ছলতায় যখন সে শুকরিয়া আদায় করে, তাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে; আবার বিপদে আপদে সে যখন সবর করে, তাও তার জন্য কল্যাণকরই হয়।’^[১]

শহিদের হিসাব হবে, দানশীলেরও হিসাব হবে। এরপর তাদের আনা হবে, যাদের দুনিয়া কেটেছে বিপদে-আপদে। তাদের কোনো মিয়ানও নেই, বিচারও নেই। এরপর তাদের উপর এত নিয়ামত বর্ষণ করা হবে, যা দেখে, যারা নিরাপদে দুনিয়া কাটিয়েছে, তারা আফসোস করবে।^[২] আমার এখন এইটুকু কষ্ট সহ্য করার কারণে যদি গুনাহ মাফ হয়, বড় বিপদ কেটে যায়, আল্লাহর কাছে প্রিয়তর হই, হিসাব কমে যায়, তা হলে ক্ষতিটা কোথায়! যে-দিকে তাকাই শুধু লাভই লাভ।

আরেকটি অস্ত্র হলো, সিজদা। সব কষ্টের কথা এমন একজনকে বলা, যার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত যে, তিনি আপনাকে সমাধান করে দেবেন, সে ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহর পরিচয়ের অনুভূতি খুব ধারালো হতে হবে। শান দিতে হয়, নইলে ধার নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা, রাজত্বের ব্যাপ্তি, আদেশের ওজন, আল্লাহ আমার পক্ষে এলে আমার সমস্যাটা কী দাঁড়াবে, আর আল্লাহ আমার বিপক্ষে গেলে আমার কী হাল হবে—এই মোটা-মোটা কথাগুলো প্রতি দিন আলোচনা করা দরকার। নবীদের আল্লাহ কোনো মাধ্যম ছাড়া সাহায্য করেছেন, সাহাবীদেরকেও করেছেন, আমাকেও করতে পারেন। আমার এই সমস্যা থেকে

করেছেন, ‘যে-কোনো মুসলিম দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তা একটা কাঁটা কিংবা আরও ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহগুলো মুছে দেন, যেমন গাছ থেকে তার পাতাগুলো বারে পড়ে।’ (সহিহ বুখারি, হাদীস নং ৫৬৪৮)—সম্পাদক

[১] মুসলিম : ২৯৯৯

[২] তাবারানি কাবীর, একজন রাবি, মুজাআ বিন জাবিরকে ইমাম আহমাদ বলেছেন সিকাহ; দারা কুতনি বলেছেন, যয়িফ

মেনথল-জীবন

উত্তরণ আমার কাছে কষ্টসাধ্য, আল্লাহর কাছে স্নেহ একটা ‘কুন ফাইয়াকুন’-ই তো। আমার চোখে কোনো উপায় আমি দেখি না, আল্লাহর কাছে এই কাজ হাসিলের উপায়ের অভাব আছে! মানুষের অন্তর তাঁর দুই আঙুলের ফাঁকে—তিনি মুকল্লিবুল কুলুব—হৃদয়সমূহের রাজাধিরাজ। নবী-সাহাবীদের সাথে কুদরতের কারিশমাগুলোর কথা যত আওড়াবেন, তত আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ও পোক্ত হবে—আস্থা বাড়বে। এই আস্থার লেভেল নিয়ে সিজদায় লুটিয়ে আপনার সমস্যার কথা বলবেন, বিচার দেবেন, হাউমাউ করবেন। মন ফ্রেশ তো হবেই, কুদরতের খেলও দেখতে পাবেন, ইন শা আল্লাহ। শুধু সেই তাঁকে একটু আমার পক্ষে আনতে পারলেই ‘কেল্লা ফতেহ’। তিনি আমার তো, সব আমার। কীভাবে পক্ষে আনবো তাঁকে? কীভাবে হবো তাঁর ভালোবাসার পাত্র? ‘হে নবী আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতেই চাও, তবে (শর্ত হলো, কুনতুম [তোমরা]) আমার (মানে, নবীজির) ইত্তেবা করো। তা হলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহগুলো মাফও করে দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।’^[১] ‘ইত্তেবা’ শব্দের অর্থ copying (ছবছ নকল করা); following the example of (কারও দৃষ্টান্ত মোতাবেক কাজ করা); imitation (অনুকরণ করা); patterning after (copy the actions of, ছবছ কারও কাজ নকল করা); taking after (resemble, দেখতে একই রকম হওয়া)।^[২]

আরেকটি হলো, সবাইকে মাফ করে দেওয়া। সাইকোলজিস্ট Leon F. Seltzer, Ph.D. সাহেবও ক্ষমা করে দেওয়াকে বলেছেন সর্বোচ্চ একক প্রতিষেধক (It's the single most potent antidote)। যে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি মাফ করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি মাফ করবেন।^[৩] আর কিছু চাই? এক সাহাবীকে পরপর ৩ দিন নবীজি জান্নাতি আখ্যা দিলেন। জান্নাতের লোভে-লোভে আরেক সাহাবী গিয়ে উঠলেন তাঁর বাসায়—কী আমল করে জান্নাত পেয়ে গেলো, দেখি! আমরা খালি দুনিয়ার লোভে ছুটি, দুনিয়া তো লোভ করার জিনিসই না। মশার

[১] আল-ইমরান : ৩১

[২] <http://www.thesaurus.com/browse/pattern%20after>

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/اتباع/>

[৩] ইবনে হিব্বান, সনদ সহিহ

কুররাতু আইয়ুন ২

পাখার জন্য লোভ,^[১] পাচাগলা বকরির জন্য আমাদের লালচ,^[২] ধোঁকা খাওয়ার জন্য আমাদের যত আগ্রহ।^[৩] আর সাহাবীরা অনন্ত-অব্যয়-অক্ষয় জান্নাতের জন্য লোভ করতেন, যার প্রস্থই আসমান-জমিনের দূরত্ব; না জানি দৈর্ঘ্য কত! তো তিন দিন মেহমান হয়ে দেখলেন, তেমন কোনো বিশেষ আমল তো মজরে এলো না, জান্নাত পেলো কীভাবে? জিজ্ঞেস করলেন, জবাব এলো—আমি কারও ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ রাখি না, কারও ব্যাপারে কোনো অভিযোগ রাখি না।^[৪] আহ, শান্তি! ফ্রেশ মন নিয়ে ঘুমান প্রতি রাতে। তাওহীদ মেনে নিলে আপনার সমাধানের অভাব নাই। সুবহানাল্লাহ।

সবচেয়ে বড় মোটিভেশন হলো আখিরাত। আখিরাতে আমি বেঁচে গেলাম, তো হয়ে গেলো আমার; মানুষ আমাকে দুনিয়ায় কিছু বললেই বা কী, না বললেই বা কী! এক তাবেঈকে কেউ ‘কুকুর’ বলে গালি দিলো। তিনি বললেন, ‘যদি আখিরাতে আমি বেঁচে যাই, তা হলে তোমার এই গালিতে আমার কী আসে-যায়। আর যদি না উতরে যাই, তবে তো আমি তোমার গালির চেয়েও খারাপ।’ এ-জন্য বেশি-বেশি আখিরাতের আলোচনার দ্বারা আখিরাতের অনুভূতিতে শার্প করতে হবে; তা হলে দুনিয়ার এ-সব গায়ে লাগবে না। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন—এটি কিন্তু শুধু মৃত্যুসংবাদের দুআ না, এটা সব মুসিবতের দুআ—যা-কিছু আপনাকে কষ্ট দেবে, বিপদ মনে হবে, অর্থের দিকে খেয়াল করে দুআটা পড়া উচিত। ‘অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর কাছে আমরা ফিরে যাবোই যাবো’—আপনাকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। আমি নিজেই থাকবো না, আমার এই বিপদ-সমস্যা-কষ্ট তো আমার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী, এটাও বিলকুল থাকবে না; বরং আমি সবর করি, এই অবস্থাতেই আল্লাহর শোকর করি,

[১] সাহল বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুল-হলায়ফা নামক স্থানে থাকাকালে একটি মৃত বকরি চিং হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। তিনি বলেন, ‘তোমাদের কী ধারণা, এই বকরিটা তার মালিকের কাছে তুচ্ছ নয় কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, এই মৃত বকরিটা তার মালিকের নিকট যতটা তুচ্ছ, অবশ্যই এই দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ। এ দুনিয়ার মূল্য যদি মশার একটি পাখার সমানও হতো, তা হলে তিনি কোনো কাফেরকে এখানকার পানির এক ঢোঁকও পান করাতেন না।’ (তিরমিযি ২৩২০, ইবনে মাজা ৪১১০, মিশকাত ৫১৭৭, সহিহা ৯৪০)

[২] রাসূলের চোখে দুনিয়া, কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., মাকতাবাতুল বায়ান

[৩] সূরা আলে ইমরান : ১৮৫, হাদীদ : ২০

[৪] মুসনাদে আহমাদ, সহিহ

মেনথল-জীবন

আমার আখিরাত বনবে। এই সমস্যা তো আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। আমার আল্লাহ যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখে খুশি হন, আমি কেন খুশি হবো না! আমিও খুশি আল্লাহ তোমার ফয়সালার উপর। কুল্লু খালাস॥

মানসিক এবং আত্মিক প্রশান্তি (ইতমিনান) এবং স্থিরতা (সুকুন)-কে আমি 'মেনথল ফিলিংস' হিসেবে কল্পনা করি। বুকের ভেতরটা মেনথল দিয়ে কেউ ধুয়ে দিয়েছে, এমন। তৃপ্তি+প্রশান্তি+স্বস্তি+স্থিরতা।

যে জীবন জুড়ায় প্রাণ, মেনথল-জীবন।

হারি-জিতি নাই লাজ

বাজার করার ব্যাপারে আব্দু খুব সতর্ক, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। নান্দে-নান্দে সাথে করে বাজারে নিয়ে যেতেন। সকাল-সকাল বাজারে যাওয়া, ফ্রেশ জিনিস কেনা, দানাদামি করে কেনা, স্থপ থেকে বেছে কেনা, ফল-সবজির গায়ে নিজের হাত লাগানো, টানটান লেবুর রস বেশি, ভারি ভারি কমলা-মাল্টার রস বেশি, বেগুনে ফুটো আছে কি না, আপেলে দাগ আছে কি না, চালে ছোট একটা কার্ড আছে কি না, দাম বলে একটু চলে আসার মতো ভঙ্গি করা, কানকো লাল দেখে নাছ কেনা—ইত্যাদি হরেক ট্যাকটিক্স শিখেছি আব্দার কাছে। কমপক্ষে যে-দিন অনেক বাজার, সে-দিন ফোন করে নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন, টেনে উঠোতান দুজন মিলে তিনতলার। ছোটবেলা থেকেই ছেলেবাচ্চাকে দিয়ে এই কাজগুলো করাবেন, পুরুষালি দায়িত্ববোধ (পুরুষত্ববোধ) গড়ে উঠবে। আমি পুরুষ, শক্তি খাটানো ও চেষ্টা বেড়ানোর কাজগুলো আমাকে করতে হবে।

কেনাকাটার কিছু বেসিক নিয়ম শিখেছি। দোকানি অলওয়েজ লাভ করতে চায়। যদি কোনোভাবে তার লাভের আওতায় থাকে, তা হলে সে কাস্টমার ফেরায় না; কেননা, তারও তো বেচতে হবে। লাভ কিছু থাকলে দিয়ে দেয়। আর দোকানি যদি বুঝে ফেলে জিনিসটা আপনার খুবই দরকার, তা হলে কমাতে চাবে না। দোকানি যদি বুঝে আপনার তেমন প্রয়োজন নেই জিনিসটা, তা হলে কমিয়েটমিয়ে নিজের কিছুটা লাভ রেখে গছিয়ে দিতে তৎপর হয়। বাচ্চা নিয়ে যাবেন না, কিছু পসন্দ করে বসলে দাম হাঁকাবে। কাপড়চোপড় ইত্যাদি, একটু লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে অর্ধেক দাম থেকে শুরু করলে জিতবেন। দুই-এক দোকান যাচাই করে

হারি-জিতি নাই লাভ

নেওয়া সুন্নাত।^[১] আবার দানাদানি করা সুন্নাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারজানা কিনতে গিয়ে দানদর করেছেন।^[২]

ফল-সবজি নিজে হাত লাগাবেন। বেগুনে কুটো খুঁজবেন, আপেলের বসা দাগ। ফল-সবজিতে দোকানদার সব সময় আপনাকে খারাপটা গছিয়ে দেবে, দেবেই। যেইটা সে নিজ হাতে দেবে, দেখবেন, ওটাই খারাপ। পেয়ারা ছোট ও নাদাগুলো ভালো। বড় পেয়ারা একটা পোকা হলো তো একবারে ৩০০ গ্রাম চলে গেলো; ছোট ও মাঝারি সাইজ পেয়ারা, একটু লম্বাটেগুলো মিষ্টি বেশি। কাঁচাল চেনা নিয়ে খুব অকূল পাথারে ছিলান, কোনো ভাবেই কোনো ফর্নুলা পাচ্ছিলেন না। চট্টগ্রামে চিল্লায় গিয়ে ফর্নুলা শিখে এলান। পয়লা দেখতে হবে ওজন, কম ওজন হলে ধরে নেবেন ভুসড়ো বেশি। বেশি ওজন মানে কোরা বেশি। দুই নম্বর হলো, কাঁটাগুলো ভোঁতা ভোঁতা, ছুঁচলো না। আর তিন নম্বর হলো, বোঁটা চিকন হবে। বোঁটা যদি মোটা হয়, ধরে নেবেন ভেতরের ভাঁটিটাও মোটা, কোরা কম। কমলা-নান্টা ভারি দেখে নেবেন, রস বেশি। লেবু নিতে হবে টানটান দেখে, বেশি রস। কলা বেশি নিলে সবুজগুলো নেওয়া ভালো, ধীরে-ধীরে পাকবে আর খাবেন। আর ইলিশ মাছ কিনতে হবে পিঠ মোটা দেখে, পিঠের দিক থেকে দেখে নিতে হবে।

আমার স্বশুর প্রবাসী। যুবক বয়স থেকে দাওয়াতি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আবার আরেক কিসিমের। অফিস শেষে সন্ধ্যা-রাতে বাজার সারেন। যখন ভালো জিনিস শেষ হয়ে যায়, পড়ে থাকে মালের মধ্যে খারাপটা, দোকানিও দিয়ে দিতে পারলে বাঁচে, বাড়ি যাবে বলে। দানাদানিও সেরকম করেন না, সুন্নাহ হিসেবে নামমাত্র। কেন? জিজ্ঞেস করলে বলেন, ‘কত টাকাই বা লাভ করে ওরা। আর দিনশেষে কিনলে তাকে একটু ইকরামও করা হলো, আমার কাছে শেষ মালটুকু

[১] সুয়াহিদ ইবনে কাহিস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজার নামক জায়গা হতে আনি ও মাখরাফা আল-আবদি রা. কিছু কাপড় আনদানি করলান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তিনি আমাদের নিকট হতে একটি পারজানা কেনার জন্য দানাদানি করলেন। আমাদের নিকটই একজন পরিণাপক উপস্থিত ছিলো। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে ওজন করে দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্রব্যের মূল্য পরিশোধকালে) পরিণাপককে বলেন, ‘ওজন করো এবং কিছুটা বেশি দাও’ (আস-সুনান, তিরমিযি : ১৩০৫, সহিহ) —সম্পাদক

[২] তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকিম সূত্রে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৫০, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ., সনদ সহিহ

বেচে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারলো। আবার আমার কাছে কমেও বেচলো। আমারও সবজির প্রয়োজন মিটলো, নেকিও পেলাম।’

আলহামদুলিল্লাহ। বাজার করে মন খারাপ কখনো হয়েছে কি না, মনে পড়ে না। এই দুনিয়াতে মুমিনের আবার হার-জিত কী? মুমিনের হার-জিত তো হাশরের মাঠে। এটা তো ঠকার জায়গা না যে, কেউ ঠকিয়ে দেবে। জেতার জায়গা না যে, জিতে গেলাম। নিচের বিষয়গুলো আদায়ের চেষ্টা করলে মন খারাপ থাকার কথা না বাজারে গেলে :

- ❧ দোকানিকে দাওয়াতের নিয়তে যাওয়া হলো। সালাত ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত নাসিহা করা হলো।
- ❧ কিছু সুন্নাহ জিন্দা করলাম ধরুন। একটু দামাদামি, একটু যাচাই। যে আমার সুন্নাহকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো; যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জালাতে থাকবে—^[১] ফিতনার যুগে একটি সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করা শহিদের সমান সওয়াবের কারণ হবে।^[২] উফ!
- ❧ গরিব মানুষ, ক টাকাই বা লাভ করে (মফস্বলের ক্ষেত্রে, কাঁচাবাজারে)। ঢাকার মধ্যসহযোগীরা অবশ্য প্রচুর লাভ করে। খুচরাওয়ালা আমার কাছে লাভ করে ঢাকায় বাড়িগাড়ি তো আর করছে না। কিছুটা ইকরামের নিয়ত আর কি। হয়তো আমার উসিলায় আজ বাসায় ভালো কিছু বাজার-সদাই করবে।
- ❧ কখনো যদি মনে হয় বেশি দাম নিয়েছে, তা হলে ভাববেন, ওর রিযিক ও নিয়ে গেছে। আমার রিযিক তো আর নেয়নি। আমার কী! আমার নিজের থেকে তো কিছু যায়নি। যেটুকু গেছে ওটুকু তো আমারই ছিলো না, ওরই তাকদিরের জিনিস ও নিয়েছে।
- ❧ খায়বারের যুদ্ধের পর এক সাহাবী এসে বলছেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজকে গনিমতের মাল বেচাকেনায় আমার মতো

[১] এই বর্ণনাটি ঠিক এইভাবে মিশকাত গ্রন্থে সুন্নাহে তিরমিযির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা নং ১৭৫। কিন্তু মূল সুন্নাহে তিরমিযিতে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সেখানে এভাবে আছে, ‘যে আমার সুন্নাহকে জিন্দা করলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো; যে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জালাতে থাকবে।’ (তিরমিযি : ২৬৭৮) ধারণা করা হয়, মিশকাতের সংকলক বা পরবর্তী কোনো লিপিকারের মাধ্যমে এই ভুলটি সংগঠিত হয়েছে। আর দুঃখজনক সত্য হলো, আমাদের সমাজে মিশকাত গ্রন্থটি অনেক বেশি চর্চিত হওয়ার কারণে ভুল বর্ণনাটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।—সম্পাদক

[২] মুসনাদে আহমদ : ২২০১৪, সহিহ

হারি-জিতি নাহি লাজ

লাভ কেউ করেনি। ৩০০ উকিয়া (১২ হাজার দিরহাম) লাভ করেছে।' নবীজি বললেন, 'এর চেয়ে লাভের জিনিসের কথা শুনবে? বলবো? এর চেয়েও লাভের জিনিস হলো, ফরজ নামাযের পর দুই রাকাত নফল।'^[১] আমলের চিরস্থায়ী লাভের সাথে পয়সার ক্ষণস্থায়ী লাভের কোনো তুলনা হয়?

৯ আমার উসিলায় আল্লাহ একটা পরিবারে রিযিক পৌঁছালেন। বাজারে যাবার দুআ পড়ে দশ লাখ নেকি কামালাম, দশ লাখ গুনাহ হটালাম, দশ লাখ প্রমোশন পেলাম;^[২] দাওয়াহ করলাম, কিছু সুন্নাহ জিন্দা করলাম—আমার তো পুরোটাই লাভ। সে তুলনায় ওর এই ক টাকা লাভ তো নগণ্য। আলহামদুলিল্লাহ। বলুন, বিক্রেতার এই দশ-পঞ্চাশ টাকা লাভের চেয়ে আমার লাভ কি কম?

সাহাবীরা এমন ছিলেন। দুনিয়ার লাভ গোনার লাইনে সহজ-সরল, আলাভোলা। ১০০০-এর উপরে যে সংখ্যা হতে পারে, এক সাহাবী জানেনই না!^[৩] কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই। দুনিয়া নিলে নিয়ে যাও, আমার আখিরাতের কোনো ক্ষতি বরদাশত করবো না। শাস্তি যা হবার দুনিয়াতে হয়ে যাক—ইয়া রাসূলুল্লাহ, যিনা করেছে, আমাকে রজম করে মৃত্যুদণ্ড দিন!^[৪] ইয়া

[১] আবু দাউদ, মুস্তাখাব-২৩৭

[২] তিরমিযি, হাদীসটি গারিব; মুস্তাখাব-৪৭৯

[৩] হিরা শহর বিজয়ের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা মোতাবেক হিরার রাজকন্যা শায়মা বিনতে বুকায়লাকে দেয়া হয় খুরাইম ইবনে আওস রা.-এর ভাগে। রাজকন্যার ভাই আবদুল মাসিহ নিজ বোনকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, 'খোদার কসম, আমি 'দশ শত'-এর কম নেবো না।' ফলে ১০০০ দিয়ে সে বোনকে ছাড়িয়ে নিলো। বাকি সাহাবীরা বললেন, 'আরে, তুমি যদি ১০০,০০০ চাইতে তবে ও তো তা-ই দিতো।' খুরাইম রা. বললেন, 'দশ শতের উর্ধ্বে কোনো সংখ্যা আছে, তা-ই তো আমি জানতাম না!' [আবু নুযাইমের সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৭, দারুল কিতাব]

[৪] মায়িজ বিন মালিক রা. আরেকজনের দাসীর সাথে নিজ যিনার কথা স্বীকার করে নিজের শাস্তি প্রার্থনা করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন, যাতে সে নিজে-নিজে তাওবা করে নেয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা সাহাবী চাচ্ছিলেন, যাতে রজমের দ্বারা নিহত করে তাকে পবিত্র করে দেওয়া হয়। প্রায়শ্চিত্ত দুনিয়ায় হয়ে যাক, আখিরাতে এই যিনার শাস্তি পেতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রজম করে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। [তিরমিযি ১৪২৭-১৪২৮]

আরেক মহিলা সাহাবীও (জুহাইনা গোত্রের) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রজমের শাস্তি বরণ করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রাজি থাকুন। তাঁর ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'এই নারী যে-বিশুদ্ধ তাওবা করেছে, সেই তাওবা ৭০ জন মদীনাবাসীর মাঝে বণ্টন করে

কুররাতু আইয়ুন ২

রাসূলুল্লাহ, উট চুরি করেছি, আমাকে পবিত্র করে দিন, হাত কেটে দিন আমার।^[১] আখিরাতে শাস্তি পেতে রাজি নই। এ-জন্যই তাবেঈ হাসান আল-বাসরী রহ. তাবে-তাবেঈনদের (স্বর্ণযুগের ৩য় প্রজন্ম) উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—‘তোমরা সাহাবীদের দেখলে মনে করতে পাগল, আর তাঁরা তোমাদের দেখলে বলতেন, ‘আখিরাতে তোমাদের জন্যে কিছুই নেই।’^[২] দুনিয়া নিয়ে হা-হুতাশ নেই, আর আমরা হনাম উল্টো। আবার বড়-বড় কথা— ‘সীরাতাল লাযিনা আনআমত আলাইহিম’। ভাবছি, ১৪০০ বছর পরের এই আমাদের দেখলে সাহাবীরা কী বলতেন?

তাবলিগে সময় দিয়ে আসার পর আমার আকবাও কেমন যেন হয়ে গেছে। দামাদামি আগের মতো করে না। বেগুনে পোকা মেলে, আগে চিন্তাও করা যেতো না। আলাভোলা, দুনিয়ার ব্যাপারে ঠনঠনে, আখেরাতের ব্যাপারে টনটনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুমিনের ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্যের। তার সব কিছুই কল্যাণ আর কল্যাণ। আর এমনটা তো কেবল ঈমানওয়ালারই হয়। স্বচ্ছলতায় সে শুকরিয়া করে, তাতেও তার কল্যাণই হয়। আবার বিপদে আপদে সে সবার করে, তাতেও তার কল্যাণই হয়।^[৩] মুমিন আবার হারে নাকি? কোনো লোকসান হয় নাকি কোনোদিন? কখনো? সুবহানাল্লাহ।

দিলে, দবার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। [মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযি ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবু দাউদ ৪৪৪০, ইবনে মাজা ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, দারেমি ২৩২৫ (iHadis)]

[১] আমর ইবনে সামুরা রা. এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি, আমাকে পবিত্র করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে খবর পাঠালে তারা জানালো যে, আমাদের একটা উট হারিয়েছে। সুতরাং নবীজীর আদেশে আমরা রা. এর হাত কেটে দেয়া হলো। তিনি নিজের কাটা হাতকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন তোমার থেকে। তুমি তো আমাক্র শরীরকে আগুনে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলে। [হযরাতুস সাহাবাহ ১/৩৭৪]

[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুয়াইম : ২/১৩৪

[৩] মুসলিম ২৯৯৯

সাদাসিধে জীবন

মানুষের ব্যক্তিজীবনকে সবচেয়ে বেশি স্ট্রেসে ফেলে দেয় ‘লৌকিকতা’, সোজা বাংলায়—‘লোকে কী মনে করছে/করবে’। আরও আটপৌরে বাঙলায় বললে ‘কেমন দেখা যায়?’ বা ‘তারপরও কেমন না ব্যাপারটা?’ বা ‘সমাজে অবস্থান ধরে রাখা’ বা ‘স্ট্যাটাস’। এ-বিষয়টার জন্য মূল জিনিসের তিন গুণ খরচ বাড়ে। যদি ১০ টাকার জিনিসে কাজ হয়, তো ৩০ টাকার জিনিসটা কিনতে হয়, বাকি ২০ টাকা হলো ‘কেমন দেখা যাবে’র দাম। প্লেটের মাকসাদ খাওয়া/খাওয়ানো। মেলামাইন হলেও হয়, কিন্তু ‘লোকে বলবে কী’র জন্য চিনেমাটি না হলে হচ্ছে না।

এই শো-অফ মেটাতে গিয়ে জীবন হয়ে গেছে কঠিন। বাচ্চাদের জীবনও কষ্টকর হয়ে যায় আমাদের শো-অফ মেটাতে গিয়ে। এখন তো ‘আমি স্কয়ারে চিকিৎসা করাই’ বা ‘আমি ঢাবি মস্কে জুমআ পড়ি’ বা ‘আমার মেয়ে ডিকারুননিসায় পড়ে’—এগুলোও শো-অফের জন্য হয়ে গেছে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো শো-অফটাও একটা চাহিদা হয়ে গেছে। বাসার কাছে মিরপুর ল্যাবএইডে যে-টেন্ট করলেই চলতো, সেটা পান্থপথে স্কয়ারে করাচ্ছি; এই চাহিদাটা মেটাতে—(টাকা+কষ্ট) এক্সট্রা যাচ্ছে। বাড়ির পাশে জুমআ পড়লেই হতো, সেটা পড়ছি ঢাবি বা বাইতুল মোকাররমে গিয়ে (খরচ+কষ্ট); যাচ্ছি তো সেই খুতবার ঠিক আগেই। উত্তরা থেকে মেয়েটাকে ডিকারুননিসায় আনা-নেওয়া করছি, জ্যামে নিজেও কষ্ট করছি, বাচ্চাটাকেও কষ্ট দিচ্ছি (খরচ+কষ্ট)।

৩ তো এই এক্সট্রা খরচের জন্য বেশি টাকা কামাই করতে হচ্ছে।

৩ বেশি কামাইয়ের জন্য এক্সট্রা এফোর্ট ও সময় লাগছে (শ্রম বেশি+রেস্ট কম)।

৩ এক্সট্রা কামাইয়ের রাস্তা খুঁজতে হচ্ছে (দুর্নীতি+ব্যস্ততা+স্ট্রেস)।

নিজের শরীর-মন শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে, আখিরাত বরবাদ হচ্ছে, ছোট-ছোট কত সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তাতে কী হয়েছে, মানুষ তো ভালো বলছে। মুখ তো রক্ষা হচ্ছে। আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে আমরা লৌকিকতা

রক্ষা করছি—হোম লোন, কার লোন। আমার একটা গাড়ি না-থাকলে কেমন দেখার; অমুকের আছে, আমার নেই, লোকে ভাববেটা কী! হি হি। অমুকে দুইতলা করে ফেলেছে, আমি এখনো কিছুই করতে পারলাম না। ন্যাও, সুদে লোন।

দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতা, দেখানোর প্রতিযোগিতা, দেখিয়ে দাও অদেখা তোমার। দুনিয়াতে এই প্রতিযোগিতার কোনো শেষ নেই—তৃপ্তি হয় না, সাধ মেটে না। ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের জীবনে উপনীত হও।’^[১] এই একটা জিনিসই আপনার সব কেড়ে নিয়েছে, এই প্রতিযোগিতাই আপনাকে ২৪ ঘণ্টা খাটায়, একদণ্ড বিশ্রাম দেয় না, ঘুমের ভেতরেও আপনাকে ছাড়ে না। জীবন থেকে এই একটি জিনিস বাদ দিতে পারলে দেববেন, সুখ-আরাম-মৌজ-সময়—কোনো কিছুর অভাব নেই। লোকে যা ইচ্ছা বলুক, আমি দুনিয়াতে মুসাফির। যেটাতে আমার কাজ হয়ে যায়, ওটুকু হলেই আমার চনবো। কে কী ভালো, আড়ালে কী বললো, তাতে আমার ব্যয়েই গেলো। আমি কাছেই টেস্ট করাবো, কাছেই জুমআ পড়বো, আমার বাচ্চাটা কাছে মণিপুর স্থলেই পড়বে। এক-একটা জিনিস বাদ দিলে আপনার হাতে অটেল সময়। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম-সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য অবসর হতে নাও, আমি তোমার হৃদয়কে ঐশ্বর্যে এবং দুই হাতকে রুজিতে ভরে দেবো। হে আদম-সন্তান, আমার থেকে দূরে সরে যেয়ো না; নইলে তোমার হৃদয়কে ভরে দেবো অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে ভরে দেবো কর্মব্যস্ততা দিয়ে।’^[২] তুমি সময় পাবে না; বলবে, আমার দম ফেলার সময় নেই। জীবন হবে সংকীর্ণ, মনে হবে বুকের ওপর ভারি বোঝা, দম যেন আটকে আসে। ‘আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ হতে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়া হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো।’^[৩] মানুষ যখন দুনিয়াকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়, তখন

[১] সূরা তাকসুর : ১-২

[২] হাকেম : ৭১২৬, তাবারানি ১৬৮১৪, সিনসিনাহ সহিহা ১৩৫৯ (iHadis)

অনুব্রূণ হাদীস: আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে আদম-সন্তান, তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য স্টেট করো, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করে দেবো। তুমি তা না-করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করবো না। (ইবনে মাজাহ ৪১০৭, তিরমিযি ২৪৬৬)

[৩] সূরা হুহা : ১২৪

সাদাসিধে জীবন

তার অন্তর শত-শত পেরেশানি-টেনশন দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া হয় এবং রিথিক ও যতটুকু লেখা ততটুকুই; অর্থাৎ রিথিক-জীবন দুটোই এঁটে আসে, সংকীর্ণ হয়ে যায়। আর যার লক্ষ্য হয় আখিরাত, আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী বানিয়ে দেন এবং দুনিয়া অপদস্থ হয়ে তার কাছে হাজির হয়।^[১]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪০০ বছর আগে প্রশান্তিময় জীবনের সূত্র নিজে করে দেখিয়ে হাতেকলমে শিখিয়ে গিয়েছিলেন— ‘নিশ্চয় সাদাসিধে জীবন ঈমানের অঙ্গ, অবশ্যই সাদাসিধে জীবন ঈমানের অঙ্গ।’ এই পৃথিবীতে আমার মুসাফিরের জীবন। এখানে সাজাতে আসিনি, কাউকে দেখাতে আসিনি, কারও সাথে টক্কর দিতে আসিনি, চলে যাবো, থাকবো না। জীবনে চাওয়া-পাওয়া যত কম রাখবো, প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহ তত উপভোগ্য করে দেবেন। অন্তরের তৃপ্তিই আসল সম্পদ। অন্তরের দারিদ্র্যই প্রকৃত দারিদ্র্য। দেখি চলুন প্রশান্তির জীবন কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী।

খাওয়া-দাওয়া

যেমন ধরুন, আমাদের বাংলাদেশিদের খাবারের অভ্যাস। আমাদের দুপুরে-রাতে ৩ পদের তরকারি না হলে হয়ই না—ভাতের সাথে একটা সবজি, একটা ডাল, আরেকটা প্রাণিজ আমিষ। আবার আমরা খাইও ৫ বেলা—সকাল-দুপুর-রাত, দুটো স্ন্যাক্স। মধ্যপ্রদেশের ভূপালের জামাতের সাথে ছিলাম, শ্রেফ দুই বেলা খায়, দুপুরের খাবার ১১ টায়, রাতের খাবার মাগরিবের পর। এর মাঝে খিদে পেলে চা খায়। আর সকালে ফজরের পর চানাচুর-বিস্কুট-ছোলামুড়ি টাইপ কিছু। সকালে পরোটা-গোশত সামনে দিলে বলে, ‘এটা নাশতা হলো? এটা তো খানা! নাশতা তো হবে ছোটমোটা।’ আমাকে বললো, ‘আপনারা দিনের বেশির ভাগ সময় খাবারের পেছনে মেহনত করেন। আপনাদের মহিলারা সারা দিন খাবারের ফিকির করেই জীবন পার করে দেয়।’ কী আর বলবো! কথা তো বেসিক্যালি মিথ্যা না।

সাহাবাদের খাবারের আইটেম কতগুলো হতো? উমর রা. এক তরকারির বেশি খেতেন না। ছেলের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে তরকারি দেখেই—

[১] যে-ব্যক্তির দুনিয়াটাই হলো একক উদ্দেশ্য, আল্লাহ তার প্রতিটি বিষয়কে বিস্তৃৎকল করে দেন। দু জাহের সামনে শুধু অভাব-অনটন লাগিয়ে রাখেন। আর নির্ধারিত বস্তু ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছুই তার কাছে আসে না। যে-ব্যক্তির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আখেরাত, আল্লাহ তার প্রতিটি বিষয় সুস্থংকল করে দেন। তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে দেন। আর দুনিয়ার সম্পদ তার সামনে লাক্ষিত অবস্থায় হাজির হয়। [ইবনে হিব্বান সূত্রে সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব ৯০ (iHadis)]

‘কী এটা?’

‘আব্বা, গোশত কম দামে পেয়েছি। সিরকা দিয়ে রান্না করেছি।’

‘গোশত এক সালুন, সিরকা নিজেই আরেক সালুন। আমি দুই তরকারি একই বৈঠকে খাবো না।’

এই হলো যাদের আমরা অনুসরণ করি বলে দাবি করি, তাদের জীবনচিত্র। নবীজি ও সাহাবাদের খাবার বা তরকারির দিকে তাকালে যে-চিত্র পাওয়া যায় রাফলি যে, খাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি বদারড তাঁরা ছিলেন না। যা পাওয়া যেতো, তা-ই দিয়ে কিছু একটা বানিয়ে খেয়ে উঠতেন। খাবারকে স্বতন্ত্র ফিকির হিসেবে খুব একটা নিতেন বলে আমার মনে হয়নি। ওটা খেতে হবে, এ-জন্য বাজারে গিয়ে এটাসেটা কিনে আনতে হবে, এমন না। কখনো ছাগল আছে, যব আছে; তো গোশত-রুটি হয়ে গেলো। কিছু নেই, তো খেজুর-পানি দিয়েই কাজ চলে গেলো একবেলা। শুধু যব আছে ঘরে, তো একটুটা ফিকির নেই; যবের রুটি বানিয়ে ঘি বা সিরকা দিয়ে এক বেলা কাজ সেরে নিলেন। আবার কখনো আটা, ঘি, পনির, মধু, গোশত একসাথে মিলিয়ে সারিদ বানিয়ে নিতেন—গোশত আলাদা রুটি আলাদা পাকানোর ঝামেলা নেই। কখনো কেবল দুধই এক বেলার খাবার। কখনো বা নাবিজ (খেজুরের শরবত)। কখনো ঘি-পনির-খেজুর দিয়ে হালুয়া, এটাই প্রধান আইটেম সেই বেলায়। কোনো হাস্যামা নেই, একটুটা গ্যাঞ্জাম নেই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে। কিছু একটা হলেই হলো! তবে নবীজি শখ করে ভালো খাবার খাননি, তাও কিষ্ট না। একবার ঘিয়ে-ভাজা মধু-মাখা রুটি খেতে ইচ্ছে করেছিলো, উসমান রা. নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তা খেয়েছিলেন, কিংবা গরিবদের দিয়ে দিয়েছিলেন, একটু বিভিন্ন মত আছে। তবে এটা অভ্যাস ছিলো না, অকেশনাল। জীবন-জীবিকার ফিকিহ সম্পর্কে সম্যক চিত্র পেতে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর জীবিকার খোঁজে বইটি না-দেখলেই নয়।^[১] প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের বইটি পড়া প্রয়োজন।

তো কয়বেলা খেতেন তাঁরা? আন্মাজান আয়েশা রা. থেকে জানা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দিনই দুইবেলা গমের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি।^[২] আনাস ইবনু মালেক রা. বলেন, ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল ও রাতে একত্রে রুটি ও গোশত খেতে পারেননি, অবশ্য বড়

[১] মাকতাবাতুল বায়ান থেকে প্রকাশিত

[২] বুখারি ও মুসলিম

সাদাসিধে জীবন

জামাতের সাথে হলে ভিন্ন কথা।^[১] মনে হচ্ছে, হয়তো তাঁরা দুই বেলাই খেতেন। নবীজি ক্ষুধা লাগিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, ক্ষুধা না-লাগতেই খাওয়াকে অপছন্দ করেছেন। সে-দিক থেকে দেখলে দুই বা তিনবেলার বেশি খেলে ক্ষুধা ছাড়ই ভরা পেটেই আবার খাওয়া লাগে।

কতটুকু খাবো তাহলে? উমর রা. ১১ লোকমা খেয়ে বাকিটুকু পরের দিনের জন্য রেখে দিতেন। তাঁর জন্য রোজানা তিনটি রুটি বরাদ্দ থাকতো। কোনো দিন দুধ ও ঘি দিয়ে, কোনো দিন নরম গোশত দিয়ে, কোনো দিন কেবল যাইতুনের তেল দিয়ে খেতেন। নবীজির স্পষ্ট নির্দেশনা আছে খাবারের পরিমাণের ব্যাপারে; তিন ভাগের এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি আর একভাগ শ্বাসের জন্য,^[২] এটুকু ভরে গেলে হাঁসফাঁস করবেন। আন্মাজান আয়েশা রা. তো বলেই দিয়েছেন, ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর প্রথম যে বিদআত প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো, পেট ভরে ঠেসে খাওয়া।^[৩] মানে, সাহাবীদের কমন অভ্যাস ছিলো পেট ভরে না-খাওয়া; খাবো কিন্তু পেট ভরবে না। বিস্তারিত পাবেন সালাফদের ক্ষুধা বইটিতে,^[৪] ইবনু আবিদ দুনইয়া রাহিমাহুল্লাহর।

নবীজি আর সাহাবাদের এই অভ্যাসকে আবার চরমপন্থা মনে করবেন না, ওনারা একটু ‘বেশি-বেশি’—ভাবার কোনো কারণই নেই। বরং নবীজির এবং তাঁর অনুকরণে সাহাবাদের সকল অভ্যাসকেই মধ্যপন্থা বলে। মধ্যপন্থারও মধ্যপন্থা খুঁজেই তো আমাদের এই দশা, আমাদের দুই হাতের কামাই।

গোশাক

কাপড়চোপড় এতটা ফ্যাশনেবল না-হওয়া চাই, যাতে অহংকার এসে পড়ে, মনের ভেতর ভাব এসে পড়ে। আন্মাজান আয়েশা রা. একবার নতুন কাপড় পরে ঘরের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বারবার নিজেকে দেখছিলেন, আর ভেতরে-ভেতরে একটু-একটু সপ্রশংস অনুভূতি হচ্ছিলো বেশ। বাবা ঢুকলেন ঘরে এমন সময়—

[১] আনাস ইবনে মালিক রা. ও হাসান আল-বাসরি রহ. থেকে বর্ণিত, সালাফদের ক্ষুধা, ইবনে আবিদ দুনইয়া রহ., হাদীস নং ১৮৭ ও ১৬, সীরাত পাবলিকেশন

[২] ইবনে মাজা ৩৩৪৯, তিরমিযি ২৩৮০, সিলসিলাতুস সহিহা ২২৬৫ (iHadis app)

[৩] ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ৩/১৩১ সূত্রে সালাফদের ক্ষুধা

[৪] সীরাত প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে

‘হে আয়েশা, তুমি কি জানো, এই মুহূর্তে আল্লাহ তোমার দিকে দৃষ্টিই দিচ্ছেন না!’

‘কেন, বাবা?’

‘কেননা, দুনিয়ার সাজসজ্জা দ্বারা যখন বান্দার অন্তরে গর্বের সঞ্চার হয়, তখন রাবের কারিম আর তার প্রতি নজর দেন না, যতক্ষণ না সে সেই সাজ পরিত্যাগ করে।’^[১]

তাদের মনে আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির চেয়ে বড় আর কিছু ছিলো না, সাথে-সাথে খুলে সেই কাপড় সদকা করে দিলেন। যে পোশাকের জন্য আল্লাহ নারাজ, সে পোশাকই রাখবো না ছাতার মাথা।

তবে আবার এমন পোশাক পরা উচিত হবে না, যাতে আল্লাহর না-শোকরি প্রকাশ পায়। তিরমিযী শরীফে এসেছে, ‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে নিজ নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন।’^[২] তাই পোশাক এমন হওয়াও জরুরি, যাতে আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণণ প্রকাশ পায়। ঈদে, জুমআয় আর কোনো ফরেন ডেলিগেট টিম এলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সবচেয়ে উত্তম কাপড়টা পরতেন এবং বিশিষ্ট সাহাবাদেরও সবচেয়ে ভালো পোশাক পরতে বলতেন।^[৩]

এক সাহাবী বলেন, ‘আমাকে খুবই পুরাতন পোশাক পরে থাকতে দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার ধন-দৌলত আছে?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে উট, ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পদই দিয়েছেন।’ তিনি বললেন, ‘তা তোমার শরীরে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।’^[৪] মানে, আল্লাহ যে তোমাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, সেটা তোমার পোশাকআশাকে ফুটে ওঠা উচিত। আমাদের উলামায়ে কিরামকে দেখেন। তারা যে খুব দামি দামি পোশাক পরেন, তা কিন্তু না; তবে রুচিশীল, সফেদ, টিপটপ। খুব কম আলিমকেই আমি ইস্ত্রি-ছাড়া কাপড় পরতে দেখেছি। ইসলামকে প্রেজেন্ট করার ব্যাপার আছে। এক কালারের পায়জামা, আরেক সেটের কোর্তা না-পরাই শ্রেয়। অবশ্য সাদা আর কালো পায়জামা যে-কোনো কালারের কোর্তার সাথেই পরা চলে।

[১] জাযিউল আহাদীন, সুয়ুতি : ১১৫৯৮ এবং হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১, দারুল কিতাব

[২] তিরমিযি ৫/১২৩, হাসান

[৩] তাবাকাত ইবনে সা’দের সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, নবীজি ও সাহাবীদের পোশাকের ব্যাপারে আদত অভ্যাস অধ্যায়

[৪] তিরমিযি ২০০৬

ক্রেমন পোশাক

কাপড় একটু ছিঁড়ে গেলেই পরতে আমাদের প্রেস্টিজে বাধে। যদি প্রেস্টিজে বাধে, তা হলে সেটা মাঝে-মাঝে পরা চাই। শাইখ উমায়েরের মুখে শুনেছি, ‘মাঝে-মাঝে অপছন্দের কাপড় পরবেন, তালি দেওয়া-রিফু করা কাপড় পরবেন, অহংকার দূর হবে। প্রাইভেট করে চড়া যার অভ্যেস, সপ্তাহে দু-এক দিন লেগুনাতে চড়বেন।’

আলি রা. বললেন উমর রা.-কে, ‘যদি আপনি আপনার দুই সাথির সাথে (নবীজি ও আবু বকর) মিলিত হতে চান, তবে আশা ছোট করুন, তৃপ্তি ভরে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, তালিযুক্ত কাপড় পরুন, লুঙ্গি নুইয়ে পরুন, সেলাই-করা জুতো ব্যবহার করুন।’^[১] আচ্ছা, আমরাও কি চাই নবীজি ও আবু বকরের সাথে গিয়ে মিলিত হতে? তা হলে আমাদের জন্যও একই নাসিহা নয় কেন?

আলি রা. তখন খলিফা, একজন এসে শুধালো, ‘মুমিনদের আমির, আপনার মতো সম্মানী মানুষ কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরেন কেন?’ জবাব হলো, ‘এতে অন্তরে খুশু (বিনয়) আসে, আর মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়।’^[২] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সুহরাতাইন’ পরতে নিষেধ করেছেন;^[৩] মানে, এত জীর্ণ না-পরা, যাতে লোকেরা আঙুল উঁচিয়ে কানাঘুসা করে; আবার এত জাঁকজমকওয়ালা না-পরা, যাতে আঙুল তুলে কানাঘুসা করে। তার মানে দাঁড়ালো—ইসলাম হলো, ব্যালেন্স। ইবনে উমর রা. যেমনটা বলেন, ‘এমন কাপড় পরবে, যাতে বেকুবেরা তোমাকে তুচ্ছ মনে না-করে (যারা কাপড় দেখে মানুষকে মূল্যায়ন করে); আবার ধৈর্যশীলরাও তোমার উপর অসন্তুষ্ট না-হয় (মনে না করে, তুমি দুনিয়াদার)।’^[৪] ‘কেমন সেটা’ জানতে চাইলে বললেন, ‘৫ থেকে ২০ দিরহামের কাপড়।’

আম্মাজান আয়েশা রা.-কে কাসির বিন ওবায়দ রহ. জিজ্ঞেস করলেন, ‘আম্মাজান, আপনি কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরেন, এটা যদি লোকে জানে, আপনাকে কৃপণ ভাববে যে!’ তিনি বললেন, ‘রাখো তোমাদের ভাবাভাবি; যে

[১] তাখ্বিল গাফেলীন

[২] আবু নুআঈম সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৪, দারুল কিতাব।

[৩] বাইহাকি সূত্রে জামিউস সাগির, ইমাম সুয়ুতি; জীবিকার খোঁজে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ., মাকতাবাতুল বায়ান, পৃষ্ঠা ১০৫

[৪] আবু নুআঈম সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫, দারুল কিতাব

পুরনো কাপড় পরে না, সে নতুন কাপড়ের আনন্দ বুঝবে কীভাবে?’^[১] সময় বুঝে নতুন-পুরনো সব ধরনের কাপড়ই পরবো। উমর রা.-এর কাছে এক মহিলা এসে—

‘হে আমির, আমার কাপড় ছিঁড়ে গেছে।’

‘কেন, আমি না নতুন কাপড় দিলাম তোমাকে!’

‘জি, ওটাই ছিঁড়ে গেছে।’

‘আচ্ছা, তা হলে এটা নাও। আর এই নাও সুতা। পুরনোটাও রিফু করে নিয়ো। রান্নাবান্নার সময় পুরানোটা পরবে, আর কাজকর্ম শেষ হলে নতুনটা পরবে, কেমন? পুরনো কাপড় না-পরলে নতুনের কদর বুঝে আসে না।’^[২]

আর পুরনো কাপড় দান করে দেওয়া তো মারাত্মক আমল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নতুন কাপড় আনিয়ে মাথা গলিয়ে পরলেন এই দুআ পড়তে-পড়তে:

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উওয়ারী বিহী আউরতী ওয়া আতাজান্নালু বিহী ফী হয়াতী।

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এই পোশাক পরালেন, যেটা দিয়ে আমি লজ্জাস্থান ঢাকি এবং দুনিয়ার জীবনে সাজসজ্জা করি।’

এরপর বললেন, ‘সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে-কোনো মুসলিম নতুন কাপড় পরে এই দুআ পড়ে, যা আমি পড়লাম, এরপর খুলে-ফেলা পুরাতন কাপড়টা কোনো গরিব মুসলিমকে আল্লাহর ওয়াস্তে পরিয়ে দেবে; যত দিন সেই কাপড়ের একটি সুতাও তার শরীরে অবশিষ্ট থাকবে, ঐ পোশাকদাতা আল্লাহর হেফাজতে-আশ্রয়ে-দায়িত্বে থাকবে—চাই সে জীবিতই থাকুক কিংবা মারাই যাক। জীবিত থাক, বা মারাই যাক। জীবিতই থাক অথবা মারাই যাক।’^[৩]

কয়টা পোশাক

শামায়েলে তিরমিযী বা ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা পড়লে ধারণা করা যায়, নবীজির একাধিক পোশাক ছিলো। কোর্তাগুলো কোনোটা টাখনু অবধি, কোনোটা অর্ধগোছা এবং বিভিন্ন দামের। দামিও ছিলো, আবার কম দামেরও ছিলো। নতুনও, আবার পুরানোও। আলি রা. ৩/৪ দিরহামের

[১] আদাবুল মুফরাদ সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬, দারুল কিতাব

[২] বাইহাকী সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭, দারুল কিতাব

[৩] তাবারানি, হাকেম, বাইহাকী সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬০, দারুল কিতাব

সাদাসিধে জীবন

কাপড় পরেছেন, আবার ইবনু আওফ রা. ৪০০-৫০০ দিরহামের কাপড় পরেছেন, আবার ইবনু আব্বাস রা. ১০০০ দিরহামের কাপড়ও কিনেছেন। তবে তাঁরা কাপড় পরতেন ভয়ে-ভয়ে, পাছে আবার দাস্তিক ও অহংকারী হয়ে না যান।^[১] এই ভয়েই কেউ কম মূল্যের কাপড় পরাকেই বেছে নিয়েছেন, কেউ বহু তালিদার কাপড়, কেউ এক পিস কাপড়কেই নিজের জন্য যথেষ্ট ভেবেছেন। সব কিছুর পেছনে আল্লাহর ভয়।

আর ঘরের মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে কিছুটা প্রশস্ততা দিতেন সাহাবীরা, মেয়েদের একটু পোশাক-আশাকের প্রতি আগ্রহ থাকেই। ইসলাম তো ফিতরাতেরই দ্বীন, তবে লাগামছাড়া না। মুহাম্মাদ ইবনু রাবিআহ ইবনু হারিস রহ. বলেন, ‘নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা তাঁদের স্ত্রীদেরকে কাপড়চোপড়ে এতখানি সচ্ছলতা দিতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের পর্দা, মানমর্যাদা ও সাজসজ্জা মেইনটেইন করতে পারেন।’^[২]

ঘরবাড়ি

মুসলমানের টেম্পোরারি ঘরবাড়ি হবে সাদাসিধা (দুনিয়ার), স্থায়ী ঠিকানা হবে আলিশান (জান্নাত)। ইদানীং তো ইন্টেরিয়র ডিজাইনেই নেয় লাখের উপর। ফার্নিচার তা হলে কত পড়ে? দামি টাইলস, দামি ফিটিংস, দামি পেইন্টিংস। শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ রাহিমাহুল্লাহ আদাবুশ শারিইয়াহ কিতাবের বরাতে লেখেন, ‘ঘরবাড়ি কারুকাজ করা হয় মাকরুহ, নয়তো হারাম।’ মুসনাদে আহমাদের হাদীস, ‘আমার জন্য কারুকর্মমণ্ডিত সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।’ আজ আমার ঘরে নবীজিকে দাওয়াত করলে তিনি আসতেন না, ঢুকতেন না, দরজা থেকে ফিরে চলে যেতেন। কী বদনসিবি! সে ঘর আমি কেন বানাবো? কস্মিনকালেও না। নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুম সাজানোর মতো বোকামি। অবশ্য লোক-দেখানোই যখন উদ্দেশ্য, বাকি যাত্রীদের প্রশংসা কুড়ানোই যখন লক্ষ্য, তখন সবই ঠিক আছে।

দোজাহানের বাদশাহর ঘরটা কেমন ছিলো? কী কী ছিলো তাঁর ঘরে? আতা খুরাসানি রহ. ও ইমরান ইবনে আবি আনাস রহ. একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ঘরসমূহ নিয়ে আলোচনা করছিলেন, যেগুলো

[১] ইবনে উমর রা.-এর ভয়। আবু নুয়াঈম সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫, দারুল কিতাব

[২] ইবনে সাদ সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩, দারুল কিতাব

পরবর্তীতে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় মসজিদে নববীর ভেতরে নিয়ে নেওয়া হয়; ইমরান রহ. বলেন, ‘নবীজির ঘরগুলোর মধ্যে ৪টি ঘর ছিলো কাঁচা ইটের, সেগুলোর ভেতরে খেজুরের ডালের পার্টিশন দিয়ে ছোট-ছোট একাধিক ঘর বানানো ছিলো। আর ৫টি ঘর ছিলো খেজুরের ডালের উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া; সেগুলোর ভেতরে কামরা ছিলো না, একটাই ঘর। ঘরগুলোর সদর দরজায় ৩ হাত বাই ১ হাত পশমের চট ঝুলানো থাকতো, ব্যস। যে-দিন খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক-এর ফরমান এলো, ‘ঘরগুলো ভেঙে মসজিদের সাথে মিলিয়ে দাও’, সে-দিন সাহাবীদের সন্তানেরা এত কেঁদেছেন, যা ভাষায় প্রকাশের মতো না। আবু উমামাহ রা. বলেছিলেন, ‘হায়, ঘরগুলো না-ভেঙে রেখে দিলে, মানুষ উঁচু ঘর-বাড়ি বানাতে লজ্জিত বোধ করতো। তারা দেখতো, আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবের জন্য কেমন জীবন পছন্দ করেছেন, অথচ সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁর হাতে ছিলো।’ [১]

তবে হ্যাঁ, বড় ঘরকে আল্লাহর রাসূল সৌভাগ্যের বিষয় বলেছেন। পর্দার বিষয়গুলো মানা সহজ হয়, যদি ঘর বড়সড় হয়। হাদীসে এসেছে, ‘সৌভাগ্যের বিষয় তিনটি—নেককার স্ত্রী, দ্রুতগামী বাহন, কয়েক স্তরের প্রশস্ত কামরা।’ [২]

ক্রেমন আসবাবপত্র

একটু কল্পনা করুন, আমার দামি কাঠের আলনা দরকার নেই, দরজার পিছে ৩০ টাকার ওয়াল হ্যান্ডারেই আমার কাজ চলছে; আমার ডাইনিং টেবিল দরকার নেই, ২০০ টাকার প্লাস্টিকের পাটিতে সুন্নাহ তরিকায় খেয়ে/খাইয়েই আমার চলছে; আমার খাট দরকার নেই, এক পরত তুলোর তোশকেই আমি সারারাত ঘুমে কাদা হয়ে থাকি; আমার স্টিল/মেলামাইনের প্লেটে আমি খেয়ে পাটপাট হয়ে পড়ে থাকি; আমার দামি কাঠের ওয়ার্ডরোব লাগবে না, হ্যামকোর একটা প্লাস্টিক ওয়ার্ডরোবে আমার আর বাচ্চার কাপড়চোপড় এঁটে যাচ্ছে তো; কাজ তো আটকে নেই, চলছে তো। মুসাফিরের জীবনে আর কী চাই! এবার ভাবুন তো, জীবন কত সহজ। শুধু ‘লোকে কী বলবে’, ‘কেমন দেখাবে’—এগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলার অপেক্ষা।

[১] হযরাতুস সাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৮

[২] মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২৬৮৪, সূত্রে আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ উপদেশ, শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ রহ., রুহানা পাবলিকেশন

সাদাসিধে জীবন

আজ আমাদের আসবাবের মাঝে কিছু তো আছে শরীয়তবিরুদ্ধ, হারাম—জীবজন্তুর পেইন্টিং, শো-পিস বা ভাস্কর্য, টেলিভিশন। কিছু আছে সুন্নাহ পরিপন্থী—ডাইনিং টেবিল।^[১] আর কিছু আছে অপ্রয়োজনীয় বা ‘না থাকলে লোকে কী বলবে’, বা ‘না-থাকলে ফাঁকা-ফাঁকা দেখায়’—এই টাইপ—শোকেস, সোফাসেট। ঘরে কী লাগবে না-লাগবে, বিষয়গুলো আসলে শখের না, প্রয়োজনের। ঈমানের দাবি হলো, দুনিয়াতে মুমিন মেটাতে প্রয়োজন, আর জান্নাতে মেটাতে শখ। ভাই, ইসলামকে আপনারা কঠিন করছেন, ইসলাম এত কঠিন না—ওগাইরা ওগাইরা। না মেরে ভাই, ইসলামই সহজ। ইসলামকে বাদ দিয়ে আমরা জীবনকে কঠিনই করেছি, এতটা কঠিন যে, হালাল কামাই দিয়ে চলছে না, হারাম কামাইয়ের দ্বার খুলতে হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন মেটে না, আরও চাই আরও চাই। ইসলামই সহজ, খায়েশাতই কঠিন; কত কিছু করতে হয় একেকটা খায়েশ পুরো করতে গিয়ে, একেকটা শখ মেটাতে গিয়ে।

আপনাদের কথা যদি মেনেই নিই, তবে তো বলতে হয়, আমরা না, বরং ইসলামের নবীই ইসলামকে কঠিন করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আন্মাজান হাফসা রা.-এর ঘরে তাঁর বিছানা ছিলো একটা কস্বল—দুই ভাঁজ করে দেওয়া হতো, কখনো চার ভাঁজ, ব্যস।^[২] আন্মাজান আয়েশা রা.-এর ঘরে নবীজির বিছানা ছিলো চামড়ার ভেতর খেজুরের ছালভর্তি একটি তোষক।^[৩] একবার উমর রা. হু হু করে কেঁদে দিলেন। দড়ির খাটে শোয়া নবীজি, তার উপরে নেই চাদর, পিঠে দড়ির দাগ, মাথায় এক খেজুরের ছোবলাভরা বালিশ।

- ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জানি, আল্লাহর কাছে আপনি সিজার-খসরুর (কায়সার-কিসরাহ) চেয়েও বেশি ইজ্জতদার। অথচ আপনার এই অবস্থা!’
- ‘উমর, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?’^[৪]

নবীজি ইচ্ছে করে নিজেই এই জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘আমার সামনে দুনিয়ার ধনভাণ্ডারগুলোর চাবি পেশ করা হলো। সে-ব্যাপারে

[১] শামায়েলে তিরমিযি : ১৩৯

[২] হিলইয়াতুল আউলিয়া সূত্রে সালাফদের ক্ষুধা, ইবনে আবিদ দুইইয়া রাহিমাছল্লাহ; চার ভাঁজ করে দেওয়া নবীজি নারাজ হয়েছিলেন।

[৩] আবু দাউদ : ৪১৪৬; তিরমিযি : ২৪৬৯

[৪] তাহযিবুল কামাল সূত্রে সালাফদের ক্ষুধা, ইবনে আবিদ দুইইয়া রাহিমাছল্লাহ

কুররাতু আইয়ুন ২

আমার ভাই জিবরিল আ.-এর পরামর্শ চাইলে তিনি আমার দিকে ‘বিনয়’-এর ইশারা করলেন (ইশারা করে বিনয় বোঝালেন)। তখন আমি বললাম, ‘আমি (সম্রাট-নবি না-হয়ে) বান্দা-নবি হবো, একদিন ক্ষুধার্ত থাকবো আর একদিন পরিতৃপ্ত থাকবো। যে-দিন ক্ষুধার্ত থাকবো, সে-দিন ছবর করবো। আর যে-দিন পরিতৃপ্ত থাকবো, সে-দিন শোকর করবো।’^[১] দুআ করতেন, ‘হে আল্লাহ, আমাকে অভাবী (মিসকিন) অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখো, অভাবী অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো আর (কিয়ামতের দিন) অভাবী লোকদের সাথে আমার হাশর করো।’^[২] আন্মাজান আয়েশা রা. বলেন, ‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু অবধি টানা তিন দিন তৃপ্তি করে খাননি। যদি আমরা চাইতাম, তবে অবশ্যই তৃপ্তিভরে আহার করতে পারতাম। কিন্তু তিনি নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতেন।’^[৩]

কেন তিনি বেছে নিলেন এই কষ্টের জীবন? যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে গরিব অভাবী উম্মাতও এই অভিযোগ করতে না-পারে যে, আমি তো দরিদ্র ছিলাম, মুহাম্মাদে আরাবির দীন আমার জন্য কঠিন ছিলো। নিজেকে উদাহরণ করে রেখে গেলেন যে, অভাবী অবস্থাতেও আল্লাহর দীনই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আজ তো অভাবের দোহাই দিয়ে সালাত ছেড়ে দিচ্ছি—‘ভাই, আমরা কাজের মানুষ, সালাত পড়তে পারি না।’ অভাবের দোহাই দিয়ে কত মানুষ রমাদানের রোযার হুকুম নষ্ট করছে! অথচ নবীজির ৯ ঘরের কোনো ঘরে তিন মাসে একবার চুলা জ্বলেনি, নবীজির কোনো স্ত্রী আল্লাহর হুকুমকে ছাড়েননি। সাহাবী আর সাহাবীর স্ত্রীর একটাই পোশাক, তবুও জামাআতের সালাত ছোটেনি। কাল হাশরের মাঠে দারিদ্র্যের অজুহাত খণ্ডন হয়ে যাবে, যখন আমাদের অজুহাতের মোকাবেলায় নবীজি আর সাহাবাদের কষ্টকে সামনে আনা হবে।

সওয়ারি

সওয়ারি একটা বেসিক নীড, মৌলিক চাহিদা। তখনকার যুগে যার-যার সওয়ারি, তার-তার ছিলো। এখন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এসে চাহিদা পুরো করে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত সওয়ারির ক্ষেত্রেও অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করা চাই। কালো গাড়ির দাম কেবল কালারের কারণে ২ লাখ বেশি। ‘দেখতে’ গর্জিয়াস—এর দাম ২ লাখ টাকা। যদি ১-২০ এর বাইকে জরুরত পুরা হয়, তা হলে ফ্যাশনের নামে বা

[১] তিরমিযি ৪/৫৭৫, হাসান সূত্রে মুত্তাখাব হাদীস

[২] তিরমিযি ৪/৫৭, হাসান সূত্রে মুত্তাখাব হাদীস

[৩] বাইহাকি শুআবুল ঈমান সূত্রে সালাফদের ক্ষুধা, ইবনে আবিদ দুনইয়া রহ.

সাদাসিধে জীবন

স্টাইলের নামে ২-৭৫-এর বাইক কেনা অনুচিত। দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্য থেকে এই ‘ফ্যাশন-স্টাইল-ভাব-কেমন দেখাবে’ এইগুলোই বাদ দেওয়ার জিনিস। শ্রেফ সামাজিক অবস্থান জাহির করতে ব্যাংক-লোন করে গাড়ি কেনা হচ্ছে। অমুকের ছেলে গাড়ি কিনেছে—কথাটা গ্রামের মানুষ বেশ নেয়। সুদের গুনাহের সাথে যোগ হলো রিয়ার (লোক দেখানোর) গুনাহ। তবে দ্রুতগামী সওয়ারিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘সৌভাগ্যের বিষয়’ বলেছেন; ব্যালেন্স করতে হবে। এইসব গাড়ি-ঘোড়া আমাদের দেশে স্ট্যাটাসের পরিচায়ক। অন্যান্য দেশে এ-সব কেবলই প্রয়োজনের সামান। আমাদের দেশে গাড়িতে ৪০০% ট্যাক্স হওয়াতেই সমস্যাটা, দাম বেড়ে গেছে। ভূপালের সাথিরা শুনে বলে—‘তোমাদের দেশের মানুষ ধনী, সরকার গরিব, সব কিছুতে বেশি-বেশি ট্যাক্স।’

উৎসব-অনুষ্ঠান

এই জায়গায় এসে উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সবাই একাকার। ‘সার্বজনীন’ লোকদেখানো ও মুখরক্ষা প্রথা। গায়ে-হলুদ, পান-চিনি, বাগদান, বৌ-ভাত, অষ্টমোলা, আকিকা, অন্নপ্রাশন, বই-নেওয়া, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, চল্লিশা, হুজুর-খাওয়ানো, কুকুর-বিলাইয়ের জন্মদিন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলামে খুব বেশি শো-অফ সম্ভব না, এইজন্য হিন্দুদের থেকে কিছু প্রোগ্রাম ধার-দেনা করে চলছে ‘স্ট্যাটাসরক্ষা’। হলুদুল ব্যাপার! মেহমানদারির ব্যাপারেও আমরা কিছুটা ‘লোক দেখানো’র ফিকির করি। ভালোমতো না-খাওয়ালে ‘বদনাম’ হবে, ‘কী মনে করবে মেহমান’ ইত্যাদি ভূত এসে ভর করে মেহমানদারির মতো বড় আমলেও।

দ্বীনের ট্যাগ লাগানো সওয়াবের নিয়তে এইসব অতিরিক্ত অনুষ্ঠানাদি স্পষ্ট বিদআত। বিদআতের গুনাহের সাথে ‘লোক দেখানো’ রিয়ার গুনাহ, লাভের মধ্যে গোদের উপর বিষফোঁড়া হলো। আর দ্বীনের ট্যাগ ছাড়া সামাজিকতা-রক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো জাহেলিয়াত ও স্পষ্ট ইসরাফ (অপচয়)। অপচয়কারী শয়তানের ভাই, একদম নিকটসম্পর্ক—ভেরি ক্লোজ। সাথে বেশি করে বরযাত্রী গিয়ে খসিয়ে আসা, খাবার কম পড়ানোর চেষ্টা করা, খাবার পছন্দ না হলে গ্যাঞ্জাম করা, বিয়ে ভেঙে দেওয়া—এত ছোটলোকি কীভাবে পারেন, ম্যান! আবার এ-সব অহেতুক প্রোগ্রাম কেউ না-করলে তার নামে কান-কথা, দুর্নাম রটানো—মারাত্মক জুলুম এ-সব। জি-বাংলার কুটনি মহিলাদের স্বভাব এগুলো, নিফাকের খাসলত।

কুররাতু আইয়ুন ২

কেউ-কেউ আবার আরেক কাঠি সরেস, ‘কী বলেন ভাই, লোক খাওয়ানো কি খারাপ?’ গরিব-মিসকিন তো আর খাওয়াচ্ছেন না, তারা তো এসে সেই দাঁড়িয়েই থাকছে। খাচ্ছে তো, যাদের কাছে আপনি মুখ-রক্ষা করতে চান, তারা। যাদের কাছে আপনি প্রচার আশা করেন—অমুকের বেটা খুব খাইয়েছে, অমুকের বেটা খুব বড় দিলের মানুষ—এসে অন্ন ধ্বংস করে গেলো তো এরা! আবার আপনিও একটা জাহির করার উপলক্ষ পেলেন, আমার বাপের চল্লিশায় ৫ হাজার লোকে খেয়েছে। এভাবে লোক খাইয়ে তো কোনো লাভ নেই, ব্রাদার। আমাদের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঐ ওয়ালিমার খানা নিকৃষ্ট খানা, যার মধ্যে কেবল ধনীদেব দাওয়াত করা হয়, আর গরিব লোকেদের বাদ দেওয়া হয়।’^[১] আমাদের কমিউনিটি সেন্টার কালচারে তো তা-ই। হচ্ছে তো এ-সবই।

সাহাবীরা কেমন মেহমানদারি করতেন? আমাদের মতো ঘট করে করতেন না। আমরা দশ বছরে একবার খাইয়ে দশ বছর ধরে গল্প করি। আর তাদের রোজকার আমল ছিলো মেহমানদারি। একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—

- ‘আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছো?’
- ‘আমি’, আবু বকর রা. জবাব দিলেন।
- ‘আচ্ছা, আজ কে জানাযায় শরীক হয়েছো?’
- ‘জি আমি’, আবার আবু বকর রা. জবাব দিলেন।
- ‘বেশ, কে আজ মিসকিনকে খানা খাইয়েছো?’
- ‘জি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি’, আবার আবু বাকর রা.-ই।
- ‘আজ কে অসুস্থকে দেখতে গিয়েছো?’
- ‘আমি গিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ’, ফের সেই আবু বাকর রা.।
- ‘যে-ব্যক্তির মাঝে এই আমলগুলো জমা হবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।’^[২]

হাদীসটিতে আবু বকর রা.-এর ফযিলত বর্ণনাই উদ্দেশ্য ছিলো আবু হুরাইরাহ রা.-এর। তা না হলে সে-দিন জানাযায় তো আরও অনেকেই শরীক হয়েছিলেন। এই হাদীসের উদ্দেশ্য আবু বাকর রা. যে প্রতি দিনই এ-সব আমল করেন, তা

[১] মিশকাত, বুখারি, মুসলিম সূত্রে মুত্তাখাব হাদীস

[২] মুসলিম ৬১৮২ সূত্রে মুত্তাখাব হাদীস

সাদাসিধে জীবন

জানানো। আবু বকর রা. তো আর জানতেন না যে, ঐ দিনই নবীজি জিজ্ঞেস করে বসবেন, তার মানে তিনি এ-সব রোজই করেন। একবার আলি রা. কাঁদছেন; ‘কেন কাঁদছেন’-এর জবাব এলো, ‘আজ সাত দিন হয় আমার ঘরে কোনো মেহমান আসেনি, ভয় হচ্ছে, আল্লাহ আমাকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করলেন কি না!’^[১] তাবেয়ি মুহাম্মাদ ইবন সিরিন রহ. বলেন, ‘যখন রাত হতো, সুফ্যাবাসীদের মেহমানদারি করার উদ্দেশ্যে সাহাবীগণ বাড়ি নিয়ে যেতো। কেউ দুজন, কেউ তিনজন, আবার কেউ পাঁচজন-সাতজন করে নিয়ে যেতো। আর সাআদ ইবন উবাদাহ প্রতি রাতে আশি জন লোককে মেহমানদারির উদ্দেশ্যে বাড়ি নিয়ে যেতেন।^[২] রোজকার আমল।

দৈনিক লোক খাওয়ানো কি চাট্টিখানি কথা? কীভাবে পারতেন তাঁরা? সাহাবারা পারতেন, কারণ, তাঁরা ঘরে যা আছে, তাই দিয়েই মেহমানদারি করাতেন, অনাড়ম্বর। ঘরে কিচ্ছু নেই, বাচ্চাদের জন্য খানিকটা দুধ আছে—ঠিক আছে, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও, আর বাতি নিভিয়ে ঐ দুধটুকুই মেহমানের সামনে দাও।^[৩] খন্দক খোঁড়ার সময়—

- ‘জানো? নবীজি আজ ক্ষুধার যাতনায় দুটো পাথর বেঁধেছেন পেটে, ঘরে কি কিচ্ছু আছে নাকি?’
- ‘জি, একটু যব আছে আর একটা বকরির বাচ্চা আছে।’
- ‘আচ্ছা বেশ, তুমি গোশত-রুটির ইন্তেজাম করো, আমি আল্লাহর রাসূলকে দাওয়াত দিয়ে আসি।’
- ‘সাথে দুই-চারজনের বেশি যেন না হয়’, হাঁক দিয়ে বললেন জাবির রা.-এর স্ত্রী।^[৪]

আরেকবার হযরত জাবের রা. সঙ্গীদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করলেন এবং বললেন, ‘এটা খাও; কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, ‘সিরকা’ উত্তম তরকারি। সে ধ্বংস হোক, যার কয়েকজন ভাই তার কাছে আসে, আর সে ঘরে যা আছে, তা তাদের সামনে পেশ করাকে কম মনে করে। ওই সব

[১] এহইয়া সূত্রে ফাযায়েলে সাদাকাত

[২] ইবন আবিদ দুনিয়ার মেহমানের মেহমানদারি, হাদীস নং ২০

[৩] বুখারি ৩৭৯৮, মুসলিম ৫৪৮০ (iHadis app) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়—‘আর নিজেদের উপর অন্যকে তারা অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবপীড়িত হয়েও।’ (সূরা হাশর ৯)

[৪] বুখারি : ২৪৬৩ সূত্রে মুস্তাখাব হাদীস

লোকও ধ্বংস হোক, যারা সামনে যা পেশ করা হয়, তারা তাকে তুচ্ছ ও কম মনে করে।’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘মানুষের ধ্বংসের জন্য এটা যথেষ্ট যে, যা তার সামনে পেশ করা হয়, সে তাকে কম মনে করে।’ [১]

অর্থাৎ মেজবানও ঘরে মজুদ খাবারকে কম ভাববে না। মেহমানও যা সামনে এসেছে, তাকে কম বা তুচ্ছ মনে করবে না। যা আছে, তা-ই। কোনো আলাদা পেরেশানি নেই। মেহমান থাকে, ভালো খাবার না হলে কেমন দেখা যায়, কী মনে করবে, ঘরের আটপৌরে খাবার মেহমানের সামনে দিলে ভাববেটা কী, লোকে জানলে কী বলবে—ঘুমই উড়ে যায় আমাদের! এই ভয়েই ঘন-ঘন মেহমানদারির আমল করা হয় না। অথচ যদি সাদাসিধে মেহমানদারির প্রচলন থাকতো, তবে বারবার এই আমল করা যেতো। কেবল একটু বেশি করে পাকালেই হয়ে যেতো কিংবা একটু ঝোল বাড়িয়ে দিলেই। [২] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই দিয়েছেন, ‘দুজনের খাবার তিনজনের জন্য পর্যাপ্ত এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে।’ [৩]

তবে মেহমানদের জন্য এক দিন এক রাত সাধ্যমতো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতেও নবীজি আদেশ দিয়েছেন। আর ৩ দিন মেহমানদারি পাওয়া হলো মেহমানের হক, মেজবানের উপর ওয়াজিব। এই ৩ দিন যদি আমি মেহমানদারি করতে অস্বীকার করি, তা হলে মেহমান চাইলে ৩ দিন মেহমানদারির পরিমাণ মাল আমার থেকে নিয়ে নেবার অধিকার রাখে। [৪] ৩ দিনের অতিরিক্ত মেহমানদারি চালিয়ে যাওয়া মেজবানের জন্য ঐচ্ছিক, সাদাকার সওয়াব হবে। আবু শুরায়হ আদাবি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু কান শুনছিলো ও আমার দু চোখ

[১] মুসনাদে আহমাদ, তাবারানি সূত্রে মুস্তাখাব হাদীস

[২] আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে আবু যার, যখন তুমি তরকারি রান্না করবে, তখন তাতে ঝোল বেশি দিয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু প্রদান করো।’ সহিহ মুসলিম ৬৫৮২ (iHadis app)

[৩] তিরমিযি ১৮২০, সিলসিলাতুস সহিহা ১৬৮৬ (iHadis app)

[৪] মেহমান যদি মেহমানের মেহমানদারি না-করে তবে মেহমান তার মত মেজবানের সম্পদ থেকে খাবার-দাবার নিয়ে নিতে পারবে বইলে হাদীসে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই ধরনের হুকুম সেই মেহমানের জন্য প্রযোজ্য, যে অন্য দেশ বা শহর থেকে আসে। যেহেতু তার থাকার ও খাওয়ার কোনো জায়গা নেই। পক্ষান্তরে যদি কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনো মেহমান আসে, তার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। (আশ-শরহুল মুমতি আলা যাদিল মুস্তামতি : ৪৮)—সম্পাদক

সাদাসিধে জীবন

দেখছিলো। তিনি বলছিলেন, ‘যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান দেখায় তার প্রাপ্যের বিষয়ে। জিজ্ঞেস করা হলো—‘মেহমানের প্রাপ্য কী, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, ‘একদিন একরাত ভালোভাবে মেহমানদারি করা আর তিন দিন হলে (সাধারণ) মেহমানদারি, আর তার চেয়েও অধিক হলে তা হলো তার প্রতি দয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।’^[১]

তাবলিগের যারা ডাইহার্ড দাঈ বড়ভাই ছিলেন, তাদের দেখেছি সাইড-ব্যাগে সব সময় একটা ছোট দস্তুরখান আর এক প্যাকেট বিস্কুট-চানাচুর রাখতে। দাওয়াহর যে-কোনো মওকায় বের করে বিছিয়ে দিলেন। যারা দাওয়াহ করতে চান, খুব প্রভাব পড়ে।

আজ এসে প্রাচ্য-পশ্চিম আমাদের ‘মিনিমালিজম’ শেখাচ্ছে। বলছে যার অপশন যত কম, বিলংগিংস যত কম, সে মানসিকভাবে তত সুখী, স্ট্রেস তত কম। ভোগবাদের যাঁতাকলে পশ্চিমা সমাজ হাঁসফাঁস করছে। নতুন-নতুন প্রযুক্তি, আরাম-বিলাসিতা-ভোগের নতুন-নতুন প্রোডাক্ট, বীমা, ক্রেডিটকার্ড, পুঁজিবাদের গোলামির রোবোটিক ক্যারিয়ারিস্টিক জীবন, অসীম অভাব, অর্থহীন ব্যস্ততা, হাউকাউ—এ-সবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেদারসে পশ্চিমা রা বেছে নিচ্ছে ‘মিনিমালিস্ট’ জীবন। কেবল Joshua Fields Millburn আর Ryan Nicodemus-এর The Minimalist সংগঠনই ২ কোটি লোককে এই শান্তির জীবনের খোঁজ দিয়েছে তাদের ওয়েবসাইট^[২], ব্লগ, পডকাস্ট, ডকুমেন্টারি, ফিল্মস দিয়ে। মূলত মিনিমালিজম বলতে তারা বোঝাচ্ছে, জীবনে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু রেখে বাকিটুকু ঝেড়ে ফেললে আরও অর্থপূর্ণ বিষয়ে ফোকাস করা যায়, ফলে জীবনের একটা অর্থ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত বিষয়-আশয়, অতিরিক্ত আসবাবপত্র, অতিরিক্ত কাজ, অতিরিক্ত ব্যস্ততা—সব ঝোঁটিয়ে জীবনকে আরও সার্থক করা। প্রিয়জনের সাথে বেশি সময় কাটানো, আধ্যাত্মিকতা, ইনার পিস, জনকল্যাণমূলক কাজ কিংবা বিশ্বভ্রমণের দিকে মনোযোগী হবার সুযোগ দেওয়া নিজেকে—যাতে জীবনটা প্রশান্তির হয়। মূলত তারা উপায় যেটা বাতলাচ্ছে, সেটা হলো, যেটুকু আমার

[১] আস-সহিহ, বুখারি : ২৪৬৩

[২] <https://www.theminimalists.com/minimalism/>

দরকার নেই, যেটুকু আমি ব্যবহার করি না; সেটুকু বাদ দিয়ে জীবনযাত্রা আরও সাধারণ করা, এমন জীবন, যাতে ভোগ্যপণ্যের প্রতি কম আকর্ষণ, কম ব্যস্ততা, কম প্রতিযোগিতা।

পশ্চিম সাত ঘাটের পানি খেয়ে এসে যা বুঝছে, আমাদের নবী ১৪০০ বছর আগে ফ্রিতে শিখিয়ে গেছেন তো, তাই আমাদের কদর নেই। সোজাভাবে না-বুঝলে আমাদের জন্যও সাত ঘাটের পানিই অপেক্ষা করছে, কিন্তু ফিরতে হবে মদীনার ঘাটেই। আজ থেকেই জীবনকে সহজ করে ফেলুন। সাদাসিধা জীবনের নিয়ত করে ফেলুন। একটু আলিমদের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। আল্লাহর কাছে সহজ জীবন চান। আল্লাহ দুনিয়ার জীবনকে সহজ করে দিন, দুনিয়াকে আমার জন্য দীন বানিয়ে দিন। রিযিককে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না-দিয়ে একখানে করে দিন। আখিরাতের জন্য আমাকে অবসর করে দিন। আমিন।

জোড়-মিল-মহব্বত

খাদিজার আশ্মুকে-সহ তাবলিগে গিয়েছিলাম ৪০ দিনের জন্য। মহিলারা একটা পর্দাওয়ালা বাসায় থাকে, পুরুষেরা সব মসজিদে। মাইকে ২টা বয়ান করে পুরুষেরা ঐ বাসায়। একটা আসরের আগে আম বয়ান, পুরো মহল্লার মা-বোনদের উদ্দেশে। আরেকটা হলো, ফজরের পর বিষয়ভিত্তিক মুযাকারা (আলোচনা), এটা শুধু জামাতের মা-বোনদের উদ্দেশে। বিষয়গুলো এমন হয় :

- ৩ সাদাসিধা জীবন
- ৩ স্বামী ও অন্যান্যদের হক
- ৩ ঘরে মহিলারা কী কী আমল ও দাওয়াহ করবে
- ৩ শোকর ও সবর,
- ৩ বিশ্বব্যাপী দাওয়াহ
- ৩ দাওয়াহর গুরুত্ব ও ফযিলত
- ৩ শরয়ি পর্দা ও মাহরাম
- ৩ মহিলা সাহাবীদের ঘটনাবলি
- ৩ দৈনন্দিন কাজের সুন্নাহ
- ৩ যাবতীয় কাজে মাসনুন দুআ
- ৩ জিহ্বার হেফাজত ও অহেতুক কথা পরিত্যাগ
- ৩ ঈমান বৃদ্ধির আলোচনা
- ৩ ঘরের তালিমের গুরুত্ব
- ৩ পুরুষের দ্বীনি কাজে সহায়তা
- ৩ নিজের ভেতর আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলি আনার পদ্ধতি
- ৩ বাচ্চাদের দ্বীনি দীক্ষা
- ৩ নিজেদের মাঝে সম্প্রীতি-সহানুভূতি-ভালোবাসা সৃষ্টি
- ৩ আখলাক

ইত্যাদি, প্রভৃতি। এবার পরস্পর বন্ধন-ভাব-অনুরাগ (জোড়-মিল-মহব্বত) বিষয়ক আলোচনাটা অধম মূর্খ করেছিলাম। একটু চিন্তাভাবনা করে পয়েন্টগুলো টুকে নিয়েছিলাম। সেগুলো আপনাদের খেদমতে পেশ করার গোস্তাখি করছি। এ-সব আপনারা জানেনই, জাস্ট একটু উস্কে দেওয়া।

ঈমান নিজেই বন্ধন তৈরি করে দেয়। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’—কালিমা পড়া ও স্বীকার করাকমাত্রই তাবৎ কালিমাওয়ালা আমার ভাই হয়ে যায়। পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, আরেক কোণে বসবাসরত মুসলিম নারী বা পুরুষটির সাথে আমি ঈমানি কালিমার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি। এ-এক আজীব বাঁধন, রক্তের সম্পর্কও টুটে যায়, কিন্তু ঈমানদার যতক্ষণ কালিমার সাক্ষ্য দেয়, কালিমার বাঁধন ছেড়ে না। রক্ত, ভাষা, সীমানা, পরিচয়ের উর্ধ্বে এ-বন্ধন। মুসলমান শ্রেফ ঈমানের কারণে, জাস্ট কালিমার সাক্ষ্যের কারণে তার রক্ত আমার অঙ্গ থেকে নিরাপদ, তার সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ, তার ইজ্জত আমার জবান থেকে নিরাপদ। আমার জন্য তার রক্ত হারাম, তার সম্পদ হারাম, তার স্ত্রী হারাম, তার গিবত হারাম। এটা কালিমার হক, তাওহীদের প্রায়োগিক রূপ—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা। একেই শরয়ি পরিভাষায় বলে ‘আল-ওয়ালা ওয়াল বারআ’। যে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়, তার সাথে আমার ওয়ালা (বন্ধুত্ব)। যে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় না, তার সাথে আমার বারআ (সম্পর্কচ্ছেদ)। তাই মুসলমান শ্রেফ মুসলমান হবার কারণে আমার তরফ থেকে জোড়-মিল-মহব্বত পাবার হকদার, আর কিছু দরকার নেই। বিদআতি মুসলিমও মুসলিম। তার বিদআতের জন্য তাকে দাওয়াহ দেবো, আর ঈমানের জন্য মহব্বত করবো।^[১]

জোড়-মিল-মহব্বত জিনিসটা আন্তঃব্যক্তি, আন্তঃসমাজ, আন্তঃমাসলাক, আন্তঃমায়হাব, আন্তঃমানহাজ একইভাবে প্রযোজ্য। স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও, রেজডি-

[১] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই-ভাই।’ (সূরা হুজুরাত : ১০) এই আয়াতে ঈমানকে ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে। তার মানে, যিনিই ঈমানদার, মৌলিকভাবে তিনি আমাদের ভাই। তারপর তার ঈমানের অবস্থা অনুপাতে তার সাথে আমাদের সম্পর্কের ধরন ঠিক হবে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কখনো ছিন্ন হবে না। শত মতানৈক্যের ভেতরেও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারটা বজায় রাখতে হবে। নিজের ভাই কোনো ভুল করলে বা ভুল পথে গেলে যেমন দরদের সাথে তাকে আমরা সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি, প্রতিজন মুমিন আমাদের ভাই হওয়ার সুবাদে এই আচরণ পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। তাই মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য। এটি উক্ত আয়াতেরও দাবি।—সম্পাদক

জোড়-মিল-মহব্বত

হানাফি-আহলে হাদীসের মাঝেও। মতভেদ হবে, ঝগড়াও হবে; কিন্তু কিছু সীমা ক্রস করা যাবে না, কিছু হক, যা সে মুসলিম হবার কারণে পাওনা, সেগুলো নষ্ট করা যাবে না। মতভিন্নতা একটা লেভেল অবধি, এরপর সে আমার কালিমার ভাই। সাহাবীরা তো আর ফেরেশতা ছিলেন না, আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষই তো ছিলেন। তাদেরও শরীরে রাগ ছিলো, ঝগড়া হতো। মাশওয়ারায় (পরামর্শ) উমর রা. আর উসমান রা.-এর মাঝে এত বিতর্ক হতো যে, মনে হতো, এরা বুঝি আর কোনো দিন পরস্পরের মুখও দেখবেন না। আমল শেষ হতেই কীসের ঝগড়া, কীসের কী? দ্বীনের কল্যাণের জন্য ঝগড়া, ইখলাসের সাথে ঝগড়া। আজ আমরা ঝগড়া করি আসাবিয়াতের (সাম্প্রদায়িকতা) জন্য, নিজের স্বার্থে—তাই জোড়া লাগে না।

ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.-এর তাফসীরে সূরা তাওবাহ পড়ার পরামর্শ রইলো। নিজে দ্বীনের সর্বোচ্চ খেদমতে থেকেও কীভাবে অন্য সংগঠনকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হয় দেখবেন; তাদের খেদমতকে বাতিল সাব্যস্ত করলে আপনি উম্মাহর না, আপনি দলের। ড. আযযামের একটি উক্তি এমন :

যদি ইবাদত আল্লাহর জন্য হতো, তা হলে তো যতভাবে যত পথে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার হতো, হৃদয় ততই বিমোহিত ও আনন্দিত হতো। ... আমাদের মনের অবস্থা যদি এমনই হয় যে, আমরা নিজ দলীয় কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনো দলের কার্যক্রমকে পছন্দ না-করি, তার প্রচার-প্রসারে বাধাদান করি, তা হলে আমি বলবো, আমরা আমাদের কৃতকর্মের দ্বারা এ-বিষয়টি প্রমাণ করছি যে, আমরা দ্বীনের বিজয় চাই না, দ্বীনের অগ্রগতি চাই না। কারণ, দ্বীন হলো এক বিশাল বহমান নদী। এ-থেকে বেরিয়ে এসেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন নামক এক শাখা, সালাফি নামের এক শাখা, তাবলিগ জামাআত নামের এক শাখা। অমুক দল নামের এক শাখা ইত্যাদি। এই সকল শাখার সম্পর্ক রয়েছে মূলের সাথে। এমন অবস্থায় তুমি চাচ্ছে—দ্বীনের নদীর সকল শাখা শুকিয়ে শেষ হয়ে যাক। আর একমাত্র তোমার শাখাটিই প্রবহমাণ থাকুক।...

আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন, ‘... এবং তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না।’^[১] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘(নফল) সালাত-রোযা-সাদাকার চেয়েও উঁচু জিনিস হলো পরস্পর একতা; কেননা, পরস্পর-বিরোধ দ্বীনকে মুণ্ডনের মতো সাফ করে দেয়।’^[২]

[১] আলে ইমরান : ১০৩

[২] আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমি কি

আল্লাহর রাসূল আরেক হাদীসে বলেন যে, ‘মুমিন কাপুরুযও হতে পারে, কৃপণও হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না।’^[১] মিথ্যাকে মুনাফিকের আলামত বলেছেন।^[২] তার মানে মিথ্যা কত বড় গুনাহ। কিন্তু পরস্পর ঐক্য এত বড় বিষয় যে, ঐক্য বজায় রাখতে যে-মিথ্যা বলা হয়, তাতে মিথ্যার গুনাহ নেই। তিনি ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি সন্ধি করানোর জন্য এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষকে বানোয়াট কথা পৌঁছায়, সে মিথ্যা বলে নাই।’^[৩]

চলুন, আজ দেখি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্পরিক জোড়-মিল বজায় রাখতে আমাদেরকে কী কী শিখিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু পড়ে গেলে হবে না। একেকটা হাদীসের সামাজিক প্রভাব নিয়ে ভাববেন কিন্তু!

তার ভালোটা স্মরণ করা

যাকে আপনি ভক্তি করেন, ভালো পান, তার সাথে আপনার কখনো ঝগড়া লাগবে না। ঝগড়া লাগার প্রথম ধাপ হলো ‘অভক্তি’। আর অভক্তির ২টি দরজা— বদধারণা আর অহংকার। কারও সম্পর্কে যখন খারাপ ধারণা আপনার অন্তরে জেঁকে বসবে, তখন তার প্রতি আর ভক্তি থাকবে না। আর নিজেকে যখন কারও চেয়ে বড় ভাববেন, তখন তার প্রতি ভক্তি থাকবে না। এই ২টি দরজা বন্ধ করতে হবে একটি জিনিস দিয়ে—তার ভালোটা, অবদানটা, ত্যাগটা স্মরণ করা। তা হলে বদ ধারণা বদলে যাবে সুধারণায়; আর তাকে আমার নিজের চেয়ে ভালো ভাবা যাবে, ফিরে আসবে ভক্তি।

হাতিব ইবনু আবি বালতাতা রা. এক বিরাট অপরাধ করে ফেললেন। মক্কা অভিযানের আগে নবীজির গোপন প্ল্যান জানিয়ে চিঠি লিখলেন মক্কার কাফের নেতাদেরকে। বাহ্যত এবং স্পষ্টত মুনাফিকদের মতো কাজ, কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই। জিবরিল আ. মারফত খবর পেয়ে নবীজি সেই চিঠি উদ্ধার করিয়ে আনালেন মাঝপথে। হাতিব রা. কারণ দর্শালেন, মক্কায় আমার পরিবারকে মুশরিকেরা যেন নিরাপদে রাখে, এ-জন্য তাদের মনোতুষ্টির জন্য এ-কাজ করেছি, পরিবারের

তোমাদেরকে নানায়, রোযা ও সাদাকাহর চেয়ে উত্তম কাজ প্রসঙ্গে অবহিত করবো না?’ সাহাবীগণ বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘পরস্পর একতা বা সুসম্পর্ক (সালাহু যাতিল বাইন)। কারণ, পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো দীন বিনাশ হওয়া।’ তিরমিযি ২৫০৯, সহিহ (iHadis app) এবং মুস্তাখাব হাদীস, পৃষ্ঠা: ৬৪৪, দারুল কিতাব

[১] শুয়াবুল ইমান : ৬/৪৫৬

[২] বুখারি : ৩৩ ; আহমদ : ৬৭৬৮

[৩] আস-সুনান, আবু দাউদ : ৪৯২

জোড়-মিল-মহকমত

মুখের দিকে তাকিয়ে। উমর রা. তো রেগে ফারার—‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনুমতি দিন, মুনাফিকটার কল্লা উড়িয়ে দিই।’ আমার নবী কী বললেন? ‘উমর, থামো! হাতিব বদরী সাহাবী।’^[১] হাতিবের ভালোটা, দ্বীনের জন্য তাঁর ত্যাগটা স্মরণ করিয়ে দিলেন সবাইকে।

আরেক দফা খালিদ রা. আর আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রা.-এর মাঝে কী নিয়ে যেন লেগে গেলো। নবীজি শাসালেন, ‘খালিদ, আমার সাহাবীদের ছেড়ে দাও।’^[২] খালিদ রা.-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রা.-এর লেভেল-ত্যাগ-কুরবানি।

একবার আবু বকর রা. এক কওমকে কিছু খাস জমি বরাদ্দ দিলেন। আর বলে দিলেন, ‘উমরকে একটু দেখিয়ে নিয়ো।’ উমর রা. দেখেই তেলেবেগুনে ঝলে উঠলেন, ‘এই জমি সব মুসলমানের, আবু বকরের একার নাকি যে, যাকে খুশি তাকে দিয়ে দেবে?’ ছিঁড়ে টুকরো করে দিলেন সিলনোহর লাগানো রাজকীয় ফরমান। সেই কওমের লোকেরা আবার আবু বকরের কাছে গেলো, ‘খলিফা কি আপনি, না উমর?’—পরিস্থিতিটা ভেবে দেখুন! আমরা হলে তো লেগেই যেতো, এত বড় সাহস! কী জবাব দিলেন আবু বকর, বলুন তো! ‘খলিফা তো আমিই, কিন্তু উমর বেশি যোগ্য।’^[৩] আরেকজনের ভালোটা সামনে আনলেন।

তাবলিগের ‘মূর্খ’ গ্রামের লোকেরা শিখিয়েছে—ছেটিদের ব্যাপারে এ-কথা স্মরণ করবো যে, যেহেতু তার বয়স আমার চেয়ে কম, তাই গুনাহ আমার চেয়ে কম, তাই আল্লাহর কাছে সে বেশি প্রিয়। আর বড়দের ব্যাপারে এটা মনে আনবো, যেহেতু তার বয়স আমার চেয়ে বেশি, তাই সে বেশি আমলের সুযোগ পেয়েছে, তাই সে আল্লাহর চোখে আমার চেয়ে বেশি দামি।

বাই দ্য ওয়ে, আমরা কিন্তু বেনালুম ভুলে বাই যে, আমার স্বামীও এক হিসেবে দ্বীনি ভাই এবং আমার স্ত্রীও এক হিসেবে দ্বীনি বোন। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের আকাশে মেঘ গুড়গুড় করলেও একই ফর্মুলা। তার কুরবানি আর আমার জন্য তার মেহনতকে স্মরণ করা। একবার এক গ্রাম্য লোক তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্য খলিফা উমর রা.-এর কাছে এলো। ঘরের দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়াতেই

[১] আস-সহিহ, বুখারি : ২৮৪৫

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর : ৪/১৪২

[৩] আল-ইস্তিযকার, ইবনে আব্দিল বার : ১/১৪৬

ভেতর থেকে জুদ্র নারীকঠের শাপশাপান্ত ভেসে এলো। বেদুইন দেখলো—আমি যে-সমস্যার মধ্যে আছি, বেচারী খলিফাও তো সেই একই সমস্যা; ইনি আমার সমাধান কী করবে? যাই গা। উমর রা. থামালেন, ‘রুখো রুখো; এলে আর কিছু না-বলেই চলে যাচ্ছে, কী ব্যাপার!’ ‘আমীরুল মুমিনীন, আমার স্ত্রী খুবই মুখরা স্বভাবের, সারা দিন আমাকে গালমন্দ করে, তাই আপনার কাছে এসেছিলাম কোনো সমাধানের জন্য। এসে দেখি, আপনি নিজেও একই সমস্যা। তাই চলে যাচ্ছিলাম আর কি।’ উমর রা. হেসে বললেন, ‘ও, এই সমস্যা! শোনো, এই আল্লাহর বান্দী আমার জন্য তাঁর সব কিছু ছেড়ে আমার ঘরে এসেছে। সে আমার জন্য খানা পাকায়, আমার সন্তানদের লালনপালন করে। সে প্রতি দিন আমার কত কত এহসান করে চিন্তা করো। আর আমি তার সামান্য একটু কথা শুনতে পারবো না!’ এত সুন্দর জবাব শুনে বেদুইন খুশিমনে বউয়ের ঝগড়া সহিতে গেলো। স্ত্রীর কুরবানি ও খাটাখাটনিকে সামনে নিলে আর রাগ থাকে না, তাই না!

মেজাজ তিরিফি হলে পরে আপুরা স্বামীর ত্যাগ ও কষ্টকে সামনে আনবেন। একটা ভয়ের কথাও আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে জাহান্নামে নারীদের আধিক্য দেখেছেন। কারণের মধ্যে একটি হলো, মুহূর্তে স্বামীর সব অবদানকে অস্বীকার করে বসা^[১]—‘তোমার সাথে বিয়ে বসে কী পেলাম জীবনে, জীবনটা শেষ হয়ে গেলো আমার ইত্যাদি। সুতরাং, হুঁশিয়ার—সাবধান।

জবান ও রাগ সামলানো

বদধারণা আর অহংকার (নিজেকে ওর থেকে ভালো ভাবা) থেকে আসে জবান চালানো। আর জিহ্বার তরবারিতে কেটে টুকরো হয়ে যায় সম্পর্কগুলো। তৈরি হয় শত্রুতা। এ-জন্যই কথায় বলে, বোবার শত্রু নেই। জবানকে কাবুতে রাখা—এটা আলাদা একটা আলোচনার টপিক, বেশ বড় আলোচনা। টপিকে এসেই পড়েছি যখন, শুধু ঝগড়া আর গালি নিয়ে একটু বলে চলে যাই।

যে-হকের উপর থেকে ঝগড়া ছেড়ে দেয়, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য জান্নাতের কিনারে একটি ঘরের দায়িত্ব নিয়েছেন।^[২] ঝগড়ার সময় যে চুপ থাকে, ফেরেশতা তার পক্ষ নিয়ে জবাব দিতে থাকেন। একবার আবু বকর রা.-কে এক লোক গালিগালাজ করছিলো, তিনি চুপ ছিলেন;

[১] আস-সহিহ, বুখারি : ১৪৬১; আহমদ : ৫৩৪৩

[২] আস-সুনান, আবু দাউদ ৪৮০০

জোড়-মিল-মহব্বত

এই চুপ থাকা দেখে নবীজি মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। একপর্যায়ে আবু বকর রা.-ও তাকে কিছু পালটা জবাব দিয়ে দিলেন। তখন নবীজি সেখান থেকে উঠে চলে এলেন। বললেন, ‘যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে, একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষে ওকে জবাব দিচ্ছিলো। যখন তুমি জবাব দিয়ে দিলে, তখন ফেরেশতা চলে গেলো, একটা শয়তান এলো; আর আমি শয়তানের সাথে বসি না।’^[১]

গালিগালাজকারী দুইজনই দুইটা সাক্ষাত শয়তান; ^[২] চাই হকের পক্ষেরই হোন আর বাতিলের পক্ষেরই হোন। ঝগড়ার সময় অশ্লীল গালি দেওয়া মুনাফিকের আলামত, ^[৩] হক-বাতিল যা-ই হোন। আলি রা. বলেন, ‘মুর্খের হাতিয়ার হলো গালি।’ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিসক আর হত্যা করা কুফর। ^[৪] কাউকে গালি দিলাম মা-বাপ তুলে, সেও আমার মা-বাপকে গালি দিলো, যেন আমি নিজেই আমার মা-বাপকে গালি দিলাম, তাকে দিয়ে দেওয়ালাম আরকি। ^[৫]

রাগ থেকেই ঝগড়া। যার রক্তমাংস আছে শরীরে তার রাগ আসবেই, কিন্তু রাগ আয়ত্তে রাখাই ঈমানের মজবুতির পরিচয়। সে বীরপুরুষ না, যে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করে, বরং সেই আসল বীরপুরুষ যে রাগের সময় নিজেকে কাবুতে রাখে। ^[৬] রাগ নিয়ন্ত্রণের গভীর প্রভাব আছে স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে। সর্বক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার এই কৌশল রাসূল শিখিয়ে গেছেন আমাদের :

- ৷ রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। অতএব তাকে নেভাও পানি দিয়ে, রাগ এলে উষু করো। ^[৭]
- ৷ আর বেশি-বেশি ‘আউযুবিল্লাহ পড়া’। ^[৮]
- ৷ দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ এলে বসে যেতে হবে, বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়তে হবে। ^[৯]

[১] আল-মুসনাদ, আহনাদ : ১/ ৩৩৪

[২] সহিহ ইবনে হিব্বান : ২/২৩৩

[৩] আস-সহিহ, মুসলিম : ৫৮

[৪] আস-সহিহ, বুখারি : ৬০৪৪

[৫] আস-সহিহ, মুসলিম : ২৬৩

[৬] আস-সহিহ, বুখারি : ৬১১৪

[৭] আস-সুনান, আবু দাউদ : ৪৭৮৩

[৮] আস-সহিহ, বুখারি : ৩২৮২

[৯] আস-সুনান, আবু দাউদ : ৪৭৮২

৯৯ রাগ এলে চুপ হয়ে যাওয়া।^[১]

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝে এই বিষয়গুলো আরও প্রায়োগিক। দুজন কখনোই একসাথে রাগবেন না। একজন রাগলে আরেকজন চুপ, স্পিকটি নট। তা হলে দেখবেন মজা। রাগে ভাটা পড়ে এলে নিজেই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে। তখন বারগেইন করে নেবেন। আর দাম্পত্য জীবনে গরম রাগের চেয়ে ঠাণ্ডা রাগ বেশি লাভজনক। চিল্লাপাল্লা করার পর ওপাশ থেকে কোনো রেসপন্স না-এলে নিজেই অপরাধী মনে হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা রাগ দেখালে ওপাশ থেকে লাভজনক শর্তে সন্ধিপ্রস্তাব আসতে থাকে। হি হি।

মাফ করতে দেওয়া

আরেকটা গুণ পরস্পরে বন্ধন টিকিয়ে রাখে, সেটা হলো—একে অন্যকে মাফ করে দেওয়া। মাফ করার অভ্যাস গড়ে তোলা। যে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি মাফ করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি মাফ করবেন।^[২] আমি কারও দ্বারা শারীরিক কষ্ট পেয়ে তাকে যদি মাফ করে দিই, তবে আল্লাহ এই মাফের কারণে আমার একটি মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন (প্রোমোশন ধরে নিন) আর একটি গুনাহ মাফ করে দেবেন।^[৩] কেউ যদি তার অপরাধের স্বপক্ষে কোনো অজুহাত দেখায়, আর তা যদি আমি কবুল না-করি, মাফ না-করি, তবে অন্যায় ট্যাক্স আদায়কারীর মতো গুনাহ হলো আমার।^[৪] মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহর সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন :

- রাবিব, আপনার বান্দাদের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে ইজ্জতওয়ালা?
- হে মূসা, ঐ বান্দা, যে প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয়।^[৫]

আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, যে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে পৌঁছে গেলো, সে মহাসফলতা লাভ করলো। আমার এই সামান্য দুনিয়ার ক্ষতি মাফ করে দিয়ে যদি আমার গুনাহ মাফ করিয়ে নিলাম, তা হলে তো ‘মহাসফলতা’ পেয়ে গেলাম।

[১] আল-মুসনাদ, আহমাদ : ১/ ২৩৯

[২] সহিহ ইবনে হিব্বান : ২/২২২ সনদ সহিহ

[৩] আস-সুনান, তিরিমিযী : ১৩৯৩

[৪] আস-সুনান, ইবনে মাজাহ : ৩৭১৮

[৫] ইমাম বাইহাকি, শুআবুল ইমান ২/৩১৯ সূত্রে মুত্তাখাব হাদীস, পৃষ্ঠা: ৫২০, দারুল কিতাব

ওর থেকে ক্ষতিপূরণ আর কতটুকুই বা নিতে পারবো, এর চেয়ে মাফ করে দিয়ে লাভ বেশি না! মুমিন আখিরাতের ব্যাপারে ‘পুঁজিবাদী’, আখিরাতের ‘মুনাফালোভী’।

কারও ব্যাপারে বিদ্বেষ না-রাখা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, ‘বৎস, শোনো, তুমি যদি তোমার মনকে সকাল-সন্ধ্যা এমন রাখতে পারো যে, কারও ব্যাপারে তোমার মন বিন্দুমাত্র বিদ্বেষযুক্ত হয় না, তবে মনকে এমন করে রেখো; এটা আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহকে জীবিত করলো, সে আমাকে ভালোবাসলো। আর যে আমাকে আমাকে ভালোবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।’^[১]

আরেকবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন, এক সাহাবী ঢুকলেন। নবীজি বললেন, ‘তোমরা যদি জান্নাতি লোক দেখতে চাও, তা হলে এই ব্যক্তিকে দ্যাখো। এক-দু বার না, পর পর তিন দিন এভাবে বললেন। এক সাহাবীর খুব জানার আগ্রহ হলো, কী এমন আমল করে যে, নবীজি তাকে তিন দিন জান্নাতি বললেন! আমিও সেই আমল করে জান্নাত সিঁড়ি করে নেবো। তো এই সাহাবী সেই সাহাবীর বাসায় গিয়ে কোনো এক বাহানায় ৩ দিন মেহমান হলেন। আর সেই স্পেশাল আমলের তালাশে রইলেন। ৩ দিনে কোনো বিশেষ খাস আমল নজরে এলো না। শেষমেশ মুখ ফুটে বলেই বসলেন, ‘ভাই, আসলে আমি তো মুসাফির না। আসলে এই হলো ঘটনা। কিন্তু আপনার তেমন কোনো আমল তো দেখলাম না, খুব যে বেশি আমল করেন, তাও তো না। কাহিনি কী ভাই, একটু বলেন না?’ সেই সাহাবী কী বললেন? বললেন, ‘যা দেখেছো, তা-ই; তবে আমি অন্তরে কোনো মুসলিম সম্পর্কে বিদ্বেষ রাখিনি, আর কারও নিয়ামত দেখে হিংসে করিনি, ব্যস।’^[২] রায়িয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। কারও ব্যাপারে মন তিতা নেই—ছোট একটি আমল, কী বিপুল সামাজিক ও মনোদৈহিক প্রভাব, কী বিরাট বদলা!

দাম্পত্য জীবনকে আমরা ইগো দিয়ে কাঁটাতার দিয়ে দিয়েছি। কেন ভাই, বন্ধু হওয়া যায় না? মাঝে-মাঝে বলা যায় না—‘ওগো শুনছো, তোমার কদর করতে পারি না, মাফ করে দিয়ো।’ বলতে পারেন না মাঝে-মাঝে—‘তোমার হক আদায় করতে পারি না ঠিকমতো, মাফ করে দিয়ো। কী, প্রেস্টিজ যায়? যত বিদ্বেষ আর

[১] আস-সুনান, তিরমিযি : ২৬৭৮ হাসান

[২] আল-মুসনাদ, আহমাদ : ২/৩৩৪ সহিহ

মন-কম্বাকমি ঘরে এসে? নবীজি সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এটা মুনি পুরুষের শান নয় যে, সে তার মুনি স্ত্রীর ব্যাপারে বিদ্রোহ পোষণ করবে। যদি তার কোনো কিছু অপছন্দ হয়, তবে পছন্দ হবার মতোও কিছু থাকবে তার মাঝে।^[১] প্রতিদিনের ঝগড়া প্রতি দিন নিটিয়ে নেবেন। তিতা মন নিয়ে দুমুতে যাবেন না, খবরদার। দুজন দুজনাকে ‘আল্লাহর গিফট’ ভাবা চাই, যে-গিফটের কদর করা হচ্ছে না।

সালাম-মুসাফাহার প্রসার

নবীজি বলেছেন, ‘আমরা ওই পর্যন্ত জামাতে যেতে পারবো না, যে পর্যন্ত মুনি না-হুবা; ততক্ষণ মুনি হতে পারবো না, যতক্ষণ একে অপরকে মহব্বত না করবো, আর মহব্বত দুটির আনল বাতলে দিয়েছেন : পরস্পরের মাঝে সালামের দূর প্রসার করা।’^[২] কেবল সালাম দিতে বলেননি কিন্তু, সালামের প্রসার বর্ধিতে বলেছেন। আমাদের উন্নত হবার উপায়ই এই সালামের প্রসার।^[৩] শুধু পরিচিত লোকদের না, গণহায়ে সবাইকে সালাম দেওয়া চাই, একেই প্রসার বলে। শুধু পরিচিতকে সালাম দেওয়া কিরানতের আদানত;^[৪] সবচেয়ে কৃপণ, যে সালামের মতো অ-কষ্টনাশ জিনিস দিতেও কৃপণতা করে।^[৫] যত্নে ঢুকে সালাম, বের হবার সময় সালাম। মজলিসে গিয়ে সালাম, মজলিস থেকে ওঠার সময় সালাম। ছুটি সালাম করবে কতকে, চলমান সালাম করবে বনা-লোককে, কম সংখ্যক লোক সালাম করবে বেশি সংখ্যককে।^[৬] নবীজি ছোটদেরকেও সালাম করতেন। আমরা তো অবার সালাম পেতে চাই; দিতে নয়, পেতে ভালো লাগে। অথচ আগে যে সালাম করে, সে আল্লাহর নৈকট্যের উপযুক্ত হয়ে যায়,^[৭] অহংকারমুক্ত হিসাবে কাজে লাগে।^[৮] এটি আল্লাহর একটি নাম, যেটি আল্লাহ জমিনে নাবিল করেছেন;^[৯] কী বিশাল ব্যাপার, কী পরিমাণ বারাকতই এই সালামে! আর সালামের পরিপূর্ণতা

[১] অল-মুজিত, মুসলিম : ৩৬৪৫

[২] অল-মুজিত, মুসলিম

[৩] তবরানি : ৩/৪৫২ বনদ হাসান

[৪] মুসনাফে অতমাদ

[৫] অল-আবদুল মুকরাদ, দুপারি : ১০৪২

[৬] অল-মুজিত, দুপারি : ৬২৩১

[৭] অল-মুনান, আবু কজি : ৫১৯৭

[৮] শুরাবুল ইমান, বাইহাকি : ৮৪০৭

[৯] তবরানি, বাসার

জোড়-মিল-মহনত

হুনা নুসাকাহা; ^[১] আনি যদি চাই আমার সালান পরিপূর্ণ হোক, তবে হাত মিলিয়ে
নুসাকাহ করবো। আর নুসাকাহ দ্বারা তিনো খতম হয়, আর হাফিয়া দেবার দ্বারা
কুমনি দূর হয়ে ভালোবাসা তৈরি হয়। ^[২]

একসাথে খাওয়া ও খাওয়ানো

একসাথে বসে খেলে মহনত পরদা হয়। নবীজি সালামুয়াহ আলহিহি ওয়াসাল্লাম
অম্বাদের একসাথে খেতে তাগিদ করেছেন।

জাহশি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ইয়া রাসূদুয়াহ, আমরা আহর
করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না।’ তিনি বলেন, ‘তোমরা হঠাৎ পৃথক-
পৃথকভাবে আহর করো।’ তারা বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বলেন, ‘তোমরা একত্রে
আহর করো এবং আহরকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তা হলে তোমাদের
বাসে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে।’ ^[৩]

উমর ইবনুল খাতাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূদুয়াহ সালামুয়াহ আলহিহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা একত্রে আহর করো এবং বিচ্ছিন্নভাবে সেরো
না। কারণ, বরকত থাকে সমষ্টির সাথে।’ ^[৪]

বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিচ্ছে। রুয়েল সোসাইটির বায়োমেডিক্যাল সার্ভেস
বিভাগের করাতে একটি রিসার্চ পেপার ^[৫] প্রেতি করেছেন Jennifer Verdolin,
Ph.D, যিনি Duke University-তে সেন্সরদের ওপর গবেষণা করছেন animal
behavior expert হিসেবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গবেষণায় বলেছেন, স্বাবর
ভগ্নভাগি করে খাওয়ার পর শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে oxytocin হরমোন সোভেন
বোড়েছে। Dr. Whiting এবং তাঁর সহকর্মীগণ প্রস্তাব করেন, স্বাবর ভাগ করে
খাওয়ার (food sharing) কারণে প্রচুর oxytocin হরমোন স্রবণ হয়, যা দুজন
অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক বন্ধন ও সহযোগিতাকে দৃঢ় করে। (facilitate
bonding and cooperation between unrelated individuals.)

[১] অস-নুসান, তিরমিদি : ২৭৩০; অস-জামিউল সগির, সুহুতি : ৩২৩৮

[২] মুসাদ্দ মাজিক : ৭০৬

[৩] অস-নুসান, ইবনে মাজা : ৩২৮৬, আহমাদ : ১৫৬৪৮, সিলসিলাতুল সহিহ : ৩৬৪ (iHadiis)

[৪] অস-নুসান, ইবনে মাজা : ৩২৮৭ (iHadiis)

[৫] <http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1772/20133096>

Oxytocin হরমোনটা মা-শিশু বন্ধন তৈরির জন্য বেশি পরিচিত। শিশু স্তন্যপান করলে মায়ের হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। এ-জন্যই বলা হয়, জন্মের সাথে-সাথে বাচ্চাকে মায়ের কাছে দিতে দুধ খাওয়ানোর জন্য। মূলত ‘বন্ধুত্ব থেকে প্রেম’—সব ধরনের যুগল বন্ধন ও সামাজিক অনুভূতির জন্য প্রধানত এই হরমোন কাজ করে, যা অধিক নির্গত হয় খাবার ভাগাভাগি করে খেলে।

একটি সুরত হতে পারে, একই টাইমে একসাথে বসে খাওয়া সবাই মিলে। আরেকটু এগিয়ে একই দস্তরখানে খাওয়া বা একই বাসনে। এক বাসনে মুড়ি-চানাচুর মাখা বা হোনামুড়ি তো খাওয়াই যায়। এক পাত্রে গোশত রেখে রুটি-পরোটা দিয়ে খাওয়াই যায়। ভাত খেতে একটু সমস্যা হতে পারে। স্বামী-স্ত্রী এক প্লেটে ভাতও খাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীতে ভাত-রুটি খেলেন, বাপ-ছেলে রুটি-গোশত-সবজি খেলেন, শাশুড়ি-বৌমা মুড়িমাখা খেলেন। পারিবারিক সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হলো, ভালোবাসার অনুভূতিগুলো আরও শার্প হলো। মসজিদেও মাঝেসাজে মুসল্লিরা মিলে একত্রে খানাপিনার আয়োজন সামাজিক সম্পর্ককে আরও কংক্রিট করবে। কোনো উপলক্ষ নেই, এমনিই।

জামাআতে মিশে-মিশে দাঁড়ানো

নুমান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নেবে, তা না হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।’^[১]

হয়েছে? পেলেন তো কারণ খুঁজে। আমাদের মাঝে এত ভাগাভাগির বুনিয়াদি একটি কারণ এটি। যদি জিজ্ঞেস করি, ‘হানাফি মাযহাবের মাসআলার জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক লেভেলের বই কোনটি? ব্যাপকভাবে পরিচিত ও পঠিত?’ বেহেশতী জেওরের নামই সবার আগে আসবে। সেই বাচ্চাদের কিতাবেই লেখা আছে^[২]:

কাতার সোজা করা, টেরা-বাঁকা হইয়া না-দাঁড়ানো এবং মাঝে ফাঁক না-রাখিয়া পরস্পর গায়ে-গায়ে মিশিয়া দাঁড়ানো ওয়াজিব। এবং ইহার জন্য মুছল্লীগণের আদেশ ও হেদায়েত করা ইমামের উপর ওয়াজিব। এবং মুছল্লীগণের সেই আদেশ পালন করা ওয়াজিব। (কাতার সোজা করার নিয়ম এই যে, কাঁধের সাথে কাঁধ ও

[১] সহীহুল বুখারি ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযি ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবু দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, ইবনে মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯ রিয়াদুস সলেহিন ১৬৪

[২] বেহেশতী জেওর, ১ম খণ্ড পৃ: ১৪৩, মাসআলা ১৬

জোড়-মিল-মহব্বত

গায়ের টাখনার গিরার সাথে মিলাইয়া বরাবর করিবে; কাহারও পা লম্বা ও খাট হওয়াবশত অঙ্গুলি আগেপিছে থাকিলে তাহাতে কোনো দোষ নাই।)

তো এই লেখা দেখে এবং আমাদের কাতারের বেহাল দশা দেখে আমার মনে প্রশ্ন এলো, কাতারের লাইন তো টানাই আছে, আবার ‘কাতার সোজা করুন’— এটা বলার কী আছে। হ্যাঁ আছে, লাইন দিয়েও আমাদের কাতার সোজা হয় না, বেহাল করে দেখবেন। কোনো মতে কাতার সোজা হলেও মধ্যে-মধ্যে আবার এত বেশি ফাঁকা থাকে যে, সেই ফাকে শয়তান এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য বথেঁট। হাদীসে যেভাবে ফাঁক বন্ধ করে দাড়াতে বলা হয়েছে, সেটা আমরা করি না।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা সালাতের ইকামত দেওয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে অভিযুগ্ম হয়ে বললেন, ‘তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো এবং গায়ে-গায়ে মিশে-মিশে দাঁড়াও। কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার পেছন দিক থেকেও দেখতে পাই।’^[১]

তো নবীজির এই নির্দেশ তো ক্লিয়ার। তা হলে সাহাবারা এই নির্দেশ পালনের জন্য কী করতেন? কীভাবে গায়ে গা মেশাতেন?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা তোমাদের কাতারসমূহকে সোজা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকে আমার পেছন দিক থেকে দেখতে পাই। তো আমাদের একজন তার কাঁধে অপরজনের কাঁধের সাথে এবং তার পা অপরজনের পায়ের সাথে মিলিয়ে দিতো।’^[২]

নবীজির এই নির্দেশ পালনে তাঁরা কেমন সিরিয়াস ছিলেন? কেমন চেষ্টা করতেন?

নুমান ইবনু বাশির বলেন, ‘আমি ব্যক্তিকে দেখতাম তার কাঁধকে তাঁর পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সঙ্গে এবং তার হাঁটুকে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির হাঁটুর সঙ্গে এবং তার টাখনুকে তার টাখনুর সঙ্গে মিলিয়ে দিতো।’^[৩]

[১] সহিহ বুখারি, হাদীস ৭১৯

[২] সহিহ বুখারি, হাদীস ৭২৫

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬২

কুররাতু আইয়ুন ২

এ-সব হাদীসে কাতার সোজা করার দুইটা ফর্মুলা বলা হয়েছে। কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলানো। ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। আক্ষরিক অর্থেই পুরো সালাতে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতে হবে, নাকি এটি শুধু সালাতের শুরুতে কাতার সোজা করে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, সেই বিষয়ে দুই ধরনের মতামতই রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত, তা হলো, কাতার সোজা রাখতে হবে; টেরা-ব্যাকা করা যাবে না এবং দুই ব্যক্তির মধ্যখানে অতিরিক্ত ফাঁকা রাখা যাবে না; নইলে ফাঁকে শয়তান এসে উপস্থিত হয়।^[১] আপাতত মতভেদ এড়িয়ে আমরা এই দুইটা বিষয় নিশ্চিত করতে পারি—চাই তা যে-মত মেনেই হোক না কেন। মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া আমাদের কাম্য।

অনুপস্থিতিতে দুআ করা

আমার মসজিদের জিম্মাদার প্রফেসর শিহাবউদ্দিন খান সাহেবের মুখে শুনেছি। খুব সম্ভব উনি শুনেছিলেন মদীনার জিম্মাদার মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রাহিমাহুল্লাহর মুখে। আপনি যদি কারও সাথে মহব্বত গড়তে চান, তবে ৪টি কাজ করতে হবে :

- ৞ তার দোষ গোপন করা
- ৞ তার দোষ চোখে পড়লে ভালো ব্যাখ্যা করা
- ৞ পশ্চাতে তার গুণ আলোচনা করা
- ৞ অসান্নাতে তার জন্য দুআ করা

এই ৪টি কাজ করলে আল্লাহ তার মনে আমার জন্য মহব্বত ঢেলে দেবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘দ্রুত কবুল হওয়ার মতো দুআ হলো এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দুআ।’^[২]

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের মাঝে জোড়-মিল তৈরি হবে। ভালোবাসা তৈরি হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন জিবরিলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।’ অতঃপর জিবরিল

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬

[২] আদাবুল মুকরাদ, বুখারি : ৬২৭, ৬২৯ (iHadis)

আ. তাকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর আকাশবাসীকে বলে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতএব তোমরা তাকে ভালোবাসো’, তখন আকাশের সকল ফেরেশতা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর সে-ব্যক্তির জন্য জমিনেও জনপ্রিয়তা দান করা হয়।’

আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরিলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো’; তখন জিবরিলও তাকে ঘৃণা করেন। এরপর আকাশবাসীকে বলে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করো’; তখন আকাশবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর তার জন্য জমিনেও মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়।^[১]

আর আল্লাহর ভালোবাসা পাবার রাস্তা একটাই—সুন্নাহের ইত্তেবা।

‘(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার ইত্তেবা (অনুকরণ) করো; তা হলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।’^[২]

দেখবেন, কোনো অফিসে সুন্নাহর উপর কাউকে দেখলে ভরসা তৈরি হয়, আশা জাগে। আরেকজন দর্শনধারী সুন্নাহওয়ালা দেখলে ভালো লাগে, স্বস্তি লাগে। এটা ওই ভালোবাসার কারণে। এ-জন্য নিজেও সুন্নাহের ব্যাপারে কোনো ছাড় না-দেওয়া, আরেকজনকেও সুন্নাহের দিকে আনার চেষ্টা করে যাওয়া, দাওয়াহ-নাসিহাহ করতে থাকা।

সুন্নাহের ইত্তেবার সাথে আরও কিছু কাজ আছে। বেশি-বেশি নফল আমল করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘যে-ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। ফরয আহকাম ছাড়া অন্য কোনো পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দা নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি।

[১] মুসলিম, মিশকাত ৫০০৫ (iHadis)

[২] সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১

সুতরাং আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি।' [১]

অর্থাৎ আল্লাহ যে আমাকে ভালোবেসেছেন, তার আলামত হলো, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার আরও বেশি আল্লাহর হুকুমের অধীন হয়ে যাচ্ছে কি না। অর্থাৎ আমাদের দেহের ব্যবহার সঠিক করার চেষ্টা করছি মানে, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসছেন। সবাই মিলে গুনাহ ছাড়ার প্রচেষ্টা দ্বারা জোড়-মিল বাড়তে থাকে।

আরেকটি কাজ হলো—দাওয়াহ। আরেকজনকে আল্লাহর প্রিয় বানানোর চেষ্টা করতে দেখলে আল্লাহ আমাকেও প্রিয় বানিয়ে নেবেন। সমাজে ব্যাপক দাওয়াহর দ্বারা সবাইকে সব বিষয়ে সুন্নাহর ইত্তেবা, নফল আমাল বৃদ্ধি (ফরযের কথা বলাই বাহুল্য) ও গুনাহ ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকলে করনেওয়ালারা আল্লাহর প্রিয় হতে থাকবে। এই দাওয়াহতে সাড়া দিয়ে যারা-যারা আল্লাহর প্রিয় হতে থাকবে, তাদের মাঝে আল্লাহ জোড়-মিল সৃষ্টি করে দেবেন। এ-জন্য বিতর্ক সৃষ্টিকারী মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সাইডে রেখে অবিসংবাদিত বিষয়গুলোর দাওয়াহ ব্যাপকভাবে দায়িত্বের সাথে করা দরকার।

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, 'একবার নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। তাঁর চেহারা মোবারক দেখে মনে হলো, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে। তিনি কারও সাথে কোনো কথা না-বলে উঠে করে মসজিদে গেলেন। কী বলেন শোনার জন্য আমিও ঘরের দেওয়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলাম। মিস্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাকো। নইলে অচিরেই এমন সময় এসে যাবে যে, তোমরা দুআ করবে, কিন্তু কবুল হবে না। তোমরা চাইবে, কিন্তু চাওয়া পূরণ করা হবে না। তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার কাছে সাহায্য চাইবে, কিন্তু আমি সাহায্য করবো না।' কথা কটা বলেই তিনি মিস্বর থেকে নেমে এলেন।' [২]

[১] বুখারি ৬৫০২ (iHadis)

[২] ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান সূত্রে তারগিব

জোড়-মিল-মহব্বত

আরেক হাদীসে এসেছে, যখন একে অপরকে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে।^[১] আজকের দুনিয়ার দিকে চেয়ে এ-ছড়া আর কী নজরে আসে? আজ লক্ষ-লক্ষ হাফেজ কুরআন পতন করে চাচ্ছে, লক্ষ-লক্ষ উলামায়ে কিরাম হাদীস-কুরআন-ফিকহের চর্চা করছেন, শেষরাতে চাইছেন; ফি-বছর লক্ষ-লক্ষ হাজি হজ্জ করছেন, আরাফাতে 'লাব্বাইক' শ্রুতিতে ধর্মা দিয়ে চাচ্ছেন, কোটি-কোটি মুসলিম তাওয়াফে একবার হলেও গিলাফ ধরে চাচ্ছেন, আনাচে-কানাচে লাখো মজলুম মুসলিম রক্তে-অশ্রুতে-ঘামে-খুলিতে লুটিয়ে পড়ে চাচ্ছে, মজলুম কাফির হলেও তার দুআ কবুল বলেই তো জানি। তা হলে কেন? আমরা কী তাঁর দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছি? সর্বদ্রষ্টা তিনি কি দেখেও দেখছেন না? হাদীস দুটো থেকে বোঝা যায় অনেক কিছুই। দাওয়াহ-নাসিহর সামষ্টিক অফিসিয়াল দায়িত্ব না পালনের কারণেই কি এত কিছু? শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর গালিগালাজকেই দ্বীনের কাজ মনে করে নিয়েছি বলেই কি নজর থেকে পড়ে গেলাম? কী জানি বাপু, মুখ্যসুখ্য মানুষ।

[১] হাকেম তিরমিযির সূত্রে দুররে মানসুর

গোনায ধরার টাইম নাই

[৯]

তখন ডিজ্যুস সিম এসেছে। উঠতি ছেলেমেয়েরা কথা বলছে রাত জেগে আর দিনের বেলায় ঢুলছে। ডিজ্যুসের অ্যাডগুলোও ওভাবেই বানাতো, যাতে যুবকেরা আকৃষ্ট হয়। জটিল মুড, কঠিন ভাব। বয়েসটাতে ব্যতিক্রম হতে মন চায়। আর দশটা ছেলের মাঝে আমাকে যেন আলাদা করে চেনা যায়। অবশ্য কিছু করারও নাই সেক্যুলার দুনিয়ার। হরমোনগত কারণে ছেলেদের মাঝে নিজেদেরকে মেলে ধরার প্রবণতা কাজ করে। মাথায় তেল দিয়ে ডাইনে সিঁথি করা ছেলেটা হার্ড জেল মেরে সজারু সাজে। হাতে একগাদা ব্যান্ড-ব্রেসলেট। ফরমালদের ভিড়ে একজন লুজ-ইন বা ব্যাগি জিন্স। এ-সব তখন কেবল শুরু হয়েছে। একপাল গুডবয়ের মাঝে একজন এলোমেলো, আউলাঝাউলা। ভেড়ার পালে বাছুর পরামানিক। গুনলাম না তোমাদের সমাজকে। হতে চাই না তোমাদের মনের মতো।

চেনা এক ভাই। আর্মি অফিসার হিসেবে আইএসএসবিতে সিলেক্টেড হলেন। ৩ দিনের আইএসএসবি পরীক্ষা শেষে ডিপি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১০ জনের গ্রুপের উদ্দেশ্যে জানানলেন, ‘এই ১০ জনের মাঝে ১ জনের গ্রিনকার্ড মিলেছে; ‘কিন্তু আমি জানি, সে আর্মিতে আসবে না, এই তুমি সত্য করে বলো তো, ইউ আর সিলেক্টেড এনিওয়ে, তুমি কি আসবে?’ গ্রিনকার্ড পাবার পর বাবা-মা থেকে নিয়ে পুরো গুপ্তি হামলে পড়লো, ‘বাবা তোমাকে যেতেই হবে, আমাদের দিকে তাকিয়ে হলেও।’ বাপকে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের ভাষায় জানিয়ে দিলো, ‘বাবা, আমি আর্মিতে গেলে আর্মি চিফ হবো, আর আর্মিতে না-গেলে প্রেসিডেন্ট হবো; তুমি বলো, আমাকে কী দেখতে চাও!’ ব্যাপক পাঁট। ‘তোমরা যেটাকে আরাধ্য মনে করো, আমি সেটাকে ফুটো পয়সা দাম দিই না। আমি উল্টো পথে চলতে চাই।’ একটা গানের লাইন কি না, জানি না, তবে লাইনটা দারুণ—

গোনায় ধরার টাইম নাই

‘পথ হারাতে আমি যে আজ পথে নেমেছি, সোজা পথের কাদায় আমি অনেক মেখেছি...’

বয়সের কারণে একসময় এগুলো ভালো লাগতো। বিষয়গুলোর মধ্যে একধরনের নরম উদ্ভূত আছে, লুকোনো অহমিকা আছে। দুনিয়ার ব্যাপারে বিষয়গুলো ঝুঁকিপূর্ণ, অহংকার প্রকাশ হয় কিছুটা। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এই ‘ড্যাম কেয়ার’ জিনিসটা দারুণ। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তরবারি ‘যুলফিকার’ হাতে নিয়ে বললেন, ‘কে আছে এই তরবারির হুক আদায় করবে?’ আলি রা. ও যুবাইর ইবনু আওয়াম রা.-এর মতো বীর-বাহাদুর নিজেদেরকে পেশ করলেন। তাঁদেরকে রেখে নবীজি তরবারি দিলেন আনসারি সাহাবী আবু দুজানা রা.-কে। তিনি সৈন্যবাহিনীর সামনে দিয়ে লাল পাগড়ি বেঁধে সেই তরবারি নিয়ে উদ্ভূত দাস্তিক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটা যদি যুদ্ধক্ষেত্র না-হতো, তবে আল্লাহ এমন হাঁটাকে খুব অপছন্দ করেন।’ [১]

একদিন একটা ঘটনা পড়ে লোম দাঁড়িয়ে গেলো, চোখের পানিতে ভিজে গেলো মন। একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের কাহিনি। শত্রুজাতির মায়েরা তার ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতো। মনে করেন, ‘চিন আর রাশিয়া দখলকারী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট’ আজকের দুনিয়ায় কেমন আলোচনার টপিক, সেই সম্রাটও তেমনি! পারস্য সাম্রাজ্য আর বাইজান্টাইন (পূর্ব রোমান) সাম্রাজ্যের মতো দু-দুটো সুপার পাওয়ার তখন তাঁর কমান্ডে অধিকৃত। আর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন কমজোর দুর্বল এক জাতির। রোমান দূত এসে খুঁজছেন—

- তোমাদের সম্রাট খলিফা উমরের মহল কোথায়?
- ঐ যে, ওদিকে।

ছোটবেলা থেকে রাজা, মন্ত্রী, আমলাদের রাজকীয় প্রটোকল দেখে-দেখে বড়-হওয়া দূত সাহেব বিস্ফোরিত নয়নে আবিষ্কার করেন গাছের ছায়ায় চাটাইয়ে-শোয়া সম্রাটকে। রোদ এসে পড়েছে, শরীর থেকে দরদর করে পড়ছে ঘাম, ভিজে গেছে চাটাই। চাবুক বালিশের মতো করে রাখা, গভীর ঘুম। দুইটা সুপার পাওয়ার যাঁর অধীনে; আরও সুপার, সেমি-সুপার সবাই থরথর—কবে উমর না আবার এসে পড়ে; বড় আজিব এ-সম্রাট; এ-সম্রাটের মহল নেই, দরবার নেই, মুকুট

[১] আল-মাজমু শরহুল মুহাযযাব, নববী : ২৪/১৩৭

কুররাতু আইয়ুন ২

নেই, দাস-দাসী পাইক-পেয়াদা নেই; এ-সম্রাটের সাম্রাজ্য কেবল দুনিয়াতেই না, আখিরাতেও যে বিস্তৃত। খলিফার এই অবস্থা দেখে দূত বেচারার সেই কালজয়ী মন্তব্য : O Umar! You ruled, you were just. Thus you were safe. And thus you slept.

হে উমর, আপনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই নিরাপদে শুয়ে আছেন। অথচ আমাদের রাজা-বাদশারা নিরাপত্তার ভয়ে নির্ধুম রাত কাটায়। আম সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার দ্বীন সত্য। আমি যদি দূত হিসেবে না-আসতাম, তবে এখনই আপনার দ্বীন কবুল করতাম। তবে আমি পরবর্তীতে এসে ইসলাম গ্রহণ করবো।^[১]

রাষ্ট্রপ্রধান হবার পর একবার তিনি জনসমক্ষে ভাষণ দিচ্ছিলেন, ১২ তালি দেওয়া কাপড়ে।^[২] তাওয়াফ করার সময় একজন গুণলেন ১২টা তালি, একটা আবার লাল চামড়ার!^[৩] চমকদার পোশাক-প্রাসাদ-দরবার-মুকুট-প্রটোকল এ-সব গোনার টাইম নেই এদের। তোমরা যে-সব জিনিসকে ইজ্জতের মনে কর, আমরা সে-সব ছাই দিয়েও পুছি না।

পারস্যের 'শাহানশাহ' খসরুর এক বিশাল মুকুট ছিলো। সেটা আসলে পরা হতো না, পরা যেতোও না, অনেক বড়। দুই নফর দুই দিক থেকে মাথার উপর ধরে রাখতো—ওটাই ছিলো ওদের পাট। তো পারস্য জয়ের পর গনিমতের মাল হিসেবে যখন সেটা মদীনায় এলো, মসজিদে নববীতে সেটার ঠাই হলো, মুসল্লিদের পায়ের লাথিতে-লাথিতে সেটা এদিক-ওদিক গড়াগড়ি খেতো। এটা ছিলো আমাদের পাট—গুনলাম না, যাহ।

[২]

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পাদরিরা সিদ্ধান্ত নিলো, আমরা খলিফা উমরকে সরাসরি শহরের চাবি তুলে দেবো। আমাদের আর্চবিশপ ফাদার সফ্রনিয়াস (Patriarch Sophronius) ওদের খলিফা উমরকে শহরের দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। জেরুসালেম-বিজয়ী সম্রাটের যে-আলামতগুলো কিতাবে বলা আছে, সেগুলো মিলে গেলে তো আর তাকে খামোখা আটকিয়ে লাভ নেই। বেহুদা রক্তক্ষয় না-করে ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। আর আলামত না-মিললে দেখা যাবেখন।

[১] আখবারু উমার, পৃ ৩৩২ সূত্রে উমার রা. সম্পর্কে ১৫০ টি শিক্ষণীয় ঘটনা, পীস পাবলিকেশান

[২] ইমাম আহমদের কিতাবুয যুহুদ সূত্রে ড. আলি সাল্লাবির উমার রা., কালান্তর প্রকাশনী, পৃ. ১/২৭২

[৩] তাবাকাতুল কুবরার বিশুদ্ধ সূত্রে আলি সাল্লাবি, প্রাগুক্ত

গোনায ধরার টাইম নাই

খলিফা উমর সিরিয়া হয়ে জেরুসালেম যাবেন। সিরিয়ান কমান্ডের প্রধান জেনারেল আবু উবাইদা ইবন জাররাহ রা. নিজ বাহিনীসহ এগিয়ে এলেন খলিফাকে প্রটোকল দেবার জন্য। এক তো উটে চড়ে এসেছেন—বাহন হিসেবে অনারবদের চোখে ‘বাইসাইকেল’ সমমর্যাদার; তায় আবার উটের উপরও তিনি নেই, লাগাম ধরে-ধরে পানির স্রোত পেরোচ্ছেন! পরনে একটা চাদর, সফরের কারণে ধূলিমলিন; পায়ের মোজা খুলে কাঁধে নিয়েছেন, অনেকটা আমাদের জুতো বগলে নেবার মতো, আর মাথায় পাগড়ি!

মুসলমানদের সম্রাটের এই দীনহীন অবস্থা দেখে মুসলিমদের সম্পর্কে হেয় ধারণা করবে, এই আশঙ্কায় আবু উবাইদা রা. জিভ কেটে বললেন, ‘আমীরুল মুমিনিন, এ কি করছেন! শহরের লোক দেখলে কী বলবে?’

খলিফা জেনারেলের বুকে হাত মেরে জবাব দিলেন, ‘ওহ আবু উবাইদা, যদি তুমি ছাড়া আর কেউ আজ এ-কথা বলতো, আমি তাকে এমন শাস্তি দিতাম, পুরো উম্মাত তা মনে রাখতো। আমরা তো লাঞ্ছিত জাতি ছিলাম। আল্লাহ ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। আজ সেই ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজতে গেলে আল্লাহ আবারও আমাদের লাঞ্ছিত করে দেবেন।’

লোকেরা বললো, ‘শামদেশের বিশিষ্টজনেরা আপনার সাক্ষাতের জন্য আসবে। আপনি যদি একটি তুর্কি ঘোড়ায় চড়তেন, তবে ভালো হতো!’

খলিফা আবার জবাব দিলেন, ‘তোমরা ভাবছো, সম্মান এগুলো থেকে আসে? (দুনিয়ার বস্তু দ্বারা) কখনো না; বরং, সম্মান আসে ওখান থেকে (আকাশের দিকে ইশারা করে)। ছাড়ো আমার উটের পথা।’

[৩]

খলিফা রওনা হলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের পানে। উটে হাওদা নেই, জিন নেই, পা-দানি নেই; সাথে একমাত্র গোলাম আসলাম রহ.। একটা পশমি চাদর—ওটাই জিন, ওটাই বিছানা। একটা থলি আছে—ওটাই গদি, ওটাই বালিশ। লম্বা চেকের জামার এক পাশ ছিঁড়ে গেছে। জাবিয়া নগরে জেরুসালেম কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি হবে। সবাই সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষায়, সম্রাটের রাজকীয় প্রটোকল দেখবার জন্য। তাও কি যে সে সম্রাট, খলিফা উমর ইবনু খাত্তাব রা.ক! দুই পরাশক্তিকে পরাজিতকারী পরাক্রমশালী সম্রাট! দূর থেকে কীসের যেন নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। কিছু পরে বোঝা গেলো, উটের পিঠে কেউ একজন আসছে। একটু পর বোঝা

কুররাতু আইয়ুন ২

গেলো একজন না, দুজন। একজন উটের পিঠে, আরেকজন লাগাম ধরে সামনে-সামনে। কাছে আসতেই দেখা গেলো, উটের দড়ি ধরে আসছেন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার বিক্রমশালী সম্রাট। আর উটের পিঠে ক্রীতদাস আসলাম রহ। কী একটা অবস্থা দেখুন তো! আপনাদের ওসব শানশওকত, ভাবসাব, রাজকীর ভয়, প্রটোকলটল এসবের খারই খারি না, গুনিই না, টাইমই নাই।

- তোমাদের প্রধান কে?

- জি, ইনিই।

- ‘আমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে একটু। সেলাইয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আর ততক্ষণ আমাকে একটা কাপড় ধার দিন’।

১২৬৫ কিলোমিটার সফর করছেন এক কাপড়ে। তাও কতগুলো তালি। শখ করে? একবার জুমআর দিনে ঘর থেকে দেহরিতে বেরোলেন। কারণ দর্শালেন—‘একমাত্র জামাটা শুকোতে দেহি হচ্ছিলো, তাই।’^[১]

জামা খুলে দিলেন, চমকদার নতুন একটি জামা দেওয়া হলো। ‘কী কাপড় এটা?’ ‘কাতানা।’ ‘কাতান কী কাপড়?’ তাঁকে বোঝানো হলো, কাতান কেমন কাপড়। ও, কাতানের কথা আসতেই আরেকটি কাহিনি মনে পড়ে গেলো। আবু হুরাইরা রা. তখন বাহরাইনের গভর্নর। কাতানের কাপড় দিয়ে নাক সাফ করছেন আর আনমনে বলছেন, ‘হে আবু হুরাইরা, নিজের দিকে চেয়ে দ্যাখো। ক্ষুধার ছালায় পড়ে থাকতে, মানুষ মৃগী রোগী ভেবে গলা পাড়াতো; আজ কাতানের কাপড় দিয়ে নাক সাফ করছো।’^[২] দুনিয়ার চাকচিক্য দেখার-বোঝার-শেখার টাইম নাই, বস। যেগুলো তোমরা পরে ভাবে বাঁচো না, আমরা ওসব দিয়ে পাও মুছি না, সর্দি মুছি এগুলো দিয়ে আমরা।

[১] ড. সাল্লাবির উমার রা., কালান্তর প্রকাশনী, ১/২৭৩

[২] মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা একদিন আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তার দেহে দুটি কাতানের কাপড় (অর্থাৎ একটি কাতানের চাদর ও একটি লুঙ্গি) শোভা পাচ্ছিলো। আবু হুরাইরা রা. তার একটি দ্বারা নাক পরিষ্কার করছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন—‘বাহ, বাহ আবু হুরাইরা, কাতানের কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছো! অথচ একসময় এমন ছিলো, যখন আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বর এবং আয়েশা রা.-এর ছত্‌রার পাশে পেটের ছালায় কাতর হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতাম। প্রায় আগন্তুকই আমাকে মৃগী রোগী মনে করে গর্দানে পা দিয়ে আঘাত করতো। প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে উন্মাদনার লেশমাত্র ছিলো না, বরং প্রচণ্ড ক্ষুধার ছালাতেই আমার এ-অবস্থা হতো। শামায়েলে তিরমিযি ৫৬, সহিহ বুখারি ৭৩২৪ (ihadis)

গোনার ধরার টাইম নাই

আবু হুরাইরাহ রা.-এর আরেকটি ঘটনা আছে। তিনি প্রথম জীবনে বুসরা বিনতে গাযওয়ান নাম্নী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন। পরে উসমান রা. তাকে মুক্তি করে আযাদ করেন। গোলামির জীবনে মালিকা তাকে খুব কষ্ট দিতো। তাঁর মালিকা ছিলেন খুব অহংকারী, তাঁর বহু বিবাহের প্রস্তাব আসতো, কিন্তু সে কউকেই যোগ্য মনে করতো না। আবু হুরাইরাহ ইসলাম কবুল করলেন। হুরাইনের গভর্নর হলেন একসময়। তখন একদিন একটি চিঠি পেলেন—‘আমি বুসরা বিওতে গাযওয়ান। শুনেছি, তুমি ইসলাম কবুল করে আমির হয়েছো। আমি নিজেকে তোমার নিকাহের জন্য পেশ করছি।’^[১] কী একটা অবস্থা, দেখেন দেখি! প্রত্যাখান করতে পারলে আরেকটু ভাব হতো। কিন্তু সাহাবীরা তো আমাদের মতো ফ্যান্টাসিতে ভুগতেন না, বাস্তববাদী ছিলেন, নিকাহ করে নিলেন।

তো উমর রা. সেই কাতানের জামাটা পরলেন মাথা গলিয়ে। খানিক বাদে তলি লাগিয়ে ধুয়ে আগের কাপড়টা আনা হলো। দামি কাপড় ফেরত দিয়ে নিজের শতচ্ছিন্ন কোর্তাই আবার পরে নিলেন। আর্চবিশপ বললেন,

- ‘আপনি আরবদের বাদশাহ। আমাদের এলাকায় উটে চড়াইকে ভালো বলে না। আপনার এই পোশাকও মানায় না। আপনি যদি ভালো একটা জামা পরতেন, আর একটা তুর্কি ঘোড়ায় চড়তেন, তবে রোমানদের চোখে আপনার সম্মান বাড়তো।’
- ‘আমাদের সম্মান দেওয়া হয়েছে ইসলাম দ্বারা। সম্মানের জন্য আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।’

তোমাদের দেওয়া সম্মান, তোমাদের চোখে বড় হওয়া, তোমাদের কাছ ভালো হওয়ার কানাকড়ি পরিমাণ মূল্য আমার কাছে নেই। হায় হায়, আমরা নাকি এঁদের উত্তরসূরি! কাফিরদের কাছে উন্নত হওয়া, কাফিরদের চোখে মধ্য আয়ের দেশ হওয়া, তাদের কাছে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য, তাদের নারী সূচক, মানব-উন্নয়ন সূচকে উপরে উঠার জন্য, তাদের দেওয়া টার্গেট-গোল পূরণ করে স্বীকৃতি পাওয়ার

[১] আবু হুরাইরাহ রা.-এর সাথে বুসরা বিনতে গাযওয়ানের ঘটনাটি সহিহ [https://bit.ly/3bBO4yu]
আবু হুরাইরাহ রা. বলেন, ‘আমি ইয়াতিম অবস্থায় বড় হয়েছি। গরিব অবস্থায় হিজরত করেছি। চাকরি করতাম গাযওয়ানের মেয়ে বুসরার অধীনে। উট চরাতাম, পথচারীদের কাজকর্ম করতাম। তারপর আল্লাহ বুসরাকেই আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দিলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন, আর আমাকে ইমাম বানিয়েছেন।

কুররাতু আইয়ুন ২

জন্য আজ আমরা কত ব্যাকুল। আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা নেই, নবীর সুন্যাহর পরোয়া নেই। শরিয়্যা আর শরিয়্যার ধারকেরা আমাদের কাছে অপাঙ্ক্তেয়! যত দিন আমরা ড্যামকেয়ার ছিলাম, সবাই আমাদের কেয়ার করে চলেছে। আজ সবাইকে কেয়ার করতে গিয়ে নিজেরা খেলো হয়ে গেছি। আহ, সেইদিনগুলো!

[৪]

উমর রা.-এর খিলাফত। সাহাবারা তখন পারস্য সাম্রাজ্যের ভেতরে। ব্যাপারটা এমন, ধরে নিন, বাংলাদেশ চিনের সাথে বা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে। পারস্য সাম্রাজ্যের ডাকসাইটে আর্মি চিফ জেনারেল রুস্তমের নামডাক তখন দুনিয়াজোড়া। পূবে চিন, পশ্চিমে যুরোপ—সবাই একনামে চেনে। গণক বলে গেছে—এই যুদ্ধে রুস্তম হারবে, তাই যে-কোনো মূল্যে বাংলাদেশের সাথে সন্ধির রাস্তা খুঁজছে চিন কিম্বা রাশিয়া। শান্তি আলোচনার প্রস্তাব পেয়ে মুসলিম-শিবিরের একাংশকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুসলিম-বাহিনীর প্রধান সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.। সাহাবাদের বাতচিতগুলি খুব খেয়াল করার বিষয় আছে, এমনি কথোপকথনের মতো পড়ে যাবেন না। প্রতিটা ডায়ালগ খুব ভাববেন।

সাদ : তোমাদেরকে রুস্তমের কাছে পাঠাতে চাচ্ছি, কী বলো?

সবাই : আপনার যে-কোনো কমান্ড আমরা হুবহু ফলো করবো এবং মিশন একমগ্নিশ করে আসবো। আর কোনো বিষয়ে আপনার দিকনির্দেশনা না-থাকলে আমাদের যেটাতে কল্যাণ, তেমন কিছু একটা বলে আসবো।

সাদ : তবে তোমরা সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুতি নাও।

রিবঈ : অনারব লোকেদের নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি ও আদব কায়দা আছে। আমরা এত লোক একসাথে তাদের নিকট গেলে তারা মনে করবে, আমরা তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। অতএব আপনি তাদের কাছে এক জনের বেশি পাঠাবেন না।

সবাই : রিবঈ ঠিকই বলেছে।

রিবঈ : আপনাদের পক্ষ থেকে আমি যাবার জন্য তৈরি আছি। আমাকে পাঠাতে পারেন।

সাদ : ঠিক আছে। তা হলে রিবঈ, তুমিই যাও।

গোনায়ে ধরার টাইম নাই

রিবঙ্গ ইবনু আমের রা. প্রস্তুতি নিলেন। ঝাঁকড়া চুলে চারটি ঝুঁটি করলেন। ছালার চট মাঝ থেকে ছিঁড়ে জামা বানালেন, দড়ি দিয়ে কোমরবন্ধ বানালেন। উটের চামড়ার লাগাম দিয়ে পাগড়ি পরলেন, তার উপর বর্ম। সাথে নিলেন গরুর চামড়ার ঢাল, বর্শা, নেকড়ায় পেঁচানো তরবারি, তির-ধনুক।

ওদিকে রুস্তমের ক্যান্টনমেন্টে জাঁদরেল অফিসারদের নিয়ে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো, আমরা আরবদেরকে আমাদের সেনাসংখ্যা ও সামরিক শক্তির ভয় তো দেখাবোই, সাথে-সাথে আমাদের জাঁকজমক ও শানশওকত দেখিয়ে ওদেরকে প্রভাবিত করবো; দেখাবো যে, আমাদের তুলনায় তোমরা কত তুচ্ছ! সেই মোতাবেক রুস্তমের সোনার সিংহাসন, মূল্যবান কাপড়ের সজ্জা, দামি-দামি গালিচা, সোনার সুতো দিয়ে বুনা নো বালিশ—এগুলো দিয়ে দরবার-হল সাজানো হলো খুব করে।

রিবঙ্গ রা. দামি গালিচার উপরে ঘোড়া পুরোটো উঠিয়ে দিলেন। [ক]

সোনায়ে বোনা দুটি বালিশ ছিঁড়ে তার সাথে ঘোড়া বাঁধলেন। [খ]

যখন তাকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে ভেতরে যেতে বলা হলো, তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের কাছে আমার প্রয়োজনে আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকেছো। আমার মনমতো যদি আসতে দাও, তা হলে আসবো, না হলে এখান থেকেই ফিরে চলে যাচ্ছি।’ [গ]

গালিচার উপর দিয়ে বর্শার ফাল গেঁথে-গেঁথে ছোট কদমে যেতে লাগলেন। দামি গালিচা ও বিছানা ছিদ্র করে নষ্ট করে দিলেন। [ঘ] এরপর একদম কাছে গিয়ে বিছানার উপর বর্শা গেঁথে নিজে মাটির উপর বসলেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে জানালেন, ‘আমি তোমাদের সাজসজ্জার জিনিসের উপর বসবো না।’ [ঙ]

ক, খ, গ, ঘ, ঙ—উনি কেন করলেন? তিনি ইচ্ছা করেই এমনটা করেছিলেন, যাতে পারস্যবাসীরা বুঝে নেয় যে, তাদের এ-সব শাহি চাকচিক্য দ্বারা তিনি একটুও প্রভাবিত নন। তাদের দুনিয়ার এ-সব নাজ-নেয়ামত গোনায়ে ধরার সময় নেই তাঁর।

ঠাণ্ডা গলায় রিবঙ্গ রা. বলেন, ‘হে পারস্যবাসী, তোমরা খাওয়া, পান করা ও লেবাস-পোশাককে বড় জিনিস মনে করো, আর আমরা ওসবকে নগণ্য জিনিস মনে করি, গোনায়েই ধরি না।’

রুস্তম এবার মুখ খুললো : ‘আপনারা আরব থেকে কেন এসেছেন, কী চান?’

সাফসুতরা নির্বিকার জবাব : ‘আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি এ-জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর ইচ্ছায় তাঁর বান্দাদেরকে

‘বান্দার বন্দেগি থেকে আল্লাহর বন্দেগির দিকে’, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে দ্বীনে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের দিকে ডাকার জন্য নিজ সৃষ্টির কাছে পাঠিয়েছেন। যে-ডাকে সাড়া দেবে তাকে আমরা মেনে নেবো এবং চলে যাবো। যে মেনে নেবে না, তার সাথে আমরা যুদ্ধ করবো—যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা পূরো হয়।’

রুস্তম : ‘কী আল্লাহর ওয়াদা?’

রিবঈ : ‘আল্লাহর ওয়াদা হলো, ইসলাম অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য বেহেশত। আর যে বেঁচে থাকবে, তার জন্য বিজয় ও সফলতা।’

রুস্তম : ‘আপনারা কি আমাদের কিছু সময় দিতে রাজি আছেন, যাতে আমরা একটু চিন্তা করে দেখতে পারি? এই পরিমাণ সময়, যাতে আমাদের নেতৃস্থানীয়দের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরামর্শ করতে পারি।’

রিবঈ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে, আমরা যেন যুদ্ধে মুখোমুখি হবার পর শত্রুকে ৩ দিনের বেশি সময় না-দিই। অতএব তোমাদেরকে ৩ দিন সময় দিলাম।^[১]

কী একটা অবস্থা দেখুন, বাংলাদেশ রাশিয়াকে বা চিনকে বা আমেরিকাকে ৩ দিন সময় দিচ্ছে!

হাল আমলের ঘটনা। মস্কোতে ‘আফগান শান্তি আলোচনা’র তালেবান-প্রতিনিধিকে সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলো :

- ‘অস্ত্রবিরতি কবে হবে?’
- ‘আমেরিকা সৈন্য প্রত্যাহার করলো।’
- ‘যদি না-করে, তা হলে?’

- ‘তা হলে আর কী? যুদ্ধ চলবে।’ ঠাণ্ডা ও নির্বিকার জবাব। আধুনিক অস্ত্র নেই, ড্রোন নেই, অ্যাটম বোম নেই। বলছে, আমেরিকার সাথে যুদ্ধ চলবে। যেন বললো—‘শোনো ম্যারিকা ব্রো, তোমার ওসব গোনার সময় আমাদের নাই। ও-সব মাখলুক। আর আমরা খালিকের লোক। মাখলুক-টাখলুক গুনি না।’

[১] সাইফ রহ.-এর বর্ণনা, হযরাতুস সাহাবাহ, ১/৩৬৭, দারুল কিতাব

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর বাহিনী যখন প্রমত্তা দজলার জোয়ারে দ্বিধাগ্রস্ত, কীভাবে ওপারে পৌঁছানো যায়, হাজার ইবনে আদি রহ. বললেন, ‘নদী পার হয়ে শত্রু পর্যন্ত পৌঁছতে শুধু এই পানির কাতরা (বিন্দু) তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? অথচ আল্লাহ বলেছেন, ‘কারও মৃত্যু আসা সম্ভব নয় আল্লাহর আদেশ ব্যতীত, আর তা এইভাবে যে, মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময় লেখা থাকে।’ এরপর তিনি ঘোড়া নামিয়ে দিলেন।^[১] এত বড় একটি নদীকে গোনায়ে ধরলেনই না।

যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা. খালি গায়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকতেন দুই তলোয়ার নিয়ে, একপাশ থেকে ঢুকতেন, আরেক পাশ দিয়ে বেরোতেন— এভাবে আবার, বারবার। আর বলতেন, ‘আজ যদি মৃত্যু লেখাই থাকে, তা হলে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর যদি লেখা নাই থাকে, তা হলে কারও ক্ষমতা নেই আমাকে মারার।’ আর ওদিকে বাপকা বেটা, সিপাই কা ঘোড়া; মিনজানিকের গোলা এসে পড়তো আশেপাশে, আর তার মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. দাঁড়িয়ে থাকতেন সালাতে, একাগ্রচিত্তে— ‘গোনার টাইম নেই। ঈমানওয়ালা তাকদিরে ঈমান রাখে, অহেতুক ভয় করার সময় কোথায়?’

দুনিয়া মুমিনের কারাগার, আর কাফিরের জান্নাত। দুনিয়ার জীবনই গুনি না, তোমাদের জান্নাত তোমরা কেয়ার করোগে। আমরা দুনিয়াদারি কেয়ার করি না, এখানে কী পেলাম, না-পেলাম ওসব হিসেব করার সময় নেই। বাঁচলে লাভ, মরলে আরও বড় লাভ। এক সাহাবীকে এক কাফির কতল করে দিয়েছে, আর তির বিঁধে সাহাবী বলে উঠেছেন, ‘কাবার রবের কসম, আমি তো সফল হয়ে গেছি।’^[৩]

[১] হাবিব ইবনে সুহবান রহ.-এর সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ, ৫/৫৮৪, দারুল কিতাব

[২] ইবনেল মুনকাদির সূত্রে আবু নুয়াইম, হায়াতুস সাহাবাহ ৪/৪৬২, দারুল কিতাব

[৩] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বনু আমিরের নিকট পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছলে আমার মামা (হারাম ইবনে মিলহান) তাদেরকে বললেন, ‘আমি সর্বাত্মক বনু আমিরের নিকট যাবো। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পৌঁছাতে পারি, (তবে তো ভালো) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবো।’ অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিলো, কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শোনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তির মারলো এবং তির শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন, ‘(اللَّهُ أَكْبَرُ، فُرْتُ وَرَبُّ الْكَفَّةِ) আল্লাহ আকবার! কাবার রবের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।’ অতঃপর কাফিররা তার অন্যান্য সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সকলকে শহিদ করলো,

বাঁচলে সহি, মরলে আরও বড় সফলতা। মৃত্যু তো মুমিনের জন্য কারাগার থেকে মুক্তির মতো—দুনিয়া আমাদের কারাগার। মৃত্যু, সে তো জীবনের চেয়েও আপন।

উমায়ের ইবনু হুমাম রা. খেজুর খেতে খেতে বলছেন, ‘এই খেজুরগুলো শেষ করা অবধি যদি অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা তো দীর্ঘ জীবন হয়ে গেলো।’ খেজুর ফেলে তরবারি তুলে নিলেন, এরপর শহিদ হয়ে গেলেন।^[১] মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত, মৃত্যু তাদের আগ্রহের জিনিস, মৃত্যুর অপর নাম ভালোবাসা। খালিদ রা. বলছেন পারস্য সাম্রাজ্যের হিরা শহরের গভর্নরকে : কাবিসা, ইসলাম কবুল করলে আমরা আর তোমরা সমান। নয়তো জিযিয়া দিতে হবে। আর জিযিয়াও দিতে অস্বীকার করলে শোনো ছোটভাই, আমার সাথে এমন এক আর্মিবাহিনী আছে, যাঁরা মৃত্যুকে ভালোবাসে; তোমরা যেমন জীবনকে ভালোবাসো, তার চেয়েও বেশি তারা মৃত্যুকে ভালোবাসে।^[২] অহির ব্যাপারস্যাপার! জীবন-টীবন থোড়াই কেয়ার!

শুধু তাই নাকি! বলে কিনা, শত-শত জীবন থাকলে তাও আল্লাহর জন্য দিলে দিতাম, গোনায ধরতাম না। কমান্ডার আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা রা.-কে ধরে এনেছে রোমান বাদশার সামনে। দারুণ অফার—যদি খ্রিস্টান হয়ে যাও, আমার রাজত্বের অর্ধেক দোব, আমার পরমাসুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহ দেবো। আর ঈমান না-ছাড়লে এই গরম তেলে এভাবে ফ্রাই করে ফেলবো।’ একজন মুসলিম মুজাহিদকে গরম তেলে ছেড়ে ডেমো দেখানো হলো। দেখবেন—ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে, ব্রাশফায়ারে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ড্রোন দিয়ে তুলোধুনো করে দিয়েছে; আসলে কিছুই না। শাহাদাতের মৃত্যু শ্রেফ একটা পিঁপড়ের কামড়, একটা ইনজেকশানের খোঁচা। জান কবজ হয়ে গেছে আগেই; দেহ ফ্রাই হলেই কী, আর রেজালা হলেই কী যায় আসে—গোনার টাইম আছে!

তো কিছুতেই না-পেরে কমান্ডারকে তেলে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে জল্লাদ আর সাহাবীর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। জল্লাদ মাথামোটা ভাবলো, বোধহয় সঙ্গীর মৃত্যু দেখে ভয় পেয়েছে। আবার বাদশার কাছে ফিরিয়ে নিলো, জানালো, কমান্ডার কাঁদছে। ‘আগেই তো দারুণ-দারুণ অফার দিলাম, নিলে না,

কিন্তু একজন পোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন; তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন... অতঃপর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করার কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত চল্লিশ দিন দ্রিগ, যাকওয়ান, বনু লিহয়ান ও বনু উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দুআ করেন। [সহিহ বুখারি ২৮০১ iHadis app]

[১] উমায়ের ইবনে হুমান রা.-ও একই উক্তি করেছেন, হযাতিস সাহাবাহ ৪/৩৪৭-৩৪৮

[২] ইনাম বাইহাকি সূত্রে হযাতিস সাহাবাহ ১/৩৫৭

গোনায় ধরার টাইম নাই

এখন আবার কাঁদো কেন, জানের ভয়ে?’ আবদুল্লাহ বিন হুযাফা রা.-এর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, ‘আরে হাঁদারাম, ঐজন্য কাঁদছি না। কাঁদছি এইজন্য যে, আজ আমার জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হচ্ছে। আফসোস হচ্ছে যে, আমার কাছে জীবন তো একটাই আছে। আজ যদি আমার গায়ের পশম পরিমাণ জীবন আমার হতো, তো সবগুলোই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে ঈমানের পরীক্ষা দিতাম।’^[১]

কী ভাবের দিনই না ছিলো বাহে, যত দিন ইসলাম ছিলো! কাউকে, কোনো কিছুকে গোনার টাইম ছিলো না। এহন সবাইরে গুনতে গিয়া আমগোরেই কেউ গোনায় ধরে না। দাও ফিরিয়ে সে ড্যামকেয়ার, দাও ফিরিয়ে সেই দ্বীনে ইসলাম, লও এই ওয়াহান— দুনিয়ার ভালোবাসা আর মরণের ভয়।

[১] আল-ইবদা ফি মারিফাতিল ইকনা, ড. রবি হুসাইন : ১৫৪; এই ঘটনাটি প্রমাণিত ও অনেক প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর শেষোক্ত এই উক্তি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়নি।—সম্পাদক

অফলাইন দাওয়াহ

দাওয়াহ কেন?

❧ মুসলিমের সন্তান মুসলিম থাকবে কি না

❧ কাফিরের সন্তান মুসলিম হবে কি না

দুটোই নির্ভর করে একটি আমলের উপর—দাওয়াহ। সব নবীর উন্মত গোমরা হবার আগে মুসলিমই ছিলো। দাওয়াহর অভাবে কাফির হয়ে গেছে মুসলিমদের পরবর্তী প্রজন্ম। আবার নবী এসেছেন। দাওয়াহ শুরু হয়েছে, কাফিরের সন্তানেরা মুসলিম হয়েছেন। দাওয়াহ না-থাকলে মুসলিম বংশের সন্তানও নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে যাবে। ইসলামের শুরু থেকে দাওয়াহ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কিয়ামত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ লেভেলের গুরুত্বপূর্ণ আমল। দাওয়াহ কার্যক্রমের মজবুতির উপর নির্ভর করবে আপনাদের মসজিদে কত লোক আসবে, আপনাদের মাদরাসাগুলোতে কত জন তাদের ছেলেকে পড়াবে, খানকাহগুলোতে কী পরিমাণ লোক আত্মশুদ্ধির জন্য আসবে, ইসলামী দলের ভোটসংখ্যা কত হবে! ভোট জায়েজ-নাজায়েজ আমার আলোচ্য নয়।

আমার পয়েন্ট হলো—ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাগুলো কত বেগবান হবে, তা নির্ভর করে সমাজে দাওয়াহ ওয়ার্ক কতটা স্ট্রং, তার উপর। এ-জন্য উপমহাদেশেই যদি তাকাই (যেহেতু বাইরের বিপ্লবগুলো অতটা জানি না) ফরায়েজী আন্দোলন বলুন, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর আন্দোলন বলুন, এক্সটেনসিভ দাওয়াহ ওয়ার্কই ছিলো সাফল্যের ভিত। এমনকি মওদুদি রহ.-এর শুরুটা ব্যাপক জনসংযোগ, আইমিন দাওয়াহভিত্তিকই ছিলো। বর্তমান কওমি রাজনৈতিক দলগুলোর কঙ্কালসার শরীরের পেছনে রোগও এটাই—জনবিচ্ছিন্নতা। আর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (চরমোনাই)-এর কিছুটা সাফল্যের পেছনে কারণ এটিই যে, ব্যাপক দাওয়াহ তাদের সাংগঠনিক কাজের অংশ। আমার মনে হয়, আমি বোঝাতে পেরেছি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনমনে ইসলামের আবেদন ফেরাতে সব ঘরানার ইসলামিস্টদের একমাত্র মনোযোগ হওয়া উচিত—ব্যাপক দাওয়াহ

ওয়ার্কে। এ-সব মিছিল-মিটিং-মানববন্ধন-ইফতারপার্টি-ফটোসেশন আর কমিটি-কমিটি খেলা বাদ দিয়ে একমাত্র ব্যাপক জনসংযোগ, ব্যাপক দাওয়াহ ওয়ার্কই আমাদের একমাত্র কর্মপন্থা হওয়া উচিত।

দাওয়াহ কী?

দাওয়াহ হলো আহ্বান। ইসলামের দিকে আহ্বান, মানহাজ-প্রার্থী-সংগঠনের দিকে না। যে যে-কোনো ভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করছে, সেটা দাওয়াহ। মুআযযিনের আযান, উলামার দরস-ওয়াজ-বাহাস-লেখনী-সাময়িকী-টিভি প্রোগ্রাম, মুবাশ্শিগদের ডোর-টু-ডোর মেহনত, মুজাহিদের তরবারি—সবই দাওয়াহ। নির্বাচনের ঠিক আগ-মুহূর্তে গিয়ে প্রার্থীর ভোট চাওয়া—এটাকে আসলে ঠিক দাওয়াহ বলা যায় না। দাওয়াহ হবে ইসলামী চেতনার, ইসলামের। সারা বছর ফিল্ডওয়ার্ক করে তারপর না বছর শেষে রেজাল্ট আসবে? ঠিক ভোটের আগে যাই বলেই কাক্ষিক্ষিত রেজাল্ট আসে না। প্রতিটা মানুষ সমস্যার মধ্যে আছে—হয় নিজেকে নিয়ে, নয়তো পরিবার নিয়ে, নইলে সমাজ নিয়ে, নইলে দেশ নিয়ে। জনগণের ভেতর ব্যাপক দাওয়াহর দ্বারা ইসলামী চেতনা জাগান, ইসলামের টোটাল সমাধান পাওয়ার পিপাসা জাগান; বোঝান যে, ইসলামেই তোমার সমস্যার সমাধান। তাকে এই মেসেজ দিন—তোমার-আমার সমাধান আল্লাহ-রাসূলের দ্বীন দিয়ে গেছে ১৪০০ বছর আগে। সমাজে ব্যাপকভাবে এই মেসেজ ছড়ানোর পর দেখবেন, যে-ডালি আপনি সামনে ধরবেন, তা-ই ভরে উঠবে; মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ-রাজনীতি—যেটিই ধরবেন।

কেন অফলাইন দাওয়াহ-ই?

এবার একটি সহজ উদাহরণ।

সিনারিও এক. মহল্লার স্বল্পপরিচিত কোনো মুসল্লি, এই জাস্ট মসজিদে দেখা হয়, সালাম-বিনিময় হয়। ফোন করেছে, ‘ভাই, অমুক দিন আমার মেয়ের বিয়ে অমুক কম্যুনিটি সেন্টারে, আপনি এলে খুব খুশি হবো।’ বা কাউকে দিয়ে একটি কার্ড পাঠিয়ে দিলো।

সিনারিও দুই. হঠাৎ কলিংবেল। ভদ্রলোক নিজেই হাজির। হাতটা ধরে—‘ভাই, আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে। আপনি অবশ্যই আসবেন। আপনি এলে কী যে খুশি হবো! আসবেন কিস্তা।’

কুররাতু আইয়ুন ২

কোনটা বেশি প্রভাব ফেলবে আপনার উপর? প্রথমটা আপনার মনেই থাকবে না। কত দ্রুত মন থেকে বা ‘প্রায়োরিটি লিস্ট’ থেকে এটা উধাও হবে, তা নির্ভর করবে স্বল্পপরিচয়, বিয়ের দিন বেশি কাছে হলে, সেন্টার দূরে হলে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনি যাওয়ার খুব চেষ্টা করবেন, যেহেতু নিজে এসে দাওয়াত দিয়েছে। যদি যেতে নাও পারেন, আপনার ভেতর একটা অপরাধবোধ কাজ করবে। ঐ ভদ্রলোক এর পরে কোনো অনুরোধ করলে আপনি ফেলতে পারবেন না। এ-জন্য ‘আমার মনে হয়’ সশরীরে দ্বারে-দ্বারে দাওয়াহ অন্যান্য সকল মাধ্যমের তুলনায় বেশি ইফেক্টিভ। অথচ, কিছুটা কঠিন বলে সব মানহাজে এই সাইডটা অবহেলা করা হয়। মওদুদি সাহেবের ফরমেটেও এটা একসময় জোরালোভাবে ছিলো, পরে ধীরে-ধীরে উপেক্ষিত হয়ে গেছে। এবং যত সফল বা প্রায়-সফল বিপ্লব হয়েছে, আপনারা দেখবেন, এই সশরীরে দাওয়াহ সেগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিলো।

এই সশরীরে দাওয়াহ কেবল প্রচারই নয়, আত্মশুদ্ধিরও মাধ্যম বটে—নফসকে কাবুতে আনার আমল। ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবাদের গণআত্মশুদ্ধি দাওয়াহর দ্বারা হয়েছে। হায়াতুস সাহাবাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০-১৬০-তে দেখুন এক-এক সাহাবী নবীজির কাছে এসে ইসলাম কবুলের পর তাঁকে নিজ কওমের কাছে দাওয়াতে পাঠানো হয়েছে, দাওয়াতও চলেছে, ঐ নওমুসলিম সাহাবীর মজবুতিও এসেছে। কীভাবে ব্যাপক প্রচার, প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতনের দ্বারা তাদের ঈমান পোক্ত হয়েছে, নফসের উপর দীনকে প্রাধান্য দেবার শক্তি তৈরি হয়েছে—যদিও আজ আত্মশুদ্ধি বলতে আমরা কিছু ইন্ট্রোভার্ট আমল বুঝি; সাহাবীদের আত্মশুদ্ধি ছিলো এক্সট্রোভার্ট, দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে—গণআত্মশুদ্ধি। দাওয়াহর জন্য নিজে উপযাচক হয়ে ছোট হয়ে যাওয়া নফসের জন্য ভারি, দাওয়াহ করতে গিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া-অপমান সহ্য করার দ্বারা এবং একই কথা বারবার জবানে বলার দ্বারা অন্তরে বসে যাওয়া আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। ইসলামে আসার পর সাহাবীদের গণ-তারবিয়াহ মক্কায়ে হয়েছে দাওয়াতের দ্বারা, মদীনায়ে জিহাদের দ্বারা। জিহাদে পরিবার-জীবিকা ছেড়ে বের হওয়া নফসের জন্য কষ্টকর; কষ্ট সহ্য করা, সার্বক্ষণিক মৃত্যুভয় এবং স্বচক্ষে আল্লাহর মদদ দেখা জিহাদে গণ-আত্মশুদ্ধির কারণ হয়েছে। নবীজি আমাদের একটি সামগ্রিক মেহনত শিখিয়েছিলেন—এক টিলে বহু পাখি। প্রচার, ইসলাম, সমাজমানস গঠন, শেখানো—সব একসাথে। এ-জন্যই সবার সমাজ-বিপ্লবের নকশায় দাওয়াহ এক নম্বর পয়েন্ট হিসেবে

অফলাইন দাওয়াহ

থেকেছে—সাইয়েদ কুতুব থেকে সাইয়েদ মওদুদি, সাইয়েদ আহমাদ শহিদ থেকে ইলিয়াস রাহিমাহুমুল্লাহ। আমার মতে, ইসলামের সব প্রচেষ্টাগুলোতেই এখন ব্যাপকভাবে এই অংশটা জোরদার করা দরকার—সশরীরে দাওয়াহ। এবং অবশ্যই বিতর্কিত কোনো বিষয়ে না, নিজ সংগঠনের দিকে নিজ মানহাজের দিকে না, দাওয়াহ হবে বেসিক ইসলামের—বেসিক তাওহীদের (তাওহীদের ব্যাখ্যা লেভেলে আবার মতভিন্নতা আছে)। লোকদের মধ্যে ইসলামে বাতলানো সমাধানের পিপাসা তৈরি করতে হবে আর তার গেট হলো তাওহীদ। যে তাওহীদের গেট দিয়ে ঢুকবে, সে সমাধান পাবে। ক্বুলু—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু—তুফলিহুন; সফল হয়ে যাবে। ইসলামের পিপাসা সমাজে সৃষ্টি হলে দ্বীনের সব প্রচেষ্টায় জোয়ার আসবে।

দ্বীন পালনে সচেষ্টি ও দ্বীনের বিজয়ে উন্মুখ অনেক ভাই অফলাইন দাওয়াহর প্রয়োজন বুঝেছেন ও দিচ্ছেনও। তবে উপযুক্ত ট্রেনিং বা ফরম্যাট বা কৌশল জানা না-থাকায় হয় বলতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন, খেই হারাচ্ছেন কিংবা ফল বিলম্বিত হচ্ছে। একটু ঘষেমেজে নিলেই আমার অফলাইন দাওয়াহ আরও শাগিত ও গভীর হতে পারে। আমি বরাবরের মতোই তাবলিগের আঙ্গিকে আলোচনা করবো। আপনারা নিজ মানহাজে ফেলে চর্চা করবেন। তাবলিগে দাওয়াহ-ই ছিলো আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রধান ওষিফা। শায়খ আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, ‘আমি যে-আমলের উপর উঠতে চাই, তার দাওয়াত দিই। ফলে সেই আমল করা আমার সহজ হয়। আবার যে-গুনাহ আমি ছাড়তে চাই, তার খারাবির দাওয়াত দিই, ফলে তা ছাড়া আমার সহজ হয়।’

এ-জন্য তাবলিগে দাওয়াহ দেওয়া শেখানো, হাতেকলমে শেখানো ও চর্চা করানো হয়; কৌশল শেখানো হয়, কাকে কীভাবে এপ্রোচ করা হবে, তার রাফ আইডিয়া দেওয়া হয়। তাবলিগের বাইরে নানান মানহাজে—অফলাইনে—ম্যান-টু-ম্যান মেহনত করছেন যে-ভাইয়েরা, তাদের উপকারার্থে আজকের অধ্যায়খানা।

লাস্ট ইজ্জত্‌মার বয়ান থেকে...

দাওয়াহর মূলসূত্র হলো, আযান। আযানের দুআয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানকে বলেছেন, ‘দাওয়াতুত তান্মাহ’ বা পরিপূর্ণ দাওয়াত। এ-জন্য আমাদের দাওয়াহর ফরম্যাট আমরা আযান থেকে নেবো।

কুররাতু আইয়ুন ২

১.

প্রথমে বলে নেবো আল্লাহর বড়ত্ব (আল্লাহু আকবার), শক্তি, ক্ষমতা, রাজত্বের সর্বব্যাপিতা। এটা দিয়ে দাওয়াহ শুরু করবো।

‘হে কমলাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার রবের বড়ত্ব বয়ান করুন।’

(সূরা মুদাসসির, ১-৩)

আল্লাহ কত বড়, আল্লাহ যদি চান, আমার কতখানি কল্যাণ করতে পারেন, আর যদি চান, আমার কত বড় ক্ষতি করতে পারেন। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলে কল্যাণ করতে চাইলে কোনো ম্যাটেরিয়াল লাগে না, উপায়-উপকরণ-পদ্ধতি লাগে না। তিনি ইচ্ছা করলেই সব হয়ে যায়—কুন ফা-ইয়াকুন। যেখানে আমি কোনো সমাধান দেখি না, কোনো উপায় নজরে আসে না, সেখানে আল্লাহ গায়েব থেকে আমার সমস্যার সমাধান করতে পারেন শুধু তাঁর ইচ্ছা দ্বারা। নবী আলাইহিস সালামগণের ঘটনা উদাহরণ হিসেবে আনা যেতে পারে। ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আপন পিতাও (মতান্তরে চাচা) পোড়াতে চেয়েছেন, রাষ্ট্র-পরিবার-সমাজ সবাই তাঁর বিরুদ্ধে, আগুনে ফেলাও হয়েছে; সেই আগুনকেই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছত ও আরামের কারণ বানিয়েছেন। আগুন নেভাতে পানি লাগেনি, ফেরেশতা লাগেনি, নেভানোরও প্রয়োজন পড়েনি। এমনি আমাদের প্রতিটা সমস্যা সমাধান করতেও আল্লাহর কোনো উপকরণও লাগে না, সহায়ক কিছুও লাগে না, সমাধানের কোনো প্রক্রিয়া মেইনটেইনও করতে হয় না। আমার জন্য যা বিরাট কিছু, আল্লাহর কাছে সেটা কিছুই না, একদম কিছু না।

২.

আল্লাহর একত্ব ও এককত্ব। (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ একাই ছিলেন, পরেও একাই থাকবেন, একাই ইবাদতের যোগ্য। পালেন একা, খাওয়ান একা, সৃষ্টি করেন একা, সুস্থ করেন একা। শেষমেশ হবে তা-ই, যা আল্লাহ একা চাইবেন। আল্লাহ এত বড়, এত শক্তিশালী। তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন। আমাদের সমস্যার সমাধান একমাত্র তাঁর ইচ্ছা।

‘বলুন, হে আল্লাহ, হে সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন, বার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা ইচ্ছত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইচ্ছত করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই, নিশ্চয়ই আপনি সকল

অফলাইন দাওয়াহ

বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’

(সূরা আলে ইমরান, ২৭)

এগুলো করার জন্য তিনি কোনো বস্তু-মাধ্যম-সত্তার মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই যে-কোনো কাজ করতে গিয়ে মুখাপেক্ষী উপায়-উপকরণ-পদ্ধতির। তাঁর কিছু লাগে না, কাউকে লাগে না, কোনো নিয়মকানুন মেইনটেইন করতে হয় না—আল্লাহ্‌স সামাদ। এ-জন্য তোষামোদ-খোশামোদ যদি কারও করতেই হয়, তো সে আল্লাহ; কেননা যতই উপায়-উপকরণ জড়ো করি, উনি না-চাইলে, না ইচ্ছে করলে তো আর হচ্ছে না। ২৪ ঘণ্টা আমার সকল প্রচেষ্টা যদি কেউ পাবার হকদার হয়, তো তিনি আল্লাহ। হযরতজি ইনআমুল হাসান কান্দলভী রহ. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, ‘জী লাগানে কে লায়েক আল্লাহ কে সিওয়া কোরি নেহি।’ মন-প্রাণ-অন্তর কাউকে/কোনো ব্যস্ততাকে যদি দিতেই হয়, সে আল্লাহ। দিল লাগানোর উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। মানুষের ভালোমন্দ কীসে, তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। তাই আইনদাতাও একমাত্র তিনিই, তাঁর আইনেই মানবজাতির কল্যাণ। সত্তায় ও গুণাবলিতে তিনি একা।

৩.

এরপর বলব যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই একক আল্লাহর পাঠানো ব্যক্তি, রাসূল (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)। তাঁকে দিয়ে আল্লাহ দ্বীন পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। দ্বীন হলো, একক আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য লাইফস্টাইল বা সিস্টেম। যাঁকে আমার পক্ষে আনার জন্য এত কিছু, যদি চাই, সেই আল্লাহ আমার সমস্যার সমাধান করে দিন, তবে তাঁর ভালোবাসা পেতে হবে, তাঁকে পক্ষে আনতে হবে। কী করলে তাঁর ভালোবাসা পাওয়া যাবে, তাঁকে পক্ষে আনা যাবে?

‘(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার ইন্তেবা (অনুকরণ) করো; তা হলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাক করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমামূল ও পরম দয়ালু।’^[১]

[১] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১

কুররাতু আইয়ুন ২

ইত্তেবা কী? এ বিষয়ে উলামাগণের সুন্দর-সুন্দর কিতাব আছে। বিস্তারিত জেনে আমল করবো, ইন শা আল্লাহ। বাকি প্রাসঙ্গিকতা রক্ষায় এতটুকু উল্লেখ করি, ‘ইত্তেবা’ শব্দের অর্থ copying (ছবছ নকল করা); following the example of (কারও দৃষ্টান্ত মোতাবেক কাজ করা); imitation (অনুকরণ করা); patterning after copy the actions of (ছবছ কারও কাজ নকল করা); taking after resemble (দেখতে একই রকম হওয়া)।^[১] নবীজি যখন যে-অবস্থায় যা যেভাবে করেছেন, তখন ঐ অবস্থায় তা সেভাবে করার মধ্যেই ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি-সুস্থতা-ইজ্জত-সাফল্য-আল্লাহর ভালোবাসা-সাহায্য-বিজয়; যা-ই আমরা করি, এই অনুমোদিত সিস্টেমে না-করলে সেই একক আল্লাহ মেনে নেবেন না আমাদের। এ-জন্য রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিস্টেমে (পন্থায়) ব্যক্তিজীবনে সুখ, পারিবারিক জীবনে শান্তি, সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাধান, পরকালীন জীবনে মহাসফলতা। আর এই স্পেসিফিক সিস্টেমটা ছাড়া আর যত সিস্টেম আছে (পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র—ব্লা ব্লা), সব সিস্টেমে ব্যক্তিজীবনে অসুখ, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, সামাজিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমস্যা, পরকালীন জীবনে মহাধ্বংস।

‘যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনীত দ্বীনের অনুসরণ করিল, সে বাঁচিয়া গেল। আর যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনীত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল, সে ধ্বংস হইয়া গেল।’^[২]

৪.

এরপর তাকে যে আমলের দাওয়াহ দিতে চাই, সেটা (হাইয়া আলাস সলাহ)। সালাত হতে পারে, রোযা হতে পারে, মসজিদের নির্মাণে সদকা হতে পারে, মুহাজিরিনদের জন্য মাল জমা হতে পারে, তালিম-তাফসিরের হালাকার জন্য হতে পারে। ভাই, আমরা প্রতি দিন বা অমুক দিন এই হালাকায় বসি, অনেক কিছু শিখতে পারি, না-শিখলে না-জানলে সেই মোতাবেক চলবো কীভাবে? আপনিও আসুন না, আপনারও আসা দরকার। দেখবেন, অনেক ভালো লাগবে, অনেক কিছু জানতে পারা যাবে।

[১] <http://www.thesaurus.com/browse/pattern%20after>

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/إتباع/>

[২] বুখারি : ৭২৮৩

৫.

কেন এই আমলটা তার করা দরকার, কী লাভ, কী পাবে করলে (হাইয়া আলাল ফালাহ)। আর না-করলে কী ক্ষতি! ইহলোক-পরলোকে কী সমস্যা—এ-অংশে সরাসরি হাদীসে বর্ণিত লাভ-ধর্মিকি উদ্ধৃত করা চাই। এ-জন্যই ফাযায়েল (ফযিলত) সংক্রান্ত হাদীসগুলো দাঈদের মুখস্থ থাকা দরকার। একে তো দাওয়াতের কাজের জন্য আর দ্বিতীয়ত মাসায়েল একবার শিখলাম তো শেখা হয়ে গেলো, প্রতি দিন একই জিনিস শেখার দরকার নেই। কিন্তু ফাযায়েল প্রতি দিন শুনলে ঈমান বাড়ে, একই হাদীস বারবার শুনলেও ঐ হাদীসের উপর ঐ প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ঐ আমলের আগ্রহ আসে। মানুষ ভুলে যায়, প্রতি দিন একটু-একটু শোনার/পড়ার অভ্যাস করলে আমলের প্রতি আগ্রহ বজায় থাকে। এ-জন্য প্রতি দিন ফাযায়েল-সংক্রান্ত হাদীস হালাকা আকারে শোনার সাথে ঈমান বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। মুস্তাখাব হাদীস, আদাবুল মুফরাদ, রিয়াদুস সলিহীন বা আলিমগণের পরামর্শ মোতাবেক অন্য কোনো কিতাব বেছে নিলে দাওয়াতের যোগ্যতা বাড়ার সাথে-সাথে ঈমানের ক্ষয়পূরণও হতে থাকবে।

দাওয়াতের ফরম্যাট শুরু থেকে শেষ

তাবলিগে দাওয়াতের কথাগুলোর একটি ফরম্যাট আমরা শিখেছিলাম। এই ফরম্যাটে ফেলে ১ মিনিটও দাওয়াত দেওয়া যায়, ৫ মিনিটেও দিতে পারবেন, আবার সুযোগ থাকলে বসে ৩০ মিনিট কথাও বলতে পারবেন, ১ ঘণ্টা বয়ানও করা যাবে ছোট কোনো জমায়েতে।

১. সালাম ও মুসাফাহা

মাদউ (যাকে দাওয়াহ দেওয়া হচ্ছে) ব্যক্তির মনে সালাম আপনার ভালোবাসা তৈরি করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমরা ওই পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবো না, যে পর্যন্ত মুমিন না-হবো; ততক্ষণ মুমিন হতে পারবো না, যতক্ষণ একে অপরকে মহব্বত না-করবো, আর মহব্বত সৃষ্টির আমল বাতলে দিয়েছেন : পরস্পরের মাঝে সালামের খুব প্রসার করা।’^[১] এবং এই ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পাবে মুসাফাহায়।^[২] তবে হাত নিয়ে নিজের হাতের ভেতর রেখে দিলে

[১] মুসনাদে আহমদ : ১৪১২

[২] আস-সুনান, তিরমিযি : ২৭৩০

কুররাতু আইয়ুন ২

অনেকে বিরক্ত হন, তাই এটা অনুচিত। এরপর সময় ও পূর্বপরিচয়সাপেক্ষে কুশলাদি বিনিময় হতে পারে।

২. আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়া

‘এবং আপনার রবের নিয়ামতের কথা ঘোষণা করুন/আলোচনা করুন।’

(সূরা দোহা, ১১)

কেউ যখন দুনিয়ার আলোচনা করে, তখন আমরা কান লাগিয়ে শুনি, আর আখিরাত বা আল্লাহর আলোচনা উঠলে উদাসীনতার সাথে শুনি, কেউ আবার উঠে চলে যায়। নিজেকে দিয়েই টেস্ট করতে পারেন। যে-মুহূর্তে আল্লাহর প্রসঙ্গ উঠবে, ঐ মুহূর্তে মনোযোগ কমে যাবে, এদিক-ওদিক তাকাবে, এটা-ওটা করবে; আগে যে-মনোসংযোগটুকু আপনার এমনিতেই ছিলো, এখন সেটুকুও জোর করে রাখতে হচ্ছে—এটা শয়তানের কারুকাজ। এ-জন্য দাওয়াহর শুরুতে তাকে আল্লাহর নিয়ামত ও গুরুত্বের কথা শোনাতে হবে। তুমি যে এই মুহূর্তে সুস্থ, এটা আল্লাহ আমাদেরকে রেখেছেন। কত মানুষ হাসপাতালে, আমি তুমিও থাকতে পারতাম। আল্লাহ রাখলে আমাদের আটকানোর ক্ষমতা ছিলো না। এই যে দোকান-ব্যবসা করছো, এটা তো আল্লাহই দিয়েছেন। এই যে জীবন, এই যে ২৪ ঘণ্টা, কে দিলেন? এই যে আলো-বাতাস-অক্সিজেন, কার দেওয়া? এই যে আমরা মুসলিম, কাফির বানালে কী করার ছিলো—অনন্ত আওনে জ্বলতাম; এই ঈমানের নিয়ামত না-চাইতেই কে দিলেন? এইবার ফণা নুয়ে আসবে, কান লাগাবে বাকি কথায়। আল্লাহর গুরুত্ব স্মরণে এসেছে এবার। এবার কান লাগিয়ে শুনবে।

৩. কালিমা

দাওয়াহর যে-কোনো এক পর্যায়ে বা মওকায় স্পষ্ট সহিহ উচ্চারণে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ নিজে পড়ে সাথে-সাথে তাকেও পড়তে উৎসাহিত করা। অর্থও তার মুখে বলানো—আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আল্লাহর রাসূল। কালিমাওয়ালা জাহান্নামে অজানাকাল পুড়ে হলেও একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, ইন শা আল্লাহ—এটিই আহলুস সুন্নাহর আকীদা। আল্লাহ চাহেন তো, আজকের এই কালিমার স্পষ্ট অর্থসহ সত্যায়ন হাশরের মাঠে তার কাজেও আসতে পারে।

৪. জওহীদ আগের আলোচনার ১ ও ২ নং পয়েন্ট।

৫. রিজালাত আগের আলোচনার ৩ নং পয়েন্ট।

৬. আখিরাত

এরপর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব-নগণ্যতা-খোঁকা এবং আখিরাতের চিরস্থায়িত্ব-আসল জীবন-সুখের অসীমতা আলোচনায় আসবে। এখানে আমরা মুসাফির, ওখানটা আমাদের আসল ঠিকানা, আসল গন্তব্য; কবরে কী কী হবে, হাশরের মাঠে কী কী হবে, পুলসিরাতে-জান্নাতে-জাহান্নামে কী কী আছে—সময় অনুপাতে সংক্ষিপ্ত বা বিশদ আলোচনায় আসবে।

‘হে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হে হিন্দ বিনতে উতবাহ, খোদার কসম তোমরা একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে। তারপর পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর নেককার বেহেশতে এবং বদকার দোযখে যাইবে। আল্লাহর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকেই সর্বপ্রথম সাবধান করা হইল।’^[১]

৭. নিয়ত করানো

দাওয়াহ দিয়ে ফেলে রেখে এলে রেজাল্ট আসবে না। বিষয়টি এমন হলো, তাকে ময়লা থেকে তুলে ধুয়ে আবার ময়লাতে ফেলে এলেন। সম্ভব হলে সাথে করে মসজিদে আনা—যদি পরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী থাকে। নয়তো তাকে কোনো একটি ঈমানবান্ধব পরিবেশে আসার জন্য নিয়ত করানো। সেটি প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে আসা হতে পারে, তালিমের হালাকা, কোনো তাফসিরের হালাকা, কোনো শায়খের মজলিস। আমরা শুনি, খুব উপকার পাই, আপনিও থাকার নিয়ত করুন, ইন শা আল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘... যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করলো, তারপর কোনো কারণে করতে পারলো না, তার জন্য আল্লাহ তাআলা পূর্ণ একটি নেকি লিখে দেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি ঐ কাজটি করে ফেলে, তবে তার জন্য দশ নেকি থেকে ৭০০ পর্যন্ত বা এর চেয়েও বেশি কয়েক গুণ পর্যন্ত লিখে দেন। আর গুনাহের নিয়ত করার পর না-করলে একটি নেকি লিখে দেন (বিরত থাকার কারণে)। আর গুনাহ করে ফেললে একটি গুনাহই

[১] কানযুল উম্মাল থেকে মুয়াবিয়া রা.-এর বর্ণনায়, হায়াতুস সাহাবাহ, ১ম খণ্ড

লেখা হয়।^[১] নিয়ত মানে ওয়াদা না; শয়তান এখানে একটা খেলা খেলে, নিয়তের যে একটা ফ্রি সওয়াব আছে, সেটাও পেতে দেয় না। আমাদেরকে ভালো কাজের নিয়তই করতে দেয় না। নিয়ত করার পর না তাওফিক মিলবে।

ধরুন, সে এলো না, আবার একদিন গেলেন, দাওয়াহ দিলেন, পরিবেশে আসার কথা বললেন, আবারও এলো না। একদিন তার মনে হবে—ওরা বারবার আসে, আমি একবারও যেতে পারি না, এবার যাবোই। শুরুতে বিয়ের দাওয়াত নিয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। একবার পরিবেশে এলে অন্তরের যে-পরিবর্তন, তা পূর্বের পরিবেশে ৫০ বার দাওয়াহ দিলেও ঐ পরিবর্তন আনা কঠিন। এ-জন্য পরিবেশে আনার জন্য চেষ্টা করা, তাবলিগের ভাষায় বলে তাশকিল। এটা ছাড়া দাওয়াহটা পরিপূর্ণতা পেলো না। তাকে দ্বীনে আনার জন্য আপনার প্রচেষ্টাটা এর দ্বারা পূর্ণ হলো। তবে জোরাজুরি না-করা, বারবার গিয়ে তার নিজের ভেতর থেকে অপরাধবোধ, দায়িত্ববোধ জাগানোটা উদ্দেশ্য। আজকেই আনতে হবে, এনেই ছাড়বো, এমন না ব্যাপারটা।

এটি একটি রাফ ফরমেট। ৭টি পয়েন্ট টাচ করে আপনি ৭ মিনিটে দাওয়াহ শেষ করতে পারেন। আবার আধা মিনিট করে সাড়ে তিন মিনিটেও শেষ করতে পারেন। রিকশাওয়ালা-দোকানদার বেশি সময় আপনাকে দেবে না। তাকে ৩.৫-৭ মিনিটে এই ফরমেটে দাওয়াহ দিতে পারেন, পরিচিত বন্ধুকে ১৫/২০ মিনিট নাসিহা করতে পারেন।

টার্গেটেড দাওয়াহ

মহল্লায় আমরা তাবলিগি ফরমেটে ২ ধরনের ওয়ার্ক করি। একটা র্যান্ডম দাওয়াহ—সবাইকে গণহায়ে, সামনে বাকে পাবো, তাকেই। নিজের ঈমান বাড়ানোর জন্য। আরেকটি টার্গেটেড দাওয়াহ—দীর্ঘমেয়াদী। টার্গেট করে-করে। উনি ফাঁকা আছেন, সামনে সরকারি ছুটি আছে, হয়তো ৩ দিনের জন্য আমাদের সাথে ঈমানবান্ধব পরিবেশে যেতেও পারেন; এ-রকম টার্গেটেড দাওয়াহতে আরও দুটো-তিনটে কৌশল আছে।

☞ যাকে আপনি দ্বীনের পথে আনতে চান, তাকে হাদিয়া দিন। হাদিয়ার সুন্নাহ জিন্দা করা।^[২] সম্পর্ক গভীর করার পর দাওয়াহ পেশ করা।

[১] আস-সহিহ, বুখারি : ৬৪৯১

[২] আস-সুনান, তিরমিযি : ২১৩০

৩ মেহমানদারি করে সম্পর্ক তৈরি করা। খানা খাওয়ানো। এরপর দাওয়াহ পেশ করা। একজন মজা করে বলেছিলো, enter into his heart through his stomach—হা হা। অবশ্যই আল্লাহর জন্য, তাকে আল্লাহনুখী করার জন্যই তো এত কিছু। নবীজি ও দাওয়াহর নিয়তে খানার ব্যবস্থা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের আত্মীয়স্বজনকে লাগাতার ৩ দিন খাবার খাইয়ে দাওয়াহ করেছেন, কেবল আলি রা. ছাড়া কেউই তাওহীদ কবুল করেনি।^[১]

৩ তার নাম ধরে দুআ, সাদাকা ও নফল আমল করা। মাওনানা তারিক জামিল হাফিযাহুল্লাহ পপস্টার জুনায়েদ জামশেদের (রাহিমাহুল্লাহ) জন্য ৫০ রাকাত নফল সালাত পড়েছিলেন। মেডিকেল-বুরেট-ভার্সিটিতে তাবলিগওয়ালাদের মধ্যে এটা খুব কমন প্র্যাকটিস। জুনিয়র ছেলের জন্য নফল রোযা, সাদাকা, তাহাজ্জুদে নাম ধরে দুআ। ভাগ-ভাগ করেও নেয় অনেক সময়—‘আমি অনুকের হিদায়াতের জন্য নফল রোযা রাখবো, তুমি তমুকের জন্য সূরা ইয়াসিন খতম করে দুআ করবো।’ আমার মহল্লায় বাবর ভাই নফল সাওম রেখে দাওয়াতে বের হতেন। তিন দিনের জামাতেও তিন দিনই রোযা রেখে দাওয়াহ দিতেন। আপনারাও প্রিয়জনকে দাওয়াহ করার ক্ষেত্রে কৌশলটি কাজে লাগাতে পারেন। হিদায়াত তো আল্লাহই দেবেন, আমরা কেবল বাহানা বানাবো, তাই না!

আমার বন্ধু ইমরান বলছিলো সে-দিন : ‘দোস্তু, প্রত্যেকটা মানুষের দিকে তাকা; দ্যাখ, প্রতিটা মানুষ ঝলছে ভেতরে-ভেতরে। প্রত্যেকের ভেতরে একটা জ্বালা, একটা কষ্ট!’ ঠিক তা-ই, আজ ইসলাম ছেড়ে দিয়ে প্রতিটা মানুষ মহা সমস্যায় মহা মুশকিলে পড়ে গেছে। মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম থেকে আরও দূরের পথ বেছে নিচ্ছে। রিযিকের সমস্যা? সুদ নিয়ে ব্যবসা করো তা হলে। এবং আবশ্যিকভাবে আরও বেশি সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে। চক্রবৃদ্ধিহারে সমস্যা তৈরি

[১] হযরত আলি রা. বলেন, ‘যখন এই আয়াত নাযিল হইল, ‘আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন...’, তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন পরিবারস্থ লোকদেরকে ডাকিলেন। তাহারা ৩০ জন একত্রিত হইল এবং খাওয়া দাওয়া করিল।... তিনি এই কথা তিনবার পেশ করিলেন।’ (তাকসির ইবনে কাছীর)

বাযযার শরীফের রেওয়ায়াতে ৩ দিন পর্যন্ত খানা খাওয়ান ও দাওয়াত প্রদান করেন। (হায়াতুস সাহাবাহ ১/১৫৬-১৬০)

কুররাতু আইয়ুন ২

করছি আমরা দীন ছেড়ে দিয়ে। আমরা যারা দীন বুঝেছি কিছুটা, এখন আমাদের কাজ অনেক, দায়িত্ব অনেক। এক-এক বেখেয়াল লোকের কাছে গিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বোঝাতে হবে—‘শুনুন ভাই, আপনার সমস্যার সমাধান তো ইসলামো।’ সে শুনতে চাইবে না, তবুও শোনাতে হবে। সে রাগ হবে, তাড়িয়ে দেবে, কটু কথা বলবে; তারপরও তাকে বোঝাতে হবে। কেননা, সে মহা বিপদে আছে দুনিয়ায়, মৃত্যুর পর মহা-মহা-মহা বিপদে পড়ে যাবে। এক হাদীসে নবীজি বলেন কম-বেশি এমন—

আমার আর তোমাদের উদাহরণ এ-রকম, যেমন আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত পোকামাকড়। তোমরা সকলে ঝাঁপ দিয়ে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ছো, আর আমি কোমড় ধরে তোমাদের এক-একজনকে বাঁচাচ্ছি। কিন্তু তোমরা কেবলই আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে আগুনে পড়ছো।^[১]

আমাদেরও একই কাজ। এটাকে উন্মত্তের দরদ বলে, তাবলিগের ভাষায় বলে, ‘উন্মত্তপনা’—আহা রে, আমার নবীর উন্মত্ত। তাঁর উন্মত্ত জাহান্নামে যাচ্ছিলো, আর আমি তাঁর মহব্বতের উন্মত্তের জন্য কিছুই করলাম না, তাঁকে মুখ দেবাবো কী করে!

তো লেগে যাই না আজ থেকেই? এক-এক বাসায় নবীর মতো করে উপযাচক হয়ে নিজের গরজে যেচে গিয়ে টাক-টাক করে বলি, ‘আপনার সমস্যার সমাধান আল্লাহর দ্বীনের মাঝে। সেই সমাধানের কথা নিয়ে এসেছি। বাসায় আছেন?’

আল্লাহ আমাদের ভাঙাচুরা বাহানাগুলোকে কবুল করে আমার ও পুরো উন্মত্তের হিদায়াতের ফায়সালা করে দিন। আমিন।

[১] আস-সহিহ, মুসলিম : ৫৯৫৮

নোট

Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.

লেখক পরিচিতি

শামসুল আরেফীন। পেশার চিকিৎসক।
‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড’ দিয়ে লেখালেখি শুরু।
অন্যান্য বই ‘কষ্টিপাথর’, ‘মানসাক্ষ’,
‘কুররাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন’।
দিনশেষে আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানে
মানবসভ্যতার ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো
রাস্তা নেই—এ-কথাই ফুটে ওঠে তার লেখায়।

মাকতাবাতুল আমলাফ কর্তৃক
প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহের তালিকা

গ্রন্থ	লেখক
প্রকাশিত	
সকলকালে ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব	ইমাম ইবনু বজ্ব হাফলী রহ. (মৃত্যু: ৭৯৫ হি.)
সকলকালে দীর্ঘতম অথল হাদীস	আবদুল্লাহ আল মাকতাব
তাজউল	মহিনাব আল-গাযী
সুহুতুল	আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
দুইয়্য পত্র সুব	ইমাম ইবনু আবদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
কুসুদুল আইন : যে জীবন জুড়ায় নমন	ডা. শামসুল আবেদীন
শরতানের জোড়	ইমাম ইবনু আবদ দুনইয়া রহ. (মৃত্যু: ২৮১ হি.)
উবাবা	আবু বকর আল-আজুবী রহ. (মৃত্যু ৩৬০ হি.)
নবীজির সংস্করণ	শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ
নবীজির নিকিলাপি	শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর বৃত্ত	ইমাম আবু বকর মারজুযী রহ. (মৃত্যু: ২৭৫ হি.)
উনাই মাকের আমল	ড. সাঈদ বিন হুসাইন আফফানী
ইসলামের ইতিহাস : নববী যুগ থেকে বর্তমান	ড. মুহাম্মাদ ইবরাহিম আশ-শারিকি
কুসুদুল আইন - ২	ডা. শামসুল আবেদীন
কুরআন : বিকিত্রে বিকিত্রে	শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ
প্রকাশিতব্য	
নবীজির রনয়ান	শাইখ ফালিহ বিন মুহাম্মাদ আস-সগীর
আওয়াকারীর গল্প	ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ. (মৃত্যু: ৬২০ হি.)
আল ফুয়কান : আল্লাহর বন্ধু ও শরতানের দোসর	ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু: ৭২৭ হি.)
আল্লাহর চিকিৎসা ও প্রতিকার	ইবনুল কায়্যিম রহ.
নবীজির হজ	শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরি
তাহকীকত দয়্যিগু ইহইয়াতি উলুদুদীন	মূল: ইমাম গাযালী রহ. তাহকীক ও সংক্ষেপণ : ইমাম ইবনুল জাওয়ী ও ইমাম ইবনু কুদামাহ আল-মাকদিসি রহ.
দয়্যিগু তাকদীর ইবনু কাদীর	ইমাম ইবনু কাদীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪ হি.); সংক্ষেপণ : শাইখ আলী আস-সাবুনী
শারহ হাদীসে আরবাইন	ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.)
উম্মাহর ময়ান চার ইমাম	ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ., ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.

লেখক পরিচিতি

শামসুল আরেফীন। পেশায় চিকিৎসক।
'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' দিয়ে লেখালেখি শুরু।
অন্যান্য বই 'কষ্টিপাথর', 'মানসাক্ষ',
'কুররাতু আইয়ুন : যে জীবন জুড়ায় নয়ন'।
দিনশেষে আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানে
মানবসভ্যতার ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো
রাস্তা নেই—এ-কথাই ফুটে ওঠে তার লেখায়।